মাসুদ রানা
পাশবিক
প্রথম খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগী
কাজী মায়মুর হোসেন
সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

পাশবিক

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

অসুস্থ রানা ভাবতেও পারেনি, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাবে এই জটিল ষড়যন্ত্রের জালে। যে হারিয়ে গেছে দশ হাজার বছর আগে, নতুন করে আবারও কি ফিরল সেই দানব? নির্মমভাবে খুন করছে সৈনিক, বিজ্ঞানী ও তাদের সহকারীদের। ইউ.এস. আর্মির অনুরোধে ভয়ঙ্কর বেপরোয়া ওই নৃশংস জানোয়ারের পিছু নিল রানা, সঙ্গে দক্ষ ক'জন সশস্ত্র যোদ্ধা। কিন্তু হাড়ে হাড়ে বুঝল ওরা, বৃথা ওসব আধুনিক অস্ত্র! অনায়াসেই আলাস্কার তুষারাচ্ছন্ন অরণ্য-পর্বতে ওদেরকে হত্যা করছে ওটা! ধাওয়া খেয়ে পালাতে লাগল ওরা। তারপর আঁধার গিরিখাদে আহত রানার মুখোমুখি হলো ওই নিষ্ঠুর পশু! অন্তরের গভীরে রানা বুঝে নিল, আর কোনও উপায় নেই!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা ৪৪২

পাশবিক

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগী
কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-7442-4

কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৫

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ. বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপুব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage. facebook.com/shebaoffice

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-442
PASHOBIK
Part-I
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
With: Qazi Maimur Husain

একশ' উনিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক

কুচকুচে কালো, নিচু ঘন মেঘ ছুঁয়ে ঝোড়ো হাওয়া তুলে ছুটছে হেলিকপ্টার। ওটার রোটর ব্লেডের খাপাটি-খাপাটি শব্দ ছাপিয়ে রেডিয়োতে ধমকে উঠলেন শেরিফ জর্জ হফম্যান: 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আগামী চার ঘণ্টার ভেতর মারা পড়বে?'

তুষারাবৃত অরণ্যের মাথা ছুঁয়ে বহু দূরের নীল পর্বতের দিকে চলেছে হেলিকপ্টার। একবার মুখ তুলে ওটাকে দেখে নিয়ে জ্বলন্ত সিগার বুটের নীচে পিষে ভাবলেন শেরিফ: কিছুই করার নেই? মরবে অসহায় বাচ্চা ছেলেটা?

প্যাট্রল কারের ভিতর ঘেউ করে উঠল রেডিয়ো, 'শেরিফ হফম্যান!'

ঝট্ করে ঘুরে রেডিয়োর দিকে চাইলেন শেরিফ। কনকনে শীতের হাওয়ায় চারকোনা চেহারা লালচে। জানালা দিয়ে ভিতরে হাত ভরে মাইক্রোফোন অন করলেন তিনি। 'বলছি!'

ওদিকের লোকটা জানাল, 'শেরিফ, ভলান্টিয়াররা ট্রেইলের শুরুতে বাচ্চাটার কোনও চিহ্ন পায়নি। গার্ডরা পৌঁছে গেছে সেই সিডার পাস পর্যন্ত। ওরাও কারও কোনও পায়ের ছাপ দেখেনি।'

ভুরু আরও কুঁচকে বললেন হফম্যান, 'মন দিয়ে শোনো আমার কথা! আঁধার নামতে আর মাত্র চার ঘণ্টা বাকি। তার আগেই ছেলেটাকে খুঁজে না পেলে বরফে জমে যাবে ও।

আবহাওয়া অফিস থেকে জানিয়ে দিয়েছে, আসছে বড় তুষার ঝড়। ...আমরা আকাশে কয়টা পাখি তুলেছি?'

'ছয়টা কপ্টার, স্যর,' বেড়ে গেল রেডিয়োর স্ট্যাটিক। 'কিন্তু জঙ্গলে খোঁজা প্রায় অসম্ভব। তা ছাড়া, সূর্যের আলো ঢাকা পড়েছে ঘন কালো মেঘে। জঙ্গলের ভেতর বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না।'

বিড়বিড় করে কপালের দোষ দিয়ে গাড়ির গায়ে হেলান দিলেন প্রকাণ্ডদেহী হফম্যান। ওজনের ভারে দুলে উঠেছে ভারী গাড়ি। 'সবাইকে আরও ভালভাবে খুঁজতে বলো। রাত নেমে গেলেও খুঁজব আমরা। কারও আপত্তি থাকলে একবার ভেবে দেখুক, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ভরা জঙ্গলে কেমন লাগছে চার বছরের ওই বাচ্চার!'

ক্ষোভ নিয়ে সামনের সিটে মাইক্রোফোন ছুঁড়ে ফেললেন তিনি। আর তখনই পাশে এসে থামল কালো এক পিকআপ। দরজা খুলে গেল। নুড়ি পাথরে জুতোর আওয়াজ পেয়ে ঘুরে চাইলেন শেরিফ। সামান্য হাঁ হয়ে গেল মুখ। পিকআপ থেকে সুঠামদেহী এক যুবক নেমে আসতেই তার পাশে লাফিয়ে নেমেছে কোমরসমান, বিশাল, কালো এক নেকড়ে।

পিকআপের নাক ঘুরে হফম্যানের সামনে থেমে জানতে চাইল যুবক, 'নতুন কিছু জানা গেল, শেরিফ?'

মাথা ঘুরিয়ে জঙ্গলের গাছের সারি দেখছে মস্ত নেকড়ে।

ওটাকে খুব কাছ থেকে দেখে হতবাক হয়েছেন হফম্যান, তিন সেকেণ্ড পর বললেন, 'ওটাকে নিয়ে আসার মানেটা কী, মিস্টার রানা?'

'কোনও মানে নেই,' শান্ত স্বরে বলল মাসুদ রানা।

বিসিআই থেকে ওকে লম্বা ছুটি দেয়া হয়েছে। বিখ্যাত বাংলাদেশি ব্রেইন স্পেশালিস্ট ডক্টর অনিল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতি সপ্তাহে ফোন করেন, একবার দেখেও গেছেন, কিছু ওষুধ পাল্টে

দিয়ে খানিক গল্প করে বিদায় নিয়েছেন। ইজরায়েলী কারাগারের হাসপাতালে *পি-সেভেন ভিএম নামের ভয়ঙ্কর এক বিষাক্ত সিরাম ইঞ্জেক্ট করা হয়েছিল ওর শরীরে। চেয়েছিল ওকে বোধবুদ্ধিহীন যোম্বি করে দিতে। কিন্তু ব্রেন-ওয়াশ সিরামের প্রথম ডোযের পর পরই তিনতলার জানালা থেকে লাফিয়ে নেমে প্রহরী দু'জনকে খুন করে বেরিয়ে গিয়েছিল ও জেল ভেঙে। উপযুক্ত চিকিৎসার পর সুস্থ হয়েছে। কিন্তু ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন, বছরের একটা বিশেষ সময়ে ওর ক্ষুরধার বুদ্ধি, শারীরিক রিফ্লেক্স ও স্মৃতিশক্তি খানিকটা কম থাকবে ওই মারাত্মক সিরামের প্রভাবে। সেই সময় বিসিআই রানাকে কোনও অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে। ডক্টর অনিল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধারণা করছেন: আগামী কয়েক বছরে শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে সিরাম, জটিল এই রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হবে। রোগ ধরা পড়বার পর থেকে তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছে রানা। অসুস্থতা বাড়লে কমিয়ে দিচ্ছে কাজ, ভাবতে দিচ্ছে না মনটাকেও। নিজের জন্য বেছে নিচ্ছে পছন্দের আর কোনও কাজ। সেই কারণেই আজ এই জঙ্গলের ধারে শেরিফের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ও।

'খবর দিতে লোক পাঠিয়েছিলাম, শুনলাম আমাদের কাউন্টি থেকে দূরে কোথাও গেছেন।'

'একটু আগে ফিরেছি,' ফ্যাকাসে নীল জিন্সের প্যান্টের হাঁটুর কাছে মোকাসিন জুতোর ফিতা টাইট করল রানা। পরনে বাদামি চামড়ার শার্ট। 'সংক্ষেপে বলুন কী হয়েছে।'

এক পা সামনে বাড়লেন উত্তেজিত শেরিফ হফম্যান। 'মিস্টার রানা, জঙ্গলে হারিয়ে গেছে চার বছরের এক ছেলে। যদি সন্ধ্যার আগে খুঁজে না পাই, মারা পড়বে। তুষার ঝড় আসছে।

---

* অখণ্ড অবসর

রাতে খোঁজা সম্ভব নয়। আমার সব ক'জন ডেপুটি, তিন শ' ভলান্টিয়ার আর প্রায় এক হাজার ন্যাশনাল গার্ড খুঁজছে উত্তর রিজে। ট্র্যাক করতে ব্যবহার করা হচ্ছে কুকুর। আকাশ থেকে চোখ রাখছে ছয়টা হেলিকপ্টার। কিন্তু এত কিছু করেও ছেলেটার কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। যেন স্রেফ মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়।'

হফম্যানকে পাশ কাটিয়ে স্কোয়াড কার থেকে পোর্টেবল রেডিয়ো তুলে নিল রানা, গুঁজে নিল বেল্টে। শান্ত শোনাল কণ্ঠ: 'ছেলেটাকে শেষবার ঠিক কোথায় দেখা গেছে?'

'ওদিকে,' জঙ্গল দেখিয়ে দিলেন শেরিফ। 'ট্রেইলের শুরুর দিকে। ওর বাবা-মা বলেছে, এক মিনিট আগে ছিল, পরের মিনিটেই উধাও।'

'গায়ে কী ছিল?' পিকআপ থেকে খাবার ও ইমার্জেন্সি কিট নিয়ে চামড়ার ব্যাগে পুরে ওটা কাঁধে ঝোলাল রানা। কোমরের বেল্টে ঝুলছে চামড়ার কেসে সিঙ্গল ক্যান্টিন।

'নীল শার্ট, লাল কোট, পুরনো জিন্সের প্যান্ট আর টেনিস শু,' বললেন শেরিফ। 'সূর্য যতক্ষণ থাকবে, অসুবিধে হবে না ওর, কিন্তু রাত নামলে...' মিলিয়ে গেল হফম্যানের কণ্ঠ। চেয়ে আছেন তুষার ছাওয়া ঘন জঙ্গলের দিকে।

রানা পরে নিল চামড়ার কোট। ওটা অদ্ভুত ডিযাইনের। নেমেছে উরু পেরিয়ে। চিরে দেয়া হয়েছে সামনের দিক। কাঁধের উপর জোড়া চামড়ার ভারী হুড। বৃষ্টি বা তুমুল ঝড় এলে রক্ষা করবে মাথা-ঘাড়। রেড ইণ্ডিয়ান জিনিস।

'ট্র্যাকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে কুকুর?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। শুধু কুকুর না, শত শত ভলান্টিয়ার খুঁজছে ওকে। শহরের সক্ষম সবাই নেমে পড়েছে।'

'সবাইকে বলুন, যে-যেখানে আছে, সেখানেই যেন থাকে।' ভুরু কুঁচকে জঙ্গল দেখল রানা। ওখানে ক্রমেই নামছে অন্ধকার।

'এমনিতেই ট্র্যাক মাড়িয়ে ফেলেছে অনেকে।'

প্রকাণ্ড নেকড়ের দিকে চাইল রানা। 'হান্টার?'

মুখ তুলে ওকে দেখল কালো নেকড়ে। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই কাঁধে ফুলে উঠেছে থোকা-থোকা পেশি। শক্ত হয়ে গেল শরীর। মস্ত মাথা ঘুরিয়ে হাঁটতে লাগল জঙ্গলের দিকে।

ওর বাবার নামও ছিল হান্টার, মা নেকড়ে। প্রথম হান্টারকে ডগ ক্যানারিতে রেখে দেশে ফিরেছিল রানা। কিন্তু রটওয়েইলার কুকুরটা পালিয়ে গিয়েছিল ক্যানারি থেকে, মিশে গিয়েছিল নেকড়েদের পালে। কিন্তু রানা অ্যাসপেনে ফিরলেই হাজির হতো খাটো লেজ ও আন্তরিক আদর নিয়ে। তখন সঙ্গে থাকত মাদি এক বিশাল নেকড়ে। এভাবে কেটে গেল দু'বছর, কিন্তু শেষবার রটওয়েইলার আর তার সঙ্গিনীকে রানা দেখেছে জঙ্গলে, মৃত অবস্থায়। ওদের বাচ্চাগুলোকেও গুলি করে খুন করেছিল নিষ্ঠুর এক ট্র্যাপার। কিন্তু পড়ে যাওয়া এক গাছের কাণ্ডের নীচে মাটি খুঁড়ে লুকিয়ে পড়েছিল রটওয়েইলার ও মাদি নেকড়ের শেষ সন্তান—আহত দ্বিতীয় হান্টার। মা-র গোত্রের মতই দেখতে হয়েছে সে। কিন্তু আকারে যে-কোনও নেকড়ে-ছানার চেয়েও অনেকটা বড়।

নেকড়ের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করতেই রানাকে পিছন থেকে ডাকলেন শেরিফ হফম্যান, নার্ভাস: 'সত্যিই কি ভাবছেন ছেলেটার বাঁচার সুযোগ আছে? মানে, যেভাবে ট্র্যাক মাড়ানো হয়েছে...

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল রানা, ঘুরে চাইল শেরিফের চোখে।

কুচকুচে কালো মণিতে দৃঢ়বদ্ধ প্রতিজ্ঞা দেখলেন হফম্যান।

ওই দুই চোখ হিম শীতল হাওয়ার চেয়েও ঠাণ্ডা।

কোনও জবাব না দিয়ে ঘুরে রওনা হয়ে গেল রানা, ঢুকে পড়ল বরফে ছাওয়া জঙ্গলে।

অরণ্যে স্‌স্‌ শব্দে বইছে কনকনে হিমেল হাওয়া, সেই সঙ্গে

ঝরঝর করে ঝরছে ঝুরঝুরে তুষার। বড় একা পল। মনে ভয়, বড় ভয়। জানে না এত ভয় কেন। ঘনিয়ে আসছে আঁধার। একটু পর ডুবে যাবে সূর্য। হাঁটতে হাঁটতে এ কোথায় এসে পড়েছে ও!

'উফ্, কী ঠাণ্ডা!' বিড়বিড় করল পল। অস্ফুট স্বরে ডাকল, 'আম্মু!'

যদি আব্বু-আম্মু এসে ওকে নিয়ে যেত গরম কোথাও!

ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল পল। দু'গাল বেয়ে দরদর করে নামল অশ্রু। তুষার ছাওয়া জঙ্গলে থরথর করে কাঁপছে শীতে। খটা-খট শব্দ তুলছে দু'পাটি দাঁত। কোথাও যাওয়ার নেই ওর। ভীষণ একা। ভাবল, কেউ এসে যদি ওকে নিয়ে যেত এখান থেকে!

ঘন জঙ্গলে দুঃসাহসী পুরুষ চিতার মত দ্বিধাহীনভাবে চলেছে মাসুদ রানা। মাঝে মাঝে থেমে পড়ে জমি দেখছে, সতর্ক। পিছনের আকাশে ভোমরার মত শব্দ তুলছে ন্যাশনাল গার্ডদের হেলিকপ্টার।

ওদিকে মনোযোগ নেই রানার, অন্য কাজে ব্যস্ত। ভাল করেই জানে, শেরিফ হফম্যানের কথাই ঠিক। একবার রাত নামলে দু'চার ঘণ্টার ভিতর মারা পড়বে ছেলেটা। পড়ে যাওয়া এক গুঁড়ির কাছে থামল রানা। এখানে পিছলে গিয়েছিল ছেলেটা। চার পাশের জমি দেখল ও।

উঠে হাঁটতে শুরু করেছে ছেলেটা। একটু গিয়েই ডানে। তারপর আবারও বামে। বাচ্চারা এমনই হয়। পূর্ণবয়স্ক মানুষের চেয়ে তাদেরকে ট্র্যাক করা ঢের কঠিন। সাধারণ মানুষ সোজা পথ বেছে চলে, কিন্তু বাচ্চারা উদ্দেশ্যহীন এগোতে থাকে। সামান্য কারণে আরেক দিকে চলে যায়।

এই বাচ্চার পা টেনে হাঁটবার চিহ্ন দেখে রানা বুঝেছে, বড্ড

ক্লান্ত ও। ভীষণ শীত, জমিয়ে দিতে চাইছে রক্ত। কোনও দিকেই মনোযোগ নেই।

ছোট্ট পা-র অস্পষ্ট ছাপ ঝুঁকে দেখছে রানা। ছেলেটা খুব হালকা, নইলে ভালভাবে মাটিতে পড়ত চিহ্ন, সহজ হতো ট্র্যাক করা। রানার অসতর্ক চোখে এড়িয়ে যেতে পারে অগভীর ছাপ। আগের চেয়েও মনোযোগী হলো ও। অন্য কারণে চিন্তিত: ক্রমেই ধূসর হয়ে উঠছে দিনের হলদে আলো। একটু পর নামবে সন্ধ্যা।

একবার মুখ তুলে ঢলে পড়া সূর্য দেখল রানা। কুঁচকে গেল ভুরু। অন্তরের গভীরে বুঝল, কেমন লাগছে বাচ্চাটার। হারিয়ে গেছে। একা। জঙ্গলে কোথাও নেই বাবা-মা।

কঠোর হয়ে গেল রানার দৃষ্টি।

না, ছেলে, তুমি মরবে না... আমি তোমাকে খুঁজে বের করব!

আরও একঘণ্টা পর সার্চ পার্টি ট্র্যাক মাড়ায়নি, এমন চিহ্ন পেল রানা। পরবর্তী ঘণ্টায় বুঝল, পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলেছে সার্চ পার্টি। গত দুই ঘণ্টা ধরে নিজেকে সামান্য বিশ্রাম না দিয়েই হেঁটে চলেছে রানা।

ওর জানা হয়ে গেছে, খুবই কাছে পৌঁছে গেছে।

এদিকে ফুরিয়ে আসছে সময়।

একটু পর ঝুপ্ করে নামবে রাত।

কিন্তু বেশি দূরে নেই বাচ্চাটা।

ছোট ছোট জুতোর ছাপ স্বাভাবিক নয়। টলতে টলতে গেছে। আর হাঁটতে পারছে না। বার-বার থেমে বিশ্রাম নিচ্ছে।

ডুবতে শুরু করা সূর্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে দ্রুত হাঁটছে রানা। বার-বার থামছে, দেখছে নানান চিহ্ন, তারপর আবারও রওনা হয়ে যাচ্ছে। গত বছর একটা বাচ্চা মেয়েকে খুঁজে বের করেছিল ও। ওদের মন বোঝে। সামনে একটা ঢালু টিলা দেখে সেদিকে চলল রানা। অনুসরণ করছে প্রায় অদৃশ্য ছাপ। কখনও

কখনও আন্দাজে বুঝে নিচ্ছে কোন্ দিকে যেতে পারে ছেলেটা।

কিছুটা যাওয়ার পর টিলার মাঝে সরু এক গিরিপথ পেয়ে গেল। সম্ভবত ওদিকেই গেছে ছেলেটা। অন্তত ও নিজে ছোট হলে তা-ই যেত। আবারও হাঁটতে লাগল রানা। চোখ এড়াচ্ছে না সামান্য সব চিহ্ন। সাবধান না থেকে উপায়ও নেই ওর। পায়ের ছাপ হারিয়ে গেলে ব্যাকট্র্যাকের সময় পাবে না, তার আগেই নামবে রাত।

টিলার খুব কাছে পা পিছলে গেছে ছেলেটার। ওখানে থেমে ছাপগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখল রানা। নিশ্চিত হয়ে নিল।

ওই যে, খুদে পায়ের ছাপ গেছে ডানদিকের ঢালে।

কিন্তু ওখান থেকে বামে মোড় নিল।

পথ হারিয়ে হাঁটছে বেঘোরে।

অনুসরণ করছে রানা, পাত্তা দিচ্ছে না ভয়ঙ্কর শীতকে।

পাশে আলতো পায়ে হাঁটছে হান্টার। খানিকটা কুঁজো হয়ে উপরের ঢালের দিকে চলেছে রানা। দ্রুত পা, কিন্তু সতর্ক। যে-কোনও সময়ে গিরিপথ থেকে সরবে বাচ্চাটা। লালচে হয়ে ওঠা ডুবন্ত সূর্যের দিকে দ্বিতীয়বার ঘুরেও চাইল না রানা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা মনোযোগ ধরে রেখে পরিশ্রান্ত হয়ে উঠেছে। আগেই জানত, এমন হবে, যখন হতাশা ধরে বসতে চাইবে ওকে। আর মাত্র কয়েক মিনিট পর হারিয়ে যাবে শেষ আলো। তার মানে, আজ রাতে আর ছেলেটাকে খুঁজে পাবে না। অন্ধকারে সম্ভব হবে না ট্র্যাক করা।

'না, খোকা, এই তো এসে পড়লাম বলে!' বিড়বিড় করল রানা। 'মরতে দেব না আমি তোমাকে!'

ক্লান্তিতে অবশ হয়ে গেছে পল। একটা পা তুলে সামনে ফেলবে সে শক্তি নেই। এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে ঝড়ে উপড়ে পড়া একটা

বুড়ো ওকের পাশে বসে পড়ল ও, সামান্য ফুঁপিয়ে উঠে কুঁকড়ে শুয়ে পড়ল হাত-পা বুকের কাছে নিয়ে। বুঝতে পেরেছে, বাবা-মা কেউ আসবে না। কেউ জানেই না ও যে হারিয়ে গেছে। খামোকাই অভিমান হচ্ছে ওর মা-বাবা-নিনির ওপর। অসাড় হয়ে আসছে শরীর, কাঁপছে ঠক-ঠক করে। ও জানে, জঙ্গলে মস্ত সব বাঘ-ভালুক, হাতী-নেকড়ে-সিংহ থাকে। আর একটু আঁধার হলেই, গন্ধ শুঁকে এসে হাজির হবে— চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে ওকে। কেউ জানতেই পারবে না, আজ রাতের মধ্যেই ও হজম হয়ে যাবে বাঘের পেটে। চোখ বুজে কতক্ষণ শুয়ে ছিল বলতে পারবে না, হঠাৎ চোখ মেলেই দেখতে পেল, টিলার ওপর ছায়াভরা গ্র্যানেট পাথরের স্ল্যাবে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল, কালো এক ভয়ঙ্কর নেকড়ে!

মুখ তুলে ওটাকে দেখেই চমকে উঠে বসল পল, চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু পারল না; গলা শুকিয়ে কাঠ।

ওই নেকড়ের পাশেই ডাকাতের মত লম্বা এক লোক!

একটা লোক... সঙ্গে মস্ত নেকড়ে?

হ্যাঁ, লোক। আর নেকড়ে!

চাঁদের রুপালি আলোয় জ্বলজ্বলে চোখে নেকড়েটা দেখছে ওকে। বেরিয়ে আছে সাদা, বড় বড় দাঁত।

ভীষণ ভয় পেল পল। স্থির হয়ে গেছে মূর্তির মত।

উপরের স্ল্যাব থেকে নেমে আসছে লোকটা। পাশেই নেকড়ে। কোনও শব্দ করছে না তারা। তারপর নরম সুরে কথা বলল লোকটা। 'কিচ্ছু ভয় নেই, খোকা।'

এক ছুটে এসে পলের গালে গরম নাক ঘষে দিল নেকড়ে।

হাসতে চাইল পল। কাঁপা দু'হাতে ধরল নেকড়ের ঘাড়।

কয়েক সেকেণ্ড পর পলকে বুকে তুলে নিজের কোটে মুড়িয়ে নিল লোকটা। ঠাণ্ডা মাটি স্পর্শ করছে না পলের পা। গাছের

সারির ভিতর দিয়ে রওনা হয়ে গেল লোকটা ওকে নিয়ে। পাশেই হাঁটছে কালো নেকড়ে। তখনই আরম্ভ হলো তুষার ঝড়ের প্রথম তোড়। তুমুল বেগে বইছে হাওয়া। তবুও ভয় পেল না পল। এই লোকটা তার কোটে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছে ওকে।

শীতল ঝড়ের মাঝেও গরম হয়ে উঠছে পলের শরীর। ভাবল, এত শক্তিশালী লোক নিশ্চয়ই ওকে মরতে দেবে না? অন্তরের গভীরে বুঝে গেল, এই মানুষটার কাছে ও খুব নিরাপদ।

'সত্যিই, কসম খোদার,' মাথা নাড়লেন শেরিফ হফম্যান, 'আপনি যে সত্যিই বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন, মিস্টার রানা, আমরা কেউ তা ভাবতেও পারিনি!'

দুলন্ত গাছের ডালের আঘাতে ছড়ে যাওয়া হাত ও মুখ রানার, কোনও কথা না বলে চুমুক দিল কড়া, কালো কফিতে।

ওরা আছে শেরিফের অফিসে। রাস্তার ধারে সার দিয়ে দাঁড়ানো লোকগুলোর মধ্যে থেকে ছুটে এসে চিলের মত ছোঁ দিয়ে বাচ্চাটাকে বুকে তুলে নিয়েছিল মা। কীভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না বাবা, তোতলা মানুষ, তোতলাচ্ছিল আরও। তারপর সবাই মিলে সে কী আনন্দ! কে কার আগে হাত মেলাবে... আনন্দে ফেটে পড়েছিল গোটা শহর। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জানতে চাইল রানা, 'বাচ্চাটা সুস্থ আছে তো?'

'হ্যাঁ,' নিজের কাপে আরও কফি ঢাললেন শেরিফ। 'ডাক্তার বলেছে, একটু ডিহাইড্রেশন হয়েছে, শকের ভেতর আছে, কিন্তু ফ্রস্ট বাইট নেই। হাসপাতালে ভর্তি করে নিয়েছে। ওর বাবা-মা ফোন করেছিল। তারা আপনাকে বিশেষ ভাবে সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়।'

আরেক চুমুক কফি নিল রানা। 'তাদেরকে বলবেন, আমি খুশি যে পল সুস্থ।'

নীরবতা নামল ঘরে।

মনোযোগ দিয়ে মাসুদ রানাকে দেখলেন শেরিফ হফম্যান।

বাঙালি যুবকের চেহারা দেখলে মনে হয় সে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর লোক। চওড়া দুই কাঁধ, ব্যায়াম করা দেহ, কিন্তু এসব নয়, দেখা মাত্র আকর্ষণ করে অন্য কিছু– ওই দুই চোখের গাঢ় কালো মণি। ওখানে আছে অদ্ভুত মায়া। নিজেকে যেন লুকিয়ে রেখেছে সবার কাছ থেকে। কিন্তু কখনও কখনও ধরা পড়ে যায় ওর নরম অন্তর।

'মিস্টার রানা, আপনি মানুষের সঙ্গে মিশতে পছন্দ করেন না, তাই না?' বললেন শেরিফ। 'আপনার জন্যে বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করতে চাইছে শহরের সবাই। সম্মান হিসেবে এই শহরের চাবি দিতে চাইছে ওরা।'

'এই শহরের কোনও চাবি ছাড়াই তো চমৎকার আছি,' মৃদু হাসল রানা।

'কিন্তু শহরের সবাই যখন আপনাকে সম্মান দিতে চাইছে, আপনি আপত্তি তুলবেন কেন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'অনুষ্ঠান আমার ভাল লাগে না। আর কোনও পুরস্কারের জন্যেও তো কিছু করিনি।'

'কিন্তু... জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাচ্চাটাকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে এনেছেন,' আপত্তির সুরে বললেন হফম্যান। 'আমরা হাজার খানেক লোক ওকে খুঁজে বের করতে পারিনি। ছেলেটা ঠিক মারা যেত আপনি না থাকলে।' চুপ করে আছে রানা। তাতে মোটেও বিরক্ত হলেন না শেরিফ। 'গত বছর জঙ্গল থেকে উদ্ধার করলেন ওই নব দম্পতিকে। চার দিন অনাহারে থেকে ট্র্যাক করে খুঁজে বের করেছিলেন। মরতে বসেছিলেন নিজেই। আপনি না থাকলে লাশ হয়ে যেত ওরা। এসবের জন্যে আপনার পুরস্কার পাওয়া উচিত না?'

'কোনও কারণে আপনাদের মনে স্থান পেয়ে থাকলে, সেটাই আমার জন্যে সেরা পুরস্কার,' বলল রানা।

মাথা দোলালেন শেরিফ। জানতে চাইলেন, 'মিস্টার রানা, শুনলাম এবার চলেছেন মাঞ্চুরিয়াতে? ওখানে কেন?'

'সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউট চাইছে যেন অন্তত একটা সাইবেরিয়ান বাঘ ধরে দিই।' গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'ওই জিনিস পাওয়া যায় না বললেই চলে। কিন্তু কয়েক দিন আগে একটা নাকি দেখা গেছে। হয়তো ওখানে আর নেই, আবার থাকতেও পারে। চেষ্টা করে দেখব ধরতে পারি কি না।'

মৃদু হাসলেন শেরিফ হফম্যান। 'আপনার প্রিয় সেই শ্রদ্ধেয় ডক্টর সিরাজউদ্দীন?' শুকিয়ে গেল তাঁর হাসি। 'শুনেছি, দুনিয়ার সবচেয়ে চতুর আর হিংস্র প্রাণী ওই বাঘ। গ্রিজলির চেয়েও ভয়ঙ্কর। গোপনে পিছু নিয়ে শিকার করে মানুষকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা। 'আমিও তা-ই শুনেছি। সেরা ট্র্যাকার ওই সাইবেরিয়ান টাইগার। নড়তে শুরু করার আগে আওয়াজ করে না, আর সব সময় অ্যাম্বুশ করে আচমকা। আগেও একটা ধরেছি। কিন্তু এবারেরটা অন্যরকম।'

'কোন্ দিক থেকে আলাদা?'

'জঙ্গল একেবারে ভিন্ন।' ডেস্কে কফির কাপ নামিয়ে রাখল রানা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ডার্ট ছুঁড়তে হবে খুব কম রেঞ্জ থেকে। তিরিশ ফুটেরও কম।'

'তার মানে বাঘের অত কাছে যেতে হবে? আপনার দিক থেকে বাতাস ওদিকে গেলে?'

'কোনও না কোনও উপায় বেরোবে।' একবার হাত নেড়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল মাসুদ রানা।

শেরিফ জর্জ হফম্যান ভাবলেন: খুবই যোগ্য লোক ওই মানুষটা, আর তেমনি বদ্ধ পাগল! এমন ঝুঁকি কেউ নেয়?

দুই

রাতের নিকষ অন্ধকারে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে দ্রুতপায়ে চলেছে সে।

স্প্রুস, বার্চ আর পাইনের ডালপালা দুলিয়ে এলোমেলো করে দিচ্ছে শীতল হু-হু হাওয়া। হঠাৎ থেমে বার কয়েক বুক ভরে বাতাস নিল সে। প্রতি দমে ফুলে উঠছে পেশিবহুল, প্রশস্ত বুক। তার জানা আছে, পায়ের নীচের সব শেওলা টিকে আছে শত শত শতাব্দী ধরে। অন্তত বারোটা ফুলের সুবাস রাতের হাওয়ায়, আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তাকে। এসব ফুলের কথা ভাল করেই জানে সে। কাছের গাছটার বাকল উপশম করে ব্যথা। আর ওই দিকের গাছটার শেকড় খেলে ভরে পেট। প্রতিটি গাছের গোপন তথ্য তার জানা। কী ধরনের কাজে ব্যবহার হয়, তা-ও অজানা নয়। অথচ এই এলাকা তার অচেনা। অনেক দূর থেকে এসেছে সে। কিন্তু বুঝতে পারছে, এই অঞ্চলে ভালভাবেই বাস করতে পারবে।

পৃথিবীর অন্য যে-কারও চেয়ে অনেক ভালভাবে।

ওই যে, গেটের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে গার্ড।

এবার সময় হয়েছে।

তার জানা আছে, কুকুর গায়ের গন্ধ পাওয়ার আগেই শেষ করতে হবে কাজ। মানুষের চেয়ে ঢের তীক্ষ্ণ শিকারি অনুভূতি কাজ করছে মগজে। একটা উদ্দেশ্য আছে তার। আর সেজন্য এগোতে লাগল গেটের দিকে।

মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাও কাজ করছে মগজে, আর আছে প্রচণ্ড দৈহিক ক্ষমতা ও পাশবিক হিংস্রতা। কুঁজো হয়ে খালি পায়ে হেঁটে চলেছে নিঃশব্দে। ভূতের মত বেরিয়ে এল ঘন অরণ্য থেকে— যেন চাঁদের মরা আলোর আবছায়ায় শেওলাময় বনভূমি থেকে হাজির হয়েছে মারাত্মক এক প্রেতাত্মা গেটের খুব কাছে। কেউ জানে না, কী করবে সে, কেন।

একেবারে শেষ সময়ে দানবের মত ভুতুড়ে অবয়বটা দেখল গার্ড অন্ধকারে, হতবাক হয়ে গেল ভয়ে। পরক্ষণে চিৎকার করে ঘুরেই গুলি ভরল রাইফেলের চেম্বারে।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে বড্ড।

নখরওয়ালা মস্ত থাবার প্রচণ্ড এক থাবড়া খেয়ে ঘাড় থেকে ছিটকে চলে গেল প্রথম গার্ডের মাথা, ঝর-ঝর করে ঝরছে তাজা রক্ত। ওই একই সময়ে ফড়ফড় করে বুক চিরে দ্বিতীয় গার্ডের কলিজাটা ছিঁড়ে নিয়ে কচমচিয়ে চিবিয়ে খেল সে। দূরের তারকাঁটার বেড়ার কাছে ঘেউ-ঘেউ করছে কুকুর। তীরের মত ছুটে এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল এক জার্মান শেফার্ড। পরক্ষণে উল্টোদিকে উড়ে গেল ওটার দ্বিখণ্ডিত দেহ। যে শক্তি ব্যবহার করে কুকুরটাকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, তা কোনও মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে।

তার জন্য এসব কিছুই নয়। গুলি শুরু করেছে তৃতীয় গার্ড। পাঁজরের হাড় উপড়ে নেয়ায় মরতে সময় নিল মাত্র তিন সেকেণ্ড।

কয়েক মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল সব লড়াই।

নিচু ঘড়-ঘড়ে গর্জন ছেড়ে রক্তাক্ত তুষার দেখল সে, ঘুরে চাইল এই ফ্যাসিলিটির সিকিয়োর ভারী, ধাতব দরজার দিকে। ছুটন্ত গণ্ডারের চেয়েও দ্রুত পৌঁছে গেল ওখানে। আগেই দেখে নিয়েছে চারপাশ। প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে দুই হাতে স্টিলের দরজার কিনারা ধরতেই মড়-মড় করে উঠল কবাট। পরক্ষণে বজ্রপাতের

শব্দ তুলে গোটা প্যানেল উপড়ে এল রিইনফোর্স্‌ড্‌ কংক্রিটের দেয়াল থেকে।

সামনে আলো দেখে সরু হলো তার লাল দুই চোখ। মৃত্যুভয়ে আর্তচিৎকার করে উঠেছে ভেতরের সাদা ল্যাব-কোট পরা লোকজন, ঘুরেই দৌড় দিল তারা। কিন্তু রক্ষা নেই কারও!

সন্তুষ্ট গর্জন ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আততায়ী অসহায় বিজ্ঞানী ও ল্যাব-সহকারীদের উপর। ছিটকে পড়ছে দুর্বল মানুষের রক্তাক্ত লাশ। এদের লাশ চাই তার। লাশ...

কেউ বাঁচবে না তার হাত থেকে!

তিন

'ছোট হলে হবে কী, মারাত্মক হিংস্র দানব, তা-ই না?' বলে উঠেছেন সাদা ল্যাব-কোট পরা বয়স্ক প্রফেসর, পক্বকেশ আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি— ধর্মব্যবসায়ী ও পাকিস্তানপন্থী বেঈমানদের ওপর খেপে গিয়ে বাঙালি জাতির নাম জুড়ে নিয়েছিলেন নিজের নামের শেষে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে। এখন মনোযোগ দিয়ে দেখছেন লাল পিঁপড়ার সেনাবাহিনী— কোনও কোনও পিঁপড়া দৈর্ঘ্যে মানুষের বুড়ো আঙুলের সমান। প্রফেসর যা ফেলেছেন অ্যাকুয়েরিয়ামে, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওরা। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে খুন হয়ে গেছে ইঁদুর বিষক্রিয়ায়। এখন আরাম করে তার মাংস সাবাড় করছে পিঁপড়ার দল। কিন্তু মাত্র তিন মিনিট পর থাকল শুধু সাদা কয়েকটা হাড়।

স্টপওয়াচ বন্ধ করলেন ডক্টর সিরাজউদ্দীন, আবারও দেখলেন অ্যাকুয়েরিয়াম। কুঁচকে গেছে ভুরু। 'হ্যাঁ, সত্যিই ভয়ঙ্কর হিংস্র।'

সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের ল্যাবোরেটরিতে উপস্থিত সহকারীদেরকে ঘুরে দেখলেন দুনিয়া-সেরা ক্রিপটো-যুলোজিকাল জিনিয়াস। যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'ওদের দিয়ে কী করব আমরা? শিকারকে খাওয়ার আগেই খুন করে ফেলছে বিষ দিয়ে।' আরেকবার অ্যাকুয়েরিয়াম দেখে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আগে বের করতে হবে এদের বিরুদ্ধে সিরাম... নইলে বিরক্ত করে ছাড়বে ডাক্তার আর ড্রাগস কোম্পানি। ...তোমাদের কেউ বিষের মলিকিউলার ওজন পেলে?'

প্রকাণ্ড এক ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সামনে থেকে বিড়বিড় করল এক মহিলা, 'এখনও না, ডক্টর। আরও দু'এক মিনিট লাগবে।'

মুখ ফিরিয়ে আবারও অ্যাকুয়েরিয়াম দেখলেন সিরাজউদ্দীন। কাঁচের ওদিকে পিলপিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিষাক্ত পিঁপড়াগুলো। ওরা ছাড়াও ল্যাবোরেটরিতে রয়েছে দুনিয়ার প্রায় সব ধরনের বিষাক্ত প্রাণী– কীটপতঙ্গ, স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপ। এই মস্ত ঘরে রয়েছে কালো কাঁকড়াবিছা, গোক্ষুর, অ্যাডার, স্টোনফিশ, নিঃসঙ্গচারী বাদামি মাকড়সা, ভয়ানক বিষাক্ত সিডনি ফানেল ফাঁদপাতা মাকড়সা। শেষের ওটার কামড়ে কেউ টের পাবে না কী হয়ে গেল, কিন্তু বিষ রক্তে মিশে গেলে মরতে হবে পূর্ণবয়স্ক লোককে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর। ওটার অ্যান্টি-ভেনম তৈরি করেছেন স্বয়ং আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি।

'এদের বিষ সম্ভবত নিউরোমাসকিউলার জাতের,' রেকর্ডারের জন্য মুখ খুললেন তিনি। হাতের ইশারা করলেন। মাথা দোলাল ভিডিয়ো টেকনিশিয়ান। পিঁপড়ার নৃশংস ওই হত্যাকাণ্ডের ছায়াছবি

তুলেছে সে। 'শিকারের যেখানেই বিষ ঢেলে দিচ্ছে, অনায়াসেই তার দেহের লিগামেন্টাম ভেদ করছে। অবশ হচ্ছে মেডুলা অবলংগাটা, ফলে বন্ধ হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাস। এখন কথা হচ্ছে, আমরা যদি...

'ডক্টর?'

সাদা, ঝোপের মত ভুরু কপালে তুলে ঘুরে চাইলেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি। হাঁটু ছোঁয়া কালো চুলের এক তরুণী বিজ্ঞানী এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে। নেপালি মেয়েটা জানে, কাজে বাধা পড়লেও বিরক্ত হবেন না ডক্টর। সব সময় ধৈর্য ধরে সবার কথা শোনেন, এখানে চাকরি নেয়ার পর একবারও দেখেনি, কখনও কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন বাঙালি বিজ্ঞানী।

'হ্যাঁ, টিপা,' নরম সুরে বললেন তিনি, 'কী বলবে?'

'কয়েকজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, স্যর।'

মৃদু হেসে আবারও অ্যাকুয়েরিয়ামের দিকে ফিরলেন বৃদ্ধ। 'বাছা, এত লোক দেখা করতে চাইছে, কিন্তু সময় কোথায় তাদের সঙ্গে কথা বলার? এখনও আমাদের ক্যান্টিন খোলা, ওখানে গিয়ে ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলো। আজকাল দারুণ মুরগির রোস্ট করছে গাফ্ফার আলী।'

'এঁরা অপেক্ষা করবেন না, স্যর,' বিজ্ঞানীর এক ফুটের ভিতর পৌঁছে গেল টিপা মুই, চোখ বিস্ফারিত। গলা নিচু করল, 'তিনজন তাঁরা। দু'একজনের পরনে ইউনিফর্ম।'

স্মিত হাসলেন সিরাজউদ্দীন, 'ইউনিফর্ম? কীসের ইউনিফর্ম?'

'আর্মির ইউনিফর্ম, স্যর!'

হাসি ম্লান হলো না বিজ্ঞানীর, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'বেশ, টিপা, জোর করে ঠেলে দিচ্ছ বিপদে, নিজে রয়ে যাও নিনার কাজে সাহায্য করতে। ওই বিষের মলিকিউলার ওজন বের

করবে। ...ও, আরেকটা কথা, পঞ্চাশটা পিঁপড়ার বিষ চাই। ইলেকট্রোশক মেথডে ক্লোরোফর্ম দেবে– ঠিক ওই কালো বিধবা মাকড়সার মতই।' চোখ থেকে চশমা খুলে বুক পকেটে রেখে দিলেন। 'আমি দেখে আসি এত অধৈর্য কারা।'

'জী, স্যর। তাঁরা অপেক্ষা করছেন অবযার্ভেশন রুমে।'

'বেশ, যাচ্ছি।'

ল্যাবোরেটরি থেকে বেরিয়ে অবযার্ভেশন রুমে এলেন বিজ্ঞানী, কিন্তু দরজা পেরিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে কেউ ভাববে না, যৌবনে তিনি দুর্দান্ত সুপুরুষ বা আকর্ষণীয় ছিলেন। পিছনে ফেলে এসেছেন বাহাত্তর বছর, চুল সব কাশ ফুলের মত সাদা, মোটা ভুরুও; চওড়া কপালে ভারী কয়েকটা ভাঁজ। কিন্তু আয়নার মত ঝকঝক করছে দুই চোখ, চট্ করে যে-কেউ বুঝবে, সামনের ওই বৃদ্ধের মগজ আসলে ক্ষুরের মত ধারালো। ঝট্ করে বুঝে ফেলেন জটিল সব রহস্যের সমাধান। আসলে শিল্প, বিজ্ঞান আর বুদ্ধিমত্তার সমন্বয় ঘটিয়েই তিনি হয়ে উঠেছেন দুনিয়া-সেরা প্যালিয়োনটোলজিস্ট ও ক্রিপটো যুলোজিস্ট।

অনেকেই জানেন না, আসলে বায়োলজির বিশেষ একটি অংশ ক্রিপটোযুলোজি। গোটা দুনিয়ায় নামকরা বড়জোর বারোজন বিজ্ঞানী কাজ করছেন ওই বিষয়ে। বেশিরভাগ বিজ্ঞানী জানেনও না, এ শাখায় কাজ করছেন কেউ। সংক্ষেপে বললে: বিজ্ঞানের এই জটিল বিষয় কঠিন সব যুক্তি প্রয়োগ করে খুঁজে বের করে, যেসব প্রাণীকে ধরে নেয়া হয়েছে বিলুপ্ত, সেসব কেন এখনও রয়ে গেছে পৃথিবীতে।

বয়স চল্লিশ পেরিয়ে যাওয়ার পর ক্রিপটো যুলোজির প্রাঙ্গণে পা রাখেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি। পরের তিন দশকে হয়ে ওঠেন সেরাদের সেরা। চিলির আন্দেজ পর্বতে আবিষ্কার

করেন জীবিত অ্যাটাকামা শকুন, তারপর গ্রিনল্যাণ্ডের উত্তর উপকূলের গভীর সাগরে অন্ধ স্টোনফিশ। সবাই ধরে নিয়েছিলেন প্যালিয়োনলিথিক পিরিয়ডেই হারিয়ে গেছে ওই মাছ। কিন্তু থিয়োরির মাধ্যমে প্রথমে ডক্টর সিরাজউদ্দীন প্রমাণ করেন, গ্রিনল্যাণ্ডের পুব স্রোতের দক্ষিণে রয়ে গেছে ওই মাছ। ওরা আসছে আর্কটিক সাগর থেকে। তাঁর গবেষণা-পত্রে জানান, আর্কটিক সার্কেলের উপরের অংশে মেরু বিন্দুর কাছে বরফের নীচে আরামসে বাস করছে অন্ধ স্টোনফিশ। কিন্তু ফাণ্ড জোগাড় করতে পারেননি বলে আরও গবেষণা করা সম্ভব হয়নি।

অবশ্য, তাঁর আশ্চর্যজনক আবিষ্কারের কারণে বিজ্ঞানীদের সমাজে হয়ে ওঠেন পরিচিত। আর এ কারণেই তাঁর কাজের বিষয়ে আগ্রহী হন কয়েকজন ধনী ফিলানথ্রোপিস্ট। তাঁরা দেখেন: লোভহীন, নিষ্কলঙ্ক আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালির মুনাফা-শূন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান সত্যিই কাজে আসবে গোটা বিশ্বের মানুষের। ফলে ডোনেশন দিতে শুরু করেন তাঁরা। আর ফাণ্ড পেয়ে বড় আকারে সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের কাজ শুরু করেন বাঙালি বিজ্ঞানী। দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। আর এখন দুই দশক পেরিয়ে যাওয়ার পর দুনিয়ার প্রায় সব বিজ্ঞানী চেনেন তাঁকে। অচেনা সব স্পিশিস এবং তাদের টিকে থাকবার বিষয়ে আর সবার চেয়ে অনেক বেশি জানেন তিনি। বিজ্ঞানীরা বুঝে গেছেন: বিশেষ করে ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সব সাপ, মাছ, মাকড়সার বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের তুলনা হয় না। নানান বিষের মলিকিউলার চরিত্র চট্ করে ধরে ফেলেন তিনি।

প্রথমে নানান বিষ নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন কয়েকটি মেডিকেল ইন্সটিটিউটকে সহায়তা দেয়ার জন্য। কিন্তু তাঁর আবিষ্কার করা অ্যান্টি-ভেনমের চাহিদা বাড়তে লাগল দুনিয়া

জুড়ে। গবেষণা করে বের করলেন, অন্তত বারো ধরনের বিষের প্রতিষেধক। সেজন্য চার আনা পয়সাও নেননি তিনি কারও কাছ থেকে। তাঁর লেখা বই, তাঁর লেকচার তাঁকে করে তুলেছে বায়োলজির এক সত্যিকারের মস্ত সাধক।

শুধু যে অ্যাকাডেমিকরা সহায়তা চেয়েছেন, তা নয়, নানান সরকারী এজেন্সি সাহায্য চেয়ে কখনও ফিরে যায়নি তাঁর কাছ থেকে। একবার সিআইএ আবদার করল, তাদের ফিযিশিয়ানরা যা বের করতে পারছে না, তা করে দিতে হবে। ভয়ঙ্কর এক বিষের প্রতিষেধক তৈরি করলেন তিনি। আফ্রিকার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া মারাত্মক এক ভাইরাসের অ্যান্টি-সিরাম আবিষ্কার করে রক্ষা করলেন হাজার হাজার মানুষকে।

এখন তাঁর চৌকো মুখে দেখা দিয়েছে মৃদু হাসি। খেয়াল করেছেন, অতিরিক্ত চকচক করছে কর্নেলের ইউনিফর্মের রুপালি ওক গাছের পাতার মত ব্যাজ। পাশেই এক মেজর, আরেক পাশে অচেনা সংগঠন থেকে আসা এক লোক। শেষেরজনের পরনে সিভিলিয়ান পোশাক। কিন্তু সিরাজউদ্দীন বুঝে গেলেন, এঁদের তিনজনের ভিতর ক্ষমতা বেশি এঁর। হাতে জ্বলছে সিগারেট। বসে আছেন চেয়ারে।

প্রতিটি উচ্চারণ নিখুঁত, ব্যাকব্রাশ খাটো ধূসর চুলের কর্নেল বললেন, 'ডক্টর সিরাজউদ্দীন, আমি আর্মির লেফটেন্যান্ট কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ান। আর এ মেজর জন পিটারসন। আর ইনি...' হাতের ইশারায় ভদ্রলোককে দেখালেন। 'মিস্টার জেম্স সিমন্স। ডিপার্টমেন্ট অভ ইন্টেরিয়রের হয়ে লিয়াসোঁ করছেন।'

হাসিমুখে কয়েক মুহূর্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেলের ওজন বুঝে নিলেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি। এই লোক সব কর্তৃত্ব নিজের হাতের মুঠোয় ভরতে চান। পদ কী, সেই বিষয়ে সব সময় সতর্ক। এ কারণেই অতিরিক্ত চকচক করছে ইনসিগনিয়া। মুখটা

ফোলা, ইউনিফর্ম ছিঁড়ে বেরোতে চাইছে সামলে রাখা পেট। কথার সময় পিছনে বেঁধেছেন দুই হাত। 'এত দ্রুত আমাদের সময় দেয়ায় ধন্যবাদ, ডক্টর। কথা দিচ্ছি, বাড়তি সময় নেব না।'

যেভাবে কথা বলেছেন, সামান্য বিরক্ত হলেন বাঙালি বিজ্ঞানী। তাঁর যেন উপায় নেই এঁর কথা না শুনে! তবে চোখে-মুখে কিছুই প্রকাশ পেল না। গিয়ে বসলেন রহস্যময় মিস্টার সিমন্সের উল্টোদিকের চেয়ারে। 'সবার জন্যেই আমার দরজা খোলা, লেফটেন্যান্ট কর্নেল।' ভদ্রতার ত্রুটি নেই কণ্ঠে: 'হয়তো জানেন, ক'দিন আগেও মিলিটারির এক রিসার্চ টিমের হয়ে ডিযাইন করে দিয়েছি আপনাদের আর্কটিক সার্ভাইভাল প্রোটোকল। কাজেই বিনা দ্বিধায় বলুন কী জন্যে এসেছেন।'

আপাতত দায়িত্বে আছেন রব ম্যাক্সিমিলিয়ান, বুঝে গেলেন তিনি। মিটিঙে সাক্ষী হিসাবে আর টুকটাক নোট নেয়ার জন্য এসেছে মেজর জন পিটারসন। তৃতীয়জন জেন্স সিমন্সের কাজ কী, তা বোঝা গেল না।

'এখানে এসেছি, ডক্টর, কারণ আপনি আর্কটিকের বিষয়ে আমাদের অনেকের চেয়ে অনেক বেশি জানেন,' বললেন চকচকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'ক্রিপটোযুলোজির সেরাদের একজন।' টেবিলের পাশ দিয়ে পায়চারি শুরু করেছেন। 'কাজেই ধারণা করছি, বাজে এক পরিস্থিতিতে আপনার কাছ থেকে সহায়তা পাব।'

আপাতত মুখ বুজে রইলেন বাঙালি বিজ্ঞানী। চেয়েও দেখলেন না মিস্টার সিমন্সের দিকে। অবশ্য, কয়েক মুহূর্ত পর সহজ সুরেই বললেন, 'হয়তো সাহায্য করতে পারব।'

খুব সতর্কতার সঙ্গে মূল কথায় এলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান: 'ডক্টর, আমরা আর্কটিকের এক হিংস্র প্রাণীর বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করব। বিশেষ করে আলাস্কা আর উত্তর প্রদেশের

গভীর জঙ্গল-পাহাড়ে থাকে সে।' ডক্টর আহমেদ সিরাজউদ্দীনের সামনে থামলেন। 'গত কয়েক দিন আগে ট্রেইনিঙে ব্যস্ত এলিট মিলিটারি স্কোয়াডের ওপর হামলা করেছে। আমাদের ছেলেদের খুন করে ফেলেছে। আমরা এখন জানতে চাই, ওটা কী ধরনের জন্তু।'

ভাবলেশহীন ভাবে তথ্যটা হজম করলেন বিজ্ঞানী। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'আমার মনে হয়, আলাস্কার ওয়াইল্ডলাইফ অফিশিয়ালরা আমার চেয়ে ঢের ভাল বলতে পারবেন ওই বিষয়ে। বুঝতে পারছি না এসবের সঙ্গে আমি বা ক্রিপটোযুলোজির সংযোগ কোথায়। আসলে অনেক বছর আগেই যেসব প্রাণী পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে, কিন্তু আসলে রয়েছে এখনও, সেই বিষয়ে কাজ করে ক্রিপটোযুলোজি। যেমন ধরুন, উনিশ শ' সাতাত্তর সালে নিউ যিল্যাণ্ডের ক্রাইস্টচার্চের কাছের প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানিজ ফিশিং ভেসেল যুইয়ো ম্যাম-এ যেভাবে হামলা করেছিল এক সরীসৃপ, জাল টেনে নিয়ে গিয়েছিল নয় শ' ফুট নীচে– এসব নিয়ে কাজ করে ক্রিপটোযুলোজি।' চুপ হয়ে গেলেন ডক্টর, কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'বা, আশির দশকে ইউ.এস.এস. স্টার্ন-এ অচেনা যে প্রাণী হামলা করেছিল, ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছিল সোনার সিস্টেম, জাহাজের খোলে কামড়ের অসংখ্য দাগ রেখে গিয়েছিল– এসব বিষয়ে গবেষণা করে ক্রিপটোযুলোজি। তখন ওই জাহাজ পরীক্ষা করে দেখেছিল ন্যাভাল ওশন্স সেন্টার। বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছিল, সাগরের অচেনা মস্ত কোনও দানব হামলা করেছিল সোনার সিস্টেমকে।'

নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান, আড়ষ্ট চেহারা। 'তা ঠিক, ডক্টর। সেসব দুর্ঘটনার কথা আমরা শুনেছি। সাগরে ওই ধরনের কিছু থাকতে পারে। কিন্তু সেসব

কারণে এবার আপনার কাছে আসিনি আমরা।'

'তাই?' মৃদু হাসলেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন। 'তা হলে বলুন কী কারণে এসেছেন? আপাতত জরুরি কাজে ব্যস্ত আমি।'

গম্ভীর মুখে মেজরের কাছ থেকে ফাইল নিয়ে ওটা থেকে ফুল সাইযের কয়েকটা রঙিন ছবি টেবিলে বিছিয়ে দিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান।

বুক পকেট থেকে বের করে নাকে চশমা তুললেন বাঙালি বিজ্ঞানী। দুই হাতে ধরলেন একটা ছবি। এতই দ্রুত মনোনিবেশ করেছেন, যেন এক সেকেণ্ডে এই ঘর থেকে চলে গেছেন কোটি মাইল দূরে।

ঘরে পিন পতন নীরবতা। চুপচাপ ছবি দেখছেন, ধীরে ধীরে কুঁচকে উঠছে বিজ্ঞানীর ভুরু। সামান্য বাঁকা হয়ে গেল ঠোঁটের কোণ। আরও কিছুক্ষণ পর আবারও মন দিলেন প্রথম ছবিতে। আট বাই দশ ইঞ্চি সাইজের একটা ছবি তুলে নিয়ে নাকের কাছে ধরলেন। তীক্ষ্ণ চোখ তাঁর কিছুই এড়াচ্ছে না। 'লেফটেন্যান্ট কর্নেল,' ছিন্নভিন্ন সৈনিকদের লাশের দিকে চেয়ে আছেন, 'এসব ক্ষত কি একই জন্তু করেছে?'

দ্বিধাহীন ভাবে বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'জী।'

'আপনারা শিয়োর?'

'হ্যাঁ, ডক্টর, আমরা নিশ্চিত।'

'কীভাবে শিয়োর হলেন? পুরো নিশ্চিত না হলে কখনও মন্তব্য করা হয় না বিজ্ঞানের মাঠে।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'আবছা কিছু ভিডিয়ো ইমেজ পেয়েছি আমরা। ভাল করে কিছু দেখা যায়নি, আক্রমণ করেছে কী ধরনের জন্তু। আর, ডক্টর, আমরা নিশ্চিত নই, ওখানে একটা ছিল, না দুটো। প্রমাণ বলতে শুধু ছবি। ওই হামলা থেকে আমাদের মনে হয়েছে, মাত্র একটাই ছিল।'

কোনও কথা না বলে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের ছবি দেখছেন বাঙালি বিজ্ঞানী, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছবিটা বেছে নিলেন। চকচকে কাগজ স্পর্শ করলেন, মনে হলো অন্তর থেকে বুঝতে পারছেন মারা যাওয়ার আগে কেমন কষ্ট পেয়েছে সৈনিক। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'এই কাজ আর্সাস আর্কেটস হরিবিলিসের নয়।'

ধৈর্য রাখতে পারলেন না লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'একটু খুলে বলবেন, ডক্টর?'

'গ্রিজলি ভালুক এই কাজ করবে না,' কাছ থেকে ছবিটা দেখলেন বিজ্ঞানী। পায়ের ছাপ আছে বালিতে। সোজা দৌড়ে চলে গেছে দূরের একঝাড় গাছের আড়ালে। কিন্তু পায়ের ছাপের তিন ফুট দূরে আরেক ধরনের ট্র্যাক। ওই ট্র্যাকও সোজা গেছে ঝর্নার পাশ দিয়ে।

'কিন্তু কথা হচ্ছে...' দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি। 'এটা খুব অস্বাভাবিক।'

'কী অস্বাভাবিক?' জানতে চাইলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

'ছাপ যেভাবে গেছে।'

'আমাদের ট্র্যাকাররাও একই কথা বলেছে, ডক্টর। ক্যামেরা থাকলেও তেমন কিছুই জানতে পারিনি। স্যর, আপনার কি মনে হয় ওখানে দুটো জন্তু ছিল?'

সময় নিয়ে ভাবলেন বাঙালি বিজ্ঞানী, তারপর বললেন, 'কর্নেল, আমি ট্র্যাকিঙের এক্সপার্ট নই। ওই বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে পারব না। কিন্তু আমার মনে হয় না, এসব খুনের পেছনে দুটো জন্তু ছিল।'

'কিন্তু মূল ছাপ থেকে দূরের ট্র্যাকের কী ব্যাখ্যা দেবেন?'

'ব্যাখ্যা দিতে পারব না। আগেই বলেছি, আমি ওই বিষয়ে পারদর্শী নই।'

'কিন্তু আপনি নিশ্চিত হয়ে বলছেন, এসব গ্রিজলির কাণ্ড নয়?

হয়তো পোলার ভালুক? বা বাঘ?'

'না, গ্রিজলি নয়, বাদামি ভালুকও নয়,' আহমেদ সিরাজউদ্দীন মাথা নাড়লেন। 'গ্রিজলির পাঁচটা আঙুলের ছাপ পড়ে। কিন্তু এই জন্তুর স্পষ্টভাবে পড়েছে চারটে আঙুলের ছাপ। অন্যটা দুর্বল। ছাপ প্রায় মানুষের মতই।' চুপ হয়ে গিয়ে একটু পর আবারও বললেন, 'মানুষের সঙ্গে মিল খুব বেশি।' নীরবতা নামল ঘরে। সামান্য বিরতি নিয়ে বললেন, 'না, এই জন্তু কোনও ধরনের ভালুক নয়। ওই খুনখারাবি করতে পারত বাঘ, কিন্তু ছাপগুলো... মনে হচ্ছে মানুষের মতই কোনও প্রাণীর। কোনও খুনি বলেই ধারণা করছি আমি।'

'কিন্তু, ডক্টর, কোনও মানুষের সাধ্য নেই, এতজনকে খালি হাতে এভাবে খুন করবে,' প্রথমবারের মত মুখ খুললেন জেন্স সিমন্স।

বাইফোকাল চশমার উপর দিয়ে ভদ্রলোককে দেখলেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন। 'যথেষ্ট প্রমাণ হাতে না এলে কিছুই বলা সম্ভব নয়, কাজেই সে চেষ্টাও করব না আমি।' কাঁধ ঝাঁকালেন। 'বিজ্ঞানের নিয়মই এমন।'

চেয়ারে পিঠ হেলান দিয়ে বসলেন জেন্স সিমন্স, নীরবে ফুঁকতে লাগলেন সিগারেট।

বাঙালি বিজ্ঞানী পকেট থেকে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস বের করতেই তাঁর উপর প্রায় ঝুঁকে এলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও মেজর।

কিছুক্ষণ ছবি পর্যবেক্ষণ শেষ করে বললেন সিরাজউদ্দীন, 'এসব ছাপ... কত দূর পর্যন্ত অনুসরণ করেছে আপনাদের লোক?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?' জানতে চাইলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

'কারণ একই এলাকা দখল করে রাখা কোনও জন্তুর ছাপ নয়

এসব।'

'মানে, ডক্টর? একটু খুলে বলুন।'

'এসব ছাপ টেরেস্ট্রিয়াল জন্তুর নয়,' বললেন বিজ্ঞানী। 'বাঘ হাঁটলে বা দৌড়াবার সময়েও নিজের রাজত্ব সম্পর্কে জরুরি তথ্য বা ছাপ রাখে। নির্দিষ্ট দূরত্বে থাবা রেখে এগোয়। এসব ছবিতে বাড়তি দুই থাবার ছাপ নেই। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এসব ট্র্যাক গ্রিজলির নয়। যদিও থাবার আকার দেখে প্রথমে তেমনটাই ভেবেছিলাম।'

'হ্যাঁ, আমাদের মিলিটারি ট্র্যাকাররাও একই কথা বলেছে,' বললেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলে যাওয়ার পর ওই ছাপ হারিয়ে ফেলে তারা। আমাদের বলেছে, পাথুরে এলাকায় কেউ ট্র্যাক করতে পারবে না। ওই জন্তু যেন বুঝতে পেরেছে, অনুসরণ করে তাকে খুন করতে চাইব আমরা।'

'আমরা যা মনে করি, তার চেয়ে ঢের বেশি চালাক হয় বেশিরভাগ প্রাণী,' চট্ করে একবার জেন্স সিমন্সকে দেখে নিলেন বিজ্ঞানী। লোকটা চুপ করে বসে সিগারেট টানছে। 'ওটা কোনও বাঘ নয়। কোনও ধরনের বিড়াল জাতের প্রাণী বা কুকুর শ্রেণীর নয়। বড় আকারের কোনও ভালুকও নয়। ওটার ছাপ বাইপেডাল, আমাদের মত মানুষের মতই প্রায়।'

অন্য তিনজন অপেক্ষা করছেন, কিন্তু আর কিছুই বললেন না আহমেদ সিরাজউদ্দীন, ল্যাব-কোটে রেখে দিলেন ম্যাগনিফায়িং গ্লাস ও বাইফোকাল। দু'হাতের ভাঁজে রাখলেন থুতনি। অন্যদের কথা শুনতে তৈরি।

'বাইপেডাল?' জানতে চাইলেন সিমন্স। 'এর মাধ্যমে কী বোঝাতে চাইছেন, ডক্টর?'

মৃদু হাসলেন বিজ্ঞানী। 'আমি বোঝাতে চেয়েছি, আপনাদের

সৈনিকদের খুন করেছে দু'পেয়ে কোনও জন্তু, মিস্টার সিমন্স।'

'এ তো অসম্ভব,' আবারও চেয়ারে পিঠ ঠেকালেন জেন্স সিমন্স। 'একমাত্র দুই পায়ে চলে মানুষ, ডক্টর। তা হলে এসব ট্র্যাক রেখে গেছে কী ধরনের প্রাণী, ডক্টর? বিগফুট? নিশ্চয়ই নিজের এলাকার সীমানা থেকে বেরিয়ে যাবে না? আমরা ট্র্যাক করতে পারিনি, কারণ ছাপ হারিয়ে গেছে পাথুরে এলাকায়।'

'আপনার কথার সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন,' ভুরু কুঁচকে ফেললেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন। 'হতে পারে অনেক কিছুই, যা আমি জানি না। তা হলে, এজন্যেই কি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? আপনাদের ট্র্যাকাররা জানিয়ে দিয়েছে: কোনও জন্তুর ছাপের সঙ্গে মিল দেখতে পায়নি এসব ছাপের। তা হলে কি আপনারা এসেছেন অনাবিষ্কৃত কোনও প্রজাতির বিষয়ে জানতে?'

'সত্যি বলতে, আমরা এমনই ভেবেছি,' বললেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'ডক্টর, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এভাবে হামলা হয়েছে বলে তার ফলাফল আমাদের জন্যে খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছে। সিকিয়োর ফ্যাসিলিটির ভেতর পড়ে থাকছে আমাদের মৃত সৈনিকরা। অথচ আমরা জানি না, কে বা কী খুন করছে ওদেরকে। বা কেন খুন হলো ওরা।'

ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত লাশের ছবি আবারও দেখলেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন। 'আমি এই বিষয়ে কোনও জবাব দিতে পারব না,' কয়েক মুহূর্ত পর বললেন। 'শত শত বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে ধরে নেয়া হয়েছে, এমন অনেক প্রজাতি এখনও রয়ে গেছে পৃথিবীর বুকে। কিন্তু এই ধরনের ছাপ ফেলে এমন কোনও জন্তু সম্পর্কে কিছুই জানা নেই আমার।' চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করলেন তিনি। 'আপনাদের প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হলে সায়েন্টিফিক এক্সপিডিশন করতে হবে। লাগবে স্যালিভা

স্যাম্পল, ব্লাড স্যাম্পল, ছাপের প্লাস্টার কাস্ট, চুলের স্যাম্পল, ভিডিয়ো সার্ভেইল্যান্স রেকর্ড ইত্যাদি। আপনারা কি এ ধরনের বড় এক্সপিডিশনের জন্যে যথেষ্ট ফাণ্ড...'

'আইনী কিছু সমস্যার কারণে তা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়,' উঠে দাঁড়ালেন জেন্স সিমন্স। 'আমরা আপনার মূল্যবান মতামত চেয়েছি।' জোর দিয়ে বললেন, 'আপনার মতামত আমাদের জন্যে অত্যন্ত জরুরি।'

তাঁর চোখে চেয়ে রইলেন আহমেদ সিরাজুদ্দীন। বললেন, 'মিস্টার সিমন্স, আমার ধারণা: এজেন্সি মানুষ খুন করল যে জন্তু, তার আছে গ্রিজলির মত শক্তি, গতি সাইবেরিয়ান বাঘের, আর চতুরতা ও ফাঁদে ফেলার কৌশল রয়েল বেঙ্গল টাইগারের। সুন্দরবনের বাঘই দুনিয়ার সবচেয়ে দক্ষ শিকারি। আরও বলব, আপনাদের মিলিটারির ট্র্যাকাররা অনুসরণ করার পরেও যখন আওতার বাইরে রয়ে গেছে ওই জন্তু, এ থেকে বুঝতে হবে, সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান।'

'আচ্ছা, আপনার নিজের কী মনে হয়– ওটা কী হতে পারে?' সামান্য কর্তৃত্ব প্রকাশ পেল সিমন্সের কণ্ঠে।

কাঁধ ঝাঁকালেন বাঙালি বিজ্ঞানী। একবার ছবির দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন, 'এসব ছাপ দেখে আমার ধারণা হয়েছে, বাম দিকের ছাপ কীভাবে হলো তা জানা অসম্ভব।'

তিনি চুপ হয়ে যাওয়ায় নীরবতা নেমেছে ঘরে। কয়েক সেকেণ্ড পর যে যার কাগজপত্র গুছিয়ে নিতে লাগলেন আর্মির দুই অফিসার।

'আপনারা কি ওটাকে ধরতে চান?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন বিজ্ঞানী।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' জোর দিয়ে বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'তাই করব।'

'তা হলে এমন একজনকে খুঁজে নিতে হবে, যে সত্যি জানে কীভাবে ট্র্যাক করতে হয়,' বললেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন। কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন, তারপর নরম সুরে জানালেন, 'আমি এক লোককে চিনি, যে ওই জন্তুকে ট্র্যাক করতে পারবে। ট্র্যাকার হিসেবে তার তুলনা সে নিজেই। কিন্তু আপনাদের কথায় কাজ নেবে কি না, সেটা অন্য বিষয়। নিজের মনের বিরুদ্ধে কিছুই করে না সে।'

এক পা সামনে বাড়লেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'সে কে?'

ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবলেন বিজ্ঞানী, তারপর বললেন, 'তার নাম মাসুদ রানা।'

চার

লালচে সূর্য পাটে বসতেই ঝিরঝিরে হাওয়ায় ভেসে এল পাহাড়ি লরেলের মিষ্টি সুবাস। সাদামাঠা চামড়ার প্যাক খুলে ভিতরের জিনিস টেবিলে রাখছে মাসুদ রানা। বিসিআই চিফ, মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের অ্যাসপেনের বাংলো-বাড়ির সদর দরজা হাট করে খোলা। ছল্-ছল্ আওয়াজ তুলছে একটু দূরের ঝর্না। কিন্তু অন্য কারণে সতর্ক হয়ে উঠল রানা। ঝর্না বইছে, কিন্তু চারপাশের আর সব আওয়াজ হঠাৎ করেই থেমে গেছে।

এই পাহাড়ি বাংলো-বাড়ির চারপাশে জংলা এলাকা। একটু আগেও কূজন করছিল নানান পাখি। এখন থমথম করছে চারপাশ। মুখ তুলে দরজার দিকে তাকাল ও। নুড়ি পাথরের রাস্তা

বেয়ে ধীর গতিতে উঠে আসছে চমৎকার ভাবে টিউন করা কোনও গাড়ি। কিন্তু পৌঁছুতে মিনিট খানেক সময় লাগবে ওটার।

ধীর পায়ে সামনের বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। ওর পরনে নীল, পুরনো জিন্স প্যান্ট ও চামড়ার শার্ট, পায়ে হাঁটু সমান মোকাসিন।

কালো গাড়িটা থামল বারান্দা থেকে দশ ফুট দূরে। নেমে পড়লেন মোটামত এক লেফটেন্যান্ট কর্নেল। তাঁর পিছনে আছেন সিভিলিয়ান পোশাকে আরেক লোক। পরনে কোঁচকানো সুট। চোখে কালো সানগ্লাস, মনোভাব আড়াল করবে ওই জিনিস। দু'হাত পিছমোড়া করে কর্নেলের পিছু নিলেন। ভঙ্গিটা এমনই, যেন স্কুল-টিচার, ছাত্র লেখাপড়া করেনি বলে এখনই ধমকে উঠবেন। তার পিছনে আসছে এক মেজর।

রানা বুঝে গেল, কর্তৃত্ব ওই কালো সানগ্লাসের হাতেই।

'আমি লেফটেন্যান্ট কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ান, ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি,' ইউনিফর্মড্ লেফটেন্যান্ট কর্নেল বললেন, 'সম্ভব হলে মিস্টার রানার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'তাকে পেয়ে গেছেন,' জানিয়ে দিল রানা।

হাসি-হাসি ভঙ্গি নিয়ে রানার সামনে থামলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'ভাল। আমরা আসলে কয়েকটা ফোটোর বিষয়ে আপনার মতামত জানতে এসেছি। অবশ্য, আপনি চাইলে পরে অফিশিয়ালি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করব।'

কয়েক মুহূর্ত লোকটাকে দেখে নিয়ে হাতের ইশারা করল রানা। 'আসুন, ভেতরে গিয়ে আলাপ করা যাক।'

রানার পিছু নিয়ে বাংলো-বাড়ির সামনের ঘরে ঢুকলেন তাঁরা।

পরের কয়েক মিনিটে খুলে বললেন, কীভাবে খুন হয়েছে একদল সৈনিক ও বিজ্ঞানী।

রানার নিজ হাতে তৈরি পোক্ত টেবিলে ফোটো বিছিয়ে দিলেন

ম্যাক্সিমিলিয়ান, জানতে চাইলেন: এতজন সশস্ত্র সৈনিককে খুন করেছে কে, কারা বা কী।

ছবিগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখছে রানা।

রক্তাক্ত লাশের ছবি দেখবার চেয়ে অনেক বেশি সময় নিল ট্র্যাক আর এলাকা দেখতে।

ও চুপ করে আছে দেখে ম্যাক্সিমিলিয়ান বললেন, 'আমরা আসলে জানতে চাই, একদিকের ট্র্যাক থেকে অন্য ট্র্যাক এত দূরে কেন।'

'হাওয়ার জন্যে,' নিচু স্বরে বলল রানা।

জেন্স সিমন্সের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে। এবার সামনে বেড়ে জানতে চাইলেন, 'এক্সকিউয মি, আপনি বললেন ''হাওয়ার জন্যে''? কথাটা একটু খোলাসা করবেন?'

এরা বুঝবে না, আগেই ধারণা করেছে রানা। 'অন্য পায়ের ছাপের পাশে সরাসরি গেছে এগুলো। কিন্তু হাওয়া সরিয়ে নিয়েছে ইঞ্চি ইঞ্চি করে। ওপাশের ছাপ সরে যেতে পারেনি, কারণ উত্তরের হাওয়া বাধা পেয়েছে ওদিকের বোল্ডারে।'

হতবাক মনে হলো ম্যাক্সিমিলিয়ানকে। কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, 'এটা সম্ভব, মিস্টার রানা?'

ট্র্যাকে আঙুল রাখল রানা। 'ওদিকের ছাপ অন্যগুলোর মতই। কিন্তু সরে গেছে হাওয়ার কারণে।' আর্মি ম্যানের হাতে ছবি ধরিয়ে দিল। 'বালিতে সহজেই এমন দেখা যায়। আর কিছু জানতে চান?'

'ইয়ে...' দ্বিধা করলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'না, আসলে, আমরা চাইছি...'

ঘরে তৈরি হয়েছে থমথমে পরিবেশ।

মুখ হাঁ করে চুপ হয়ে গেছেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। যেন ভয়ঙ্কর এক দুর্যোগ ঢুকে পড়েছে ঘরে। বন্য, হিংস্র, মত্ত, বিপজ্জনক।

ঘাড় ফিরিয়ে লোক দু'জনকে দেখল হাণ্টার।

রানা দেখল, আড়ষ্ট হয়ে গেছে লোক তিনজন। হঠাৎ দেখা দিল তাদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

প্রকাণ্ড নেকড়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মাত্র দুই ফুট পিছনে। কুচকুচে কালো, অবশ্য পিছনে সামান্য ধূসর ছোপ। কালো মণি থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে প্রচণ্ড শক্তির দাপট ও শিকারি জিঘাংসা। আরেক পা সামনে বেড়ে নিচু করে নিল মাথা। আবারও হয়ে গেল পাথরের মূর্তি।

ওর নীরবতা ভয়ঙ্কর– আত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছে লোকগুলোর।

কয়েক সেকেণ্ড পর মৃদু তুড়ি বাজাল রানা। 'হাণ্টার।'

নিরীহ ভঙ্গি নিয়ে রানার পিছনে চলে গেল নেকড়ে। ওখান থেকে চোখ রাখল অতিথিদের উপর।

স্বাভাবিক স্বরে বলল রানা, 'আপনি কী যেন বলছিলেন?'

খপ্ করে মুখ বন্ধ করলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, সামলে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'আ... বলছিলাম, আপনি আমাদের... সাহায্য করতে পারবেন কি না একটা কাজে।'

সামান্য কেঁপে গেছে কণ্ঠস্বর, খেয়াল করেছে রানা। মেজর পিটারসনের দুই হাত মুঠো হয়ে গেছে উত্তেজনার কারণে।

দর-দর করে ঘামছে তিনজনই। বৃষ্টিঝরা কলাপাতার মত পুরো ভিজে গেছে কর্নেলের ফ্যাকাসে মুখ।

এরা কথা বলতে পারবে না হাণ্টার এখানে থাকলে, বুঝে গেছে রানা। নিচু স্বরে বাংলায় বলল, 'হাণ্টার, বাইরে।'

পাশবিক শক্তি নিয়ে ভীতিহীন ভাবে তিনজনকে পাশ কাটিয়ে বাংলো-বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল কালো নেকড়ে। আগে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিয়েছে 'শিকার'-গুলোকে।

হাণ্টার বিদায় নিতেই ফিরল স্বস্তির পরিবেশ। রানা জানে, খুব কাছেই থাকবে প্রকাণ্ড নেকড়ে, যদিও দেখা যাবে না ওকে।

দরকার পড়লে মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর উপর।

'হায়, ঈশ্বর,' ফিসফিস করলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। পকেট থেকে রুমাল নিয়ে মুছে ফেললেন মুখের ঘাম। 'ওটা... আপনার কুকুর?'

'মায়ের দিক থেকে ও আসলে নেকড়ে।'

'ও, আচ্ছা,' চট্ করে নার্ভাস চোখে দরজা দেখে নিলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'এখানে কী করছে ওটা?'

হাসল না রানা, অপমান করতে চাইল না এদেরকে। শান্ত স্বরে বলল, 'ওর যা খুশি, তাই করে। যখন খুশি আসে, আবার চলে যায়।'

'না, মানে, আমি জানতে চাইছি, আপনি কি ওটার মালিক?' আরেকবার দরজা দেখলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'ওটা কি ট্রেইণ্ড? যখন-তখন আসে যায়?' নড়ে যাঁর যাঁর মত তৈরি হয়ে গেছেন তাঁরা। সবার চোখ বার-বার ফিরছে দরজার দিকে।

'না, ও ট্রেইণ্ড নয়,' বলল রানা। 'ওর মালিক ও নিজেই। ইচ্ছে হলে চলে আসে, আবার ইচ্ছে হলে বিদায় নেয়।'

'ওজন কত?' বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'মানে, আগে কখনও এত বড় নেকড়ে... দেখিনি...'

'বংশ কেমন, তার ওপর নির্ভর করে কত বড় হবে,' আবারও নিজের চামড়ার ব্যাগ আনপ্যাকের কাজে ব্যস্ত হলো রানা। 'মর্দা নেকড়ে সাধারণত এক শ' পাউণ্ড ওজনের হয়। হান্টারের ওজন কমবেশি এক শ' ষাট পাউণ্ড। আর বড় হবে না।'

মানসিক আঘাত অনেকটা সামলে নিয়েছেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

রানা বলল, 'জেন্টলমেন, আপনাদের যদি আরও প্রশ্ন থেকে থাকে, বলে ফেলুন।'

নিজেকে রক্ষা করতে দরজার দিকে কাত হয়ে দাঁড়ালেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, আঙুল তুলে দেখালেন রক্তাক্ত সৈনিকদের লাশের

ছবি। বললেন, 'আমরা জানতে চাই, কোন্ জন্তু ওদের খুন করেছে। পুরো এক প্লাটুন সশস্ত্র সৈনিক ছিল ওখানে, তারপরেও মরতে হয়েছে ওদের।'

ছবি দেখে ভুরু কোঁচকাল রানা। মাথা নাড়ল। বিড়বিড় করল, 'হতে পারে গ্রিজলি।' অনিশ্চিত কণ্ঠ। 'কিন্তু সম্ভাবনা খুব কম।'

'কেন গ্রিজলি নয় মনে হচ্ছে আপনার, মিস্টার রানা?'

'কারণ গ্রিজলি শিকারকে ক্ষত-বিক্ষত করে,' আগের চেয়ে নিশ্চিত রানা। 'বার-বার হামলা করবে, ছিঁড়ে ফেলবে মাথা ও মুখ। এদেরকে যে-মেরেছে, সে মাত্র এক আঘাতে খুন করেছে। বা বড়জোর দুই আঘাতে।' ফোটো দেখাল। 'এই লোক মারা গেছে একটা ক্ষত থেকে। রাগ বা ভয় থেকে হামলা করা হয়নি।' আরও মনোযোগ দিল রানা ছবিতে। 'এই কাজ যে করেছে, তার একটা উদ্দেশ্য আছে।'

'কিন্তু কী জন্তু কোন্ উদ্দেশ্যে খুন করবে ওদেরকে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'তা আমার জানা নেই।'

'কিন্তু আপনি না ট্র্যাকিঙের ব্যাপারে...'

'লেফটেন্যান্ট কর্নেল,' বাধা দিল রানা। 'আমি কোনও বিষয়ে নিজেকে পারদর্শী বলে দাবি করি না, এখনও করছি না। এ-ও ভাবছি না, আপনাদের কোনও কাজে আসতে পারব। আমার জানা নেই কোন্ জন্তু খুন করেছে আপনাদের লোকদের।'

রানা চুপ হয়ে যেতে নীরবতা নেমেছে ঘরে।

কেউ কিছু বলছে না, আবারও মুখ খুলল রানা, 'আমি শুধু বলতে পারি, আপনাদের সৈনিকদেরকে খেয়ে নেয়ার জন্যে খুন করা হয়নি। আত্মরক্ষার জন্যেও নয়। নিজের এলাকা রক্ষা করতেও খুন করেনি ওটা।'

'তার মানে, বাঘের মত নয়?'

'ওটা বাঘ নয়।'

'আপনি এত নিশ্চিত কেন?'

'কারণ, সৈনিকরা ছিল সমতল এলাকায়, চারপাশে ছিল খোলা মাঠের মত জায়গা,' বলল রানা। 'বাঘ অ্যাম্বুশ করে উঁচু জায়গা অথবা গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে। শিকারের পিছন থেকে ধাওয়া করে আক্রমণ করাটা বাঘের অপছন্দ।'

'ধাওয়া করে না বাঘ? ...কেন?'

ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করছে রানা। তার ফাঁকে বলল, 'বাধ্য না হলে তেড়ে যায় না। কেউ জানে না, কেন করে না। হয়তো অতিরিক্ত ওজনদার বলেই। তিন বা চার লাফে আপনাকে ধরতে না পারলে, ধরে নিতে পারেন বেঁচে গেছেন।'

ছবি দেখাল রানা। 'এই ট্র্যাক দেখুন। ওই জিনিস নড়ে জেট বিমানের গতি তুলে। তা-ও আবার সোজা পথে।' আরও দু'একটা ছবি দেখে নিল রানা, তারপর বলল, 'এগুলো খেয়াল করুন। একই হামলায় একের পর এক সৈনিককে খুন করেছে। কোথাও পৌঁছুতে চেয়েছে ওটা।' কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আমার মনে হয় না ওটা কোনও জন্তু।'

নীরবে সামনে বাড়লেন জেন্স সিমন্স, দ্বিধা ঝেড়ে বললেন, 'বলছেন, ওটা কোনও জন্তু নয়? আপনি বোধহয় ভুল করছেন, মিস্টার রানা। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এ ধরনের খুন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আপনার কথা শুনলাম, কিন্তু আমি নিজের মতামত পাল্টে নেব না,' বলল রানা। 'আজ পর্যন্ত এমন কোনও জন্তু দেখিনি, যেটা এভাবে খুন করে। কিছু করার পিছনে যে-কোনও জন্তুর উদ্দেশ্য থাকে। হয় ভয়, বা আত্মরক্ষার জন্য খুন করে। কিন্তু এসব ছবিতে দেখছি কোনও কারণ ছাড়াই খুন করা হয়েছে। শত্রুকে ক্ষত-বিক্ষত করেনি, অর্থাৎ রাগ ছিল না ওটার।

একজনকে খতম করে গেছে পরেরজনকে শেষ করতে।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল রানা, 'জেন্টলমেন, আপনারা আমার মতামত জানতে চেয়েছেন, সেটা আমি জানিয়ে দিয়েছি।'

'এসব ছাপের বিষয়ে আরও কিছু বলবেন?' জানতে চাইলেন জেম্স সিমন্স। 'আপনি পুরো শিয়োর এসব ভালুকের কীর্তি নয়?'

'না, ভালুকের নয়। থাবা অনেক আলাদা। আপনাদের ট্র্যাকারও একই কথা বলবে।' জেম্স সিমন্সের দিকে চাইল রানা। 'আমার কাছে জানতে চাইলে বলব, এসব ছাপ পড়েছে মানুষের পায়ের কারণে।'

নিচু স্বরে বললেন সিমন্স, 'আগে কখনও এ ধরনের জন্তুর ছাপ দেখেছেন?'

'না।'

'কখনও না?'

'না।'

বিব্রত মনে হলো জেম্স সিমন্সকে। চট্ করে দেখে নিলেন বাইরের দরজা। অনেকটা বোঝানোর সুরে বললেন, 'দেখুন, মিস্টার রানা, আমাদের বলা হয়েছে, আপনি খুব দক্ষ ট্র্যাকার। তখন আপনার ব্যাকগ্রাউণ্ড ঘেঁটে দেখেছি। ...আমার ধারণা হয়েছে, আপনি নিশ্চয়ই আগেও দেখেছেন ওই জন্তুর ছাপ– নয় কি?'

রানা চুপ করে থাকল।

'কারও সঙ্গে যোগাযোগ করলে, আগেই তার ব্যাকগ্রাউণ্ড চেক করি আমরা,' বললেন সিমন্স। 'আপনার নাম মাসুদ রানা চৌধুরী। আপনার বাবা-মা মারা যান অ্যাক্সিডেন্টে। লেখাপড়া করেন অক্সফোর্ডে। বাংলাদেশ আর্মিতে মেজর ছিলেন। পরে কাজ নেন ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কর্পোরেশনে। ওই চাকরি ছেড়ে নানান দেশে চালু করেন রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি।

নাম করেছে ওই সংস্থা। আর্কিয়োলজির বিষয়ে ঝোঁক আছে আপনার, নামও হয়েছে তাতে। সত্যিকারের অভিযাত্রী আপনি। কয়েক বছর আগে অ্যাসপেনের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করেন এক আহত উতে ইণ্ডিয়ান চিফকে। হাসপাতালে থাকতে রাজি না হওয়ায় তাকে নিজের বাড়িতে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। বহুদিন ছিল সে আপনার কাছে। তার কাছ থেকেই শিখে নেন ইণ্ডিয়ানদের ট্র্যাকিং টেকনিক। পরের কয়েক বছরে হয়ে ওঠেন দুনিয়া-সেরা একজন ট্র্যাকার। পাহাড়-জঙ্গলে বেশ কয়েকবার বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছেন। অ্যাসপেনে এসে শুনলাম, স্থানীয়রা আপনাকে বন-পাহাড়ের বিষয়ে সত্যিকারের গুরু মনে করে। বিলুপ্ত-প্রায় প্রাণীর বিষয়ে কাজ করে এমন কিছু সংগঠনের সঙ্গেও আপনার যোগাযোগ আছে। ...আরও ডিটেইলসে যাব?'

তুমি প্রায় সবই জানো, মনে মনে বলল রানা। বুঝে গেছে, জেম্স সিমন্স এসেছে সিআইএ থেকে। আরও সতর্ক হয়ে উঠল। সহজ সুরে বলল, 'সব জেনেই এসেছেন, বুঝতে পারছি। তো?'

'নিশ্চয়ই ওই জন্তুর ব্যাপারে কোনও সূত্র দিতে পারবেন? সামান্য সন্দেহ হলেও তা আমাদের কাজে আসবে।'

'ভালুকের সঙ্গে সামান্য মিল আছে এসব ছাপের,' বলল রানা। 'কিন্তু বার-বার মাড়ানো হয়েছে ট্র্যাক। গলেও গেছে বরফ। কাজেই নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা কঠিন। আর ওই ছাপ ফেলে যাওয়া প্রাণী বাইপেডাল, ভালুকের মত চার হাত-পায়ে ছোটেনি বা দুলতে দুলতে যায়নি। ওটা যা-ই হোক, ওজন তিন শ' পাউণ্ড। ডানহাতি। প্রতি পঞ্চাশ ফুট যাওয়ার পর দেখে নিয়েছে চারপাশ। হাঁটার সময় ঝুঁকে হাঁটে। যেন শিকার ধরবে। ঝট্ করে ঘুরবার সময় একই সঙ্গে ব্যবহার করে দুই পায়ের পাতা। হামলা করলে ডানদিক থেকে বামে আঘাত হানে। তখন মুষ্টিযোদ্ধার মত ভর দেয় বাম পায়ে।'

হতবাক হয়ে গেছে অতিথিরা।

কয়েক মুহূর্ত পর মুখ খুললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'আপনি ছবি দেখে এত কিছু বুঝেছেন?'

মাথা দোলাল রানা।

'কিন্তু... কী করে?'

একটা ছবির দিকে আঙুল তাক করল রানা। 'এগিয়ে যাওয়ার সময় একদিকে চাপ পড়ছে পায়ে, দেখা যাচ্ছে পেশির সংকোচন। নির্দিষ্ট ছাপ ফেলছে। এ ছাড়া, সহজ আরও কিছু বিষয় দেখে অনেক কিছুই বুঝে নেয়া যায়।'

'কিন্তু আমাদের ট্র্যাকাররা... ওরা এসব বুঝল না কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'জানি, আপনাদের ট্র্যাকাররা কাজে দক্ষ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল। কিন্তু আমার যা মনে হয়েছে, শুধু তা-ই জানালাম। এর বেশি কিছু বলারও নেই।'

নীরব হয়ে গেল ঘর।

কয়েক সেকেণ্ড পর পায়চারি শুরু করলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, কী যেন ভাবছেন। কিছুক্ষণ পায়চারি করে মিস্টার জেন্স সিমন্সের দিকে ফিরলেন। 'মিস্টার সিমন্স, আড়ালে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ঘরে ঢুকে সানগ্লাস খোলেনি সিআইএ এজেন্ট। আরও কয়েক সেকেণ্ড রানাকে দেখল সে, তারপর কর্নেলের পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। টেবিলের কাছ থেকে তাদেরকে দেখতে পেল রানা বারান্দায়। ফিসফিস করছে দু'জন। কী নিয়ে আলাপ হচ্ছে, আন্দাজ করতে পারছে ও। তাদের কথায় কোনও কাজ নেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ওর নেই।

কিছুক্ষণ পর আবারও ঘরে ঢুকলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। চেহারা দেখে মনে হলো, কথা গুছিয়ে নেয়ার কাজে ব্যস্ত। একটু পর মুখ খুললেন, 'আমরা একটা অনুরোধ করব, মিস্টার রানা। জবাব

দেয়ার আগে দয়া করে ভাল করে একটু ভেবে দেখবেন।' দ্বিধা-রাগ-ভয় নেই তাঁর চোখে।

'বলুন কী বলবেন,' বলল রানা।

'এই যে পরিস্থিতি,' মাথা নাড়লেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'এটা সত্যিই অস্বাভাবিক। হয়তো বুঝবেন, আমাদের সৈনিকদের মেরে ফেলা হয়েছে কোনও কারণ ছাড়াই। ওদের বউ-বাচ্চা আছে, মিস্টার রানা। ওদের বেতনের ওপর নির্ভর করত তারা। অনেকের বুড়ো বাবা-মা অপেক্ষা করছেন ছেলে ফিরবে। কিন্তু ওরা আর কখনও ফিরবে না। আর্মি থেকে জানানো হবে, মারা গেছে ওরা। অনেকগুলো পরিবারের মাথায় বাজ পড়বে। আর ওই জন্তু যে শুধু সৈনিকদের খুন করেছে, তা-ও নয়। নিরীহ একদল বিজ্ঞানীও খুন হয়ে গেছেন। সবার লাশ গায়েব করে দিতে পারি আমরা। বলে দিতে পারি, শত্রু দেশের একদল সৈনিক তাদেরকে মেরে ফেলেছে বা বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাতে মৃত মানুষগুলোর প্রতি অসম্মান দেখানো হবে। বা তাদের পরিবারকে অপমান করা হবে। বাধ্য হলে হয়তো তা-ও করা হবে। ...কিন্তু ওই ভয়ঙ্কর জন্তু রওনা হয়েছে দক্ষিণ এলাকার দিকে। কয়েক দিনের ভেতর পৌঁছে যাবে অসামরিক এলাকায়। মস্ত বিপদে পড়বে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ।'

ম্যাক্সিমিলিয়ান চুপ হয়ে যেতে রানা বলল, 'স্যাটালাইটের ইনফ্রারেড সিগনেচার দেখে ওটাকে ধরতে পারছেন না কেন? গ্লোবাল ইমেজিং সিস্টেম ব্যবহার করুন। শুনেছি, আপনাদের নতুন টেকনোলজি যে-কোনও জন্তু বা মানুষের সিগনেচার আলাদা করতে পারে।'

'সে চেষ্টা কি আমরা করিনি, মিস্টার রানা?' মানুষটার চেহারায় দেখা দিল অসহায়ত্ব। 'কিন্তু ওই বিশাল এলাকায় লাখে

লাখে প্রাণী– মুস, ভালুক, এল্‌ক্‌, নেকড়ে... নির্দিষ্ট ওই জানোয়ারের হিট সিগনেচার ট্র্যাক করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এখন প্রয়োজন এমন এক দক্ষ ট্র্যাকার, যে কি না খুঁজে বের করবে নির্দিষ্ট ওই জন্তুকে। তা করতে হবে ওই দানব কোনও গ্রাম বা শহরে পৌঁছে যাওয়ার আগেই। নইলে খুন হবে শত শত মানুষ। ...মিস্টার রানা, আপনি আমাদের বেতনভুক কর্মচারী নন, কাজেই কোনও নির্দেশ দিতে পারি না আমরা। আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনও কাজও চাপিয়ে দিতে পারি না। কিন্তু যুক্তিবাদী একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আপনার কাছে অনুরোধ করব– স্যর, দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন। ট্র্যাক করে যেভাবে হোক শেষ করতে হবে ওই দানবকে, নইলে বহু নিরীহ পরিবারের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

লেফটেন্যান্ট কর্নেল থেমে যাওয়ার পর কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, তারপর জানতে চাইল রানা, 'আপনাদের নিজেদের লোক যথেষ্ট নয়?'

'না,' মাথা নাড়লেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'ওরা চেষ্টা করেছে। ব্যর্থ হয়েছে। সত্যি বলতে, ওদের মেরে ফেলেছে ওটা।'

রানা টের পেল, বুকে রোমাঞ্চ, শিহরন আর বিপদের উথাল-পাথাল ঢেউ। চুপ করে আছে দেখে লেফটেন্যান্ট কর্নেল বললেন, 'আমরা একটা কিলার টিম জড় করেছি। ওই দলের নেতা হিসাবে আপনি থাকলে খুবই খুশি হব। যদিও ওই জঙ্গল-পাহাড়ে আপনার মূল কাজ হবে ওই জন্তুকে ট্র্যাক করা। অন্যরা লড়বে ওই জন্তুর বিরুদ্ধে। প্রথম সুযোগে শেষ করে দেবে। আপনি নিজেকে ভাবতে পারেন অবধার্যভাবে হিসেবে। অত্যন্ত দক্ষ ওই দলের প্রথম কাজ হবে আপনাকে রক্ষা করা। সব বিপদ থেকে আপনাকে আড়াল করা। ...আর শুনেছি, আপনি নিজেও কঠিন সব বিপদকে মোটেও পাত্তা দেন না।'

জানালা দিয়ে রানার চোখ চলে গেল পাহাড়-অরণ্যের দিকে। এরই মাঝে নেমেছে রাতের আঁধার। আশপাশেই কোথাও অপেক্ষা করছে হান্টার। কেউ ওর উপর হামলা করলেই ঝড়ের বেগে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে কালো দানবের মত। বাইরের অন্ধকারে চেয়ে রানা বুঝে গেল, ম্যাক্সিমিলিয়ানের কথা সে পাল্টে গেছে ওর সিদ্ধান্ত। তবুও কেন যেন খচ্-খচ্ করছে ওর মন।

'বেশ, ওই দলের নেতা হিসেবে যোগ দেব,' কয়েক মুহূর্ত পর বলল রানা, 'সঙ্গে নেব হান্টারকে।'

'আপনি যা ভাল বোঝেন,' নেকড়ের কথা শুনে আবারও নার্ভাস হয়ে গেছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান।

'আপনাদের কোনও ধরনের মিলিটারি কমাণ্ড অনুযায়ী চলব না আমি,' বলল রানা। 'দলের নেতা হিসাবে ট্র্যাক করব। আমার কোনও মেথড বা নির্দেশ অমান্য করতে পারবে না দলের কেউ। ট্র্যাক করার ওই কাজ এমনিতেই যথেষ্ট কঠিন হবে। বেয়াড়া কাউকে নিয়ে বিপদ বাড়াতে চাই না। এতে কারও কোনও আপত্তি থাকলে আমাকে মাফ করতে হবে, অন্য মানুষ খুঁজে নেবেন।'

'কোনও আপত্তি নেই আমাদের। অক্ষরে অক্ষরে আপনার নির্দেশ মেনে চলবে সবাই। যেহেতু ট্র্যাকিঙের কাজে ব্যস্ত থাকবেন, সেজন্যে অন্যদের নিয়ে ওই জন্তুর বিরুদ্ধে লড়বে সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। তবে তার বিরুদ্ধে আপনার কোনও আপত্তি থাকলে দায়িত্ব থেকে সরে যাবে।'

দূরের আকাশে চোখ রাখল রানা। তারা নেই একটাও। বইতে শুরু করেছে শীতল হাওয়া। বৃষ্টি হবে রাতে।

কেন যেন একবার শিউরে উঠল রানা। মনে অস্বস্তি। কেউ যেন বলছে বুকের ভিতর: রানা, মস্ত ভুল করেছিস!

ওটা জন্তু, মানুষ বা দানব, যা-ই হোক, ওটাকে ঠেকাতে হবে, ভাবল রানা। নইলে সর্বনাশ করবে বহু মানুষের।

নিজেকে বলল রানা, দায়িত্ব নিয়েছিস, তা পালন করার চেষ্টা কর।

'আগেই আপনাদের সেটআপ জানিয়ে দেবেন,' বলল রানা।

মাথা দোলালেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'নিশ্চয়ই, যা করার দ্রুত করব। কাল সকালেই রওনা হবেন আপনি আলাস্কার উদ্দেশে।'

'তাতে আপত্তি নেই আমার,' একবার সিআইএ-র মিস্টার সিমন্সকে দেখল রানা। চোখ দেখা গেল না কালো সানগ্লাসের কারণে। ঠোঁটে তার হাসির আবছা রেখা।

রানার অন্তর বলল, ওই কালো সানগ্লাসের ওপাশে আছে অশুভ কী যেন। তবে সেটা কী ও দেখতে চায়।

পাঁচ

বিশ্বের মানচিত্রের শেষাংশ এই অঞ্চল– আলাস্কা। এখানেই রয়েছে চিরকালীন শুভ্র বরফ-তুষারে ছাওয়া নিষ্ঠুর, গভীর অরণ্য; আবার এ অঞ্চলেই রয়েছে অরণ্যবিহীন ধু-ধু তুন্দ্রা ও ধবধবে বিশাল গ্লেসিয়ার, যেখানে দিনের পর দিন বইছে মানবদেহ অসাড় করে দেয়া কনকনে, হু-হু হাওয়া। এই এলাকায় আগেও এসেছে রানা। ভাল করেই জানে, ভয়ঙ্কর এই তুষারাঞ্চলে যে-কোনও মুহূর্তে বিনা নোটিসে যে-কাউকে স্পর্শ করতে পারে হিম শীতল

মৃত্যু।

হাজারো অভিযাত্রী, এমন কী আলাস্কার আদিবাসীদেরও অনেকে নির্মমভাবে জীবন দিয়েছে ব্রুক্স্ রেঞ্জে এসে। এসব ভাল করে জানে বলেই, রানা কখনও ছোট চোখে দেখেনি এখানকার নির্দয় প্রকৃতি ও বর্বর পাশবিকতাকে। বাঁচতে চাইলে পাহাড়ি এ এলাকার প্রতি থাকতে হবে গভীর শ্রদ্ধা, তার চেয়েও বেশি চাই সতর্কতা; নইলে মৃত্যু আসবে বেঘোরে, আচমকা। হারিয়ে যেতে হবে হতভাগ্য মানুষদের মতই। হিমবরফের দেশে এসে অনেকেই ভেবেছে, প্রস্তুতির আতিশয্য অর্থহীন, সামান্য ঢিলে দিলে কিছুই হবে না; কিন্তু উঁচু শীতল এলাকায় আর কখনও দেখা যায়নি তাদেরকে। বরফের নীচে ঢেকে গেছে লাশ, বা খেয়ে ফেলেছে বন্য-প্রাণী।

কী কী ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করবে সাধারণ ট্র্যাপার বা ক্যাম্পাররা, তা জানে রানা। আগে চাই ভারী ক্যালিবারের স্কোপসহ রাইফেল, শটগান এবং প্রচুর কার্তুজ। এরপর প্রচুর শুকনো খাবার। একটা কুঠার, হ্যাচেট, খাপসহ ছোরা; চামড়া ছেলার ছোট ব্লেডের ছুরি, তাঁবু, টপোগ্রাফিকাল ম্যাপ, ওখানে চিহ্নিত থাকতে হবে ফেডারেল ইমার্জেন্সি স্টেশন, একটা কমপাস, দড়ি, রেইন কোট, ম্যাচ, বিপদে আগুন জ্বালতে ফ্লিন্ট, এক তা চামড়ার টুইন, ইমার্জেন্সি মেডিকেল ইকুইপমেন্ট, দুটো খচ্চর ও একটা ঘোড়া, তাদের জন্য খাবার এবং অবশ্যই একটি রেডিয়ো।

কিন্তু এতসব লটবহর বয়ে বেড়ানো রানার পছন্দ নয়। এই বরফের জগতে বাঁচতে চাইলে দক্ষতার উপর নির্ভর করতে হবে ওকে। পারতপক্ষে সংগ্রাম না করেই এড়িয়ে যাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দেবে ভয়ানক বিপর্যয়ের সময়ে। তখন এই কঠিন জমি-অরণ্য-পাহাড় থেকেই সংগ্রহ

করবে দরকারী রসদ। সেজন্য ওর পিঠে থাকবে ছোট একটা ব্যাগ। কাঁধে চামড়ার পাউচ, ভিতরে বাতাসে শুকিয়ে নেয়া গরুর মাংস আর হার্বাল মলম– জিনিসটা রাঁধবার সময় কাজে আসবে, আবার লাগবে ক্ষত মেরামত করতেও। এ ছাড়া, সঙ্গে চাই কমপাস, কম ব্যবহৃত ট্র্যাকের মানচিত্র, চক, মার্কিং স্টিক, চকমকি পাথর ইত্যাদি।

ডান কোমরে সিঙ্গল ক্যান্টিন, যদিও প্রায় ব্যবহারই করবে না ওটা। প্রতিটি ঝর্নায় থেমে পানি খেয়ে ভরে নেবে পেট। উঁচু এলাকায় ডিহাইড্রেশন হয়ে ওঠে সত্যিকারের নিঃশব্দ খুনি। বেল্টে ঝুলবে বাউয়ি নাইফ ও হ্যাচেট। কাঁধের স্ট্র্যাপে কার্তুজ, অন্য কাঁধে লিভার-অ্যাকশন স্কোপহীন ৪৫.৭০ ক্যালিবারের মারলিন রাইফেল।

পরনে উলের প্যান্ট, চামড়ার শার্ট ও জ্যাকেট, পায়ে হাঁটু সমান উঁচু মোকাসিন। শেষ জিনিসটার তলির লাইনিং হাঁসের পালক দিয়ে তৈরি। বাড়তি কোনও পোশাক থাকবে না। মোকাসিনের কারণে শীত থেকে নিরাপদ থাকবে পা, ভিজে গেলে চট্ করে শুকিয়ে নেবে ইণ্ডিয়ানদের ওই জুতো। ওটার কারণে চলতে পারবে নিঃশব্দে। ট্র্যাকিং শুরু করলে ডাল-পাতার ভিতর পলিয়েস্টার বা সুতির কাপড়ের মত খসখসে আওয়াজ করবে না চামড়ার পোশাক ও মোকাসিন।

প্রাচীন অ্যাযটেক পুরোহিতদের কথা পড়েছিল বইয়ে, তাঁরা জ্যাকেটের কাঁধে ডাবল চামড়ার হুড রাখতেন। বৃষ্টি থেকে কাঁধ রক্ষা করতে কাজে আসত নীচের হুড। উপরের হুড টুপির মত। মাথা দিয়ে বাড়তি তাপ বেরিয়ে যাওয়া রোধ করত ওই জিনিস। অনেক আগেই মানুষ জানত, শীতে খোলা জায়গায় দেহের ষাট ভাগ তাপ বেরিয়ে যায় শুধু মাথা দিয়েই। রানার হুড অত্যন্ত পুরু, বরফের মত ঠাণ্ডা এলাকায় ওটা রক্ষা করবে ওর মাথা।

আমেরিকান প্রথম দিকের ফ্রন্টিয়ার স্কাউটদের মতই আলাস্কা অভিযানে শুধু হালকা জিনিস সঙ্গে এনেছে রানা। স্পেশাল রেসপন্স স্কোয়াডের হাই-টেক অস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি ওর কাছে নেই। তার কোনও দরকার আছে বলেও বোধ করছে না।

নিরাপদ আশ্রয় এবং দরকারী খাবারের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে। ক্ষুধা পেলে দক্ষতার সঙ্গে খুন করবে আশপাশের কোনও জন্তুকে, আর খাওয়া শেষ হলে আবারও রওনা হবে দূরের পথে। রাতে পনেরো মিনিটে তৈরি করবে সাধারণ, কিন্তু চমৎকার মাছের ফাঁদ। পেতে রাখবে ঝর্নার পানিতে। ভোরে উঠে নাস্তার জন্য পাবে কমপক্ষে আধ ডজন পাহাড়ি ট্রাউট। খাওয়া শেষ হলেও রয়ে যাবে কয়েকটা, সেগুলো খেতে পারবে দুপুরে বা বিকেলে। উতে ইণ্ডিয়ান চিফের কাছ থেকে মন দিয়ে রানা শিখেছে, কীভাবে ভারী জিনিসপত্র না বয়েই বরফ-শীতে পাড়ি দিতে হয় হাজার মাইল পাহাড়ি পথ।

রানার ধারণা: ওর নেতৃত্বাধীন আর্মি টিমের সঙ্গে থাকবে চল্লিশ পাউণ্ড ওজনের আর্কটিক সার্ভাইভাল গিয়ার। তার ভিতর থাকবে, লোড-বেয়ারিং ভেস্ট বা এলবিভি, সঙ্গে আর্মার্ড কেভলার। এ ছাড়া, পিঠের ব্যাকপ্যাকে প্রত্যেকের জন্য ওঅটর পিয়োরিফায়ার, কোল্ড ওয়েদার টেন্ট, আর্কটিক স্লিপিং ব্যাগ, বাড়তি পোশাক ও মোজা, ডিহাইড্রেটেড ফুড, প্রপ্যান আভন, নাইট ভিশন ইকুইপমেন্ট, টিয়ার গ্যাস, ফ্লেয়ার, বায়োনিক লিসেনিং ডিভাইস ইত্যাদি।

ওই দলের সঙ্গে আরও থাকবে ভারী অস্ত্র। এম-১৬ কারবাইন থেকে শুরু করে বেনেলি শটগান, এমএইচ-৪০ সিলিণ্ড্রিকাল গ্রেনেড লঞ্চার। কোথায় আছে বুঝতে ব্যবহার করবে জিপিএস। আজকাল আমেরিকান সৈনিক শেষের জিনিসটা ছাড়া কানা হয়ে গেছে। নিজে রানাও ব্যবহার করেছে ওই সিস্টেম,

কিন্তু ভাল করেই জানে, মেশিন মানেই মেশিন– ওটা যে-কোনও সময়ে নষ্ট হবে। কাজেই নিজের দক্ষতা, মানচিত্র, কমপাস ইত্যাদির মাধ্যমে ন্যাভিগেট করাই ভাল। ওকে ভুল তথ্য দেবে না সূর্য বা তারা।

আধুনিক ইকুইপমেন্টের উপর ভরসা না করে প্রকৃতির বুকে বেঁচে থাকতে চাইলে, অসংখ্য বিষয়ে চোখ রাখতে হবে। বিপর্যয় এলে ঠাণ্ডা রাখতে হবে মাথা। ধরে নিতে হবে, কারও কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে না এই বরফের দেশে। কাজেই টিকে থাকতে চাইলে লাগবে প্রবল মানসিক জোর এবং প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি।

রানার মনে পড়ল, প্রথমবার আলাস্কায় এসে বৃদ্ধ এক ট্র্যাপারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

পাহাড়ি এলাকায় চলেছে শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন বুড়ো। জিজ্ঞেস করতে অনেকক্ষণ ভেবে তারপর বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, শীতের মৌসুমে শুধু একটা রাইফেল আর একটা ছোরার উপর ভরসা করে বেঁচে থাকা সম্ভব।' আরও বলেন, 'কিন্তু, বাছা, তোমার হতে হবে সত্যিকারের ইনজুন। বন্য প্রাণী হিসেবে ভাবতে হবে নিজেকে। কারণ, বাছা, ওই পাহাড়ি এলাকায় ঈশ্বরও নেই, আর কোনও দয়াও পাবে না প্রকৃতির কাছ থেকে।' আরও কিছুক্ষণ পর বলেছিলেন, 'আমি যখন পাহাড়ি এলাকায় যাব, সঙ্গে নেব আমার ঘোড়া আর দুটো প্যাক মিউল। পাহাড়ি এলাকার জঙ্গলে তিনটা ঘোড়ার চেয়ে শক্তপোক্ত থাকে একটা মাত্র খচ্চর। সকালে ধীরে সুস্থে রওনা হব ক্যাম্প ভেঙে, আর সন্ধ্যার আগেই ক্যাম্প করব। শীত বাড়লে বা ঝড় শুরু হলে ভুলেও ক্যাম্প ছেড়ে কোথাও যাব না।' টুথপিক দিয়ে দাঁত খোঁচাতে শুরু করে বলেছিলেন, 'বাছা, নিশ্চয়ই পাহাড়ে শীত পার করবে না তুমি?'

'না,' মাথা নেড়েছে রানা। 'এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

পাহাড়ের দিকে আঙুল তাক করে ট্র্যাপার বলেছিলেন, 'ওই এলাকা মানুষের জন্যে নয়। সারাজীবনে দু'একজনকে দেখেছি, যারা শীত পার করে আবারও ফিরে আসতে পেরেছে। কিন্তু অনেকেই আর ফিরতে পারেনি। যারা ফিরেছে, তারা চিরকালের জন্যে বদলে গেছে।'

পরে রানা বুঝেছে, এক ফোঁটা মিথ্যা কথা বলেননি বৃদ্ধ ট্র্যাপার।

পৃথিবীতে মাত্র দু'একটা জায়গায় এভাবে ভয়ঙ্কর শীত ও বৃষ্টি পড়ে। বোকাদের কখনও ক্ষমা করে না এই দেশ। কেউ পাহাড়ে আহত হলে, মাসের পর মাস টিকে থাকতে চাইলে, তাকে একমাত্র সহায়তা দেবে তার অসীম ধৈর্য ও স্থির সংকল্প। প্রয়োজন হলে সহ্য করতে হবে তীব্র ব্যথা, তখন সতর্ক ভাবে চিকিৎসা করতে হবে নিজের ক্ষতের যেভাবে হোক রক্ষা করতে হবে খাবার। শুধু নিজের প্রাণ-রক্ষায় ব্যয় হবে প্রচুর সময়, নইলে জোগাড় হবে না প্রয়োজনীয় সব জিনিস।

ধৈর্য ধরে নিয়ম মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। নইলে হতে হবে স্রেফ উন্মাদ। আর এ দেশে একদিনও বাঁচে না পাগল। অবশ্য, এবার যে মিশনে ওরা চলেছে, তাতে মস্ত বিপর্যয় হওয়ার কথা নয়। যদিও যে-কোনও বিপদের জন্য তৈরি থাকা উচিত। হঠাৎ আকস্মিক ভাবেই একেবারে পাল্টে যেতে পারে অতি স্বাভাবিক পরিস্থিতি।

ভাবনার জালে বন্দি রানা হঠাৎ করেই সচেতন হয়ে উঠল মিলিটারি সি-১৪১ বিমানের ভোঁতা গর্জনে। ফিউজেলাজের বাইরে গোঙাতে শুরু করেছে প্রকাণ্ড চারটে জেট ইঞ্জিন।

আনমনে হাসল রানা। কবে যেন অজান্তেই শিখে নিয়েছিল কীভাবে উপেক্ষা করতে হবে অদরকারী আওয়াজ। প্রয়োজনীয়

এই যোগ্যতা ট্র্যাকিঙের সময় খুব কাজে আসে।

কাছের জোরালো আওয়াজ পাত্তা না দিলেও অনেক নিচু পর্দার আওয়াজ ঠিকই শুনবে। হয়তো সিকি মাইল দূরে ডাকছে উডলার্ক। জরুরি বার্তা না-ও দিতে পারে। আবার বলে দিতে পারে, কী দেখে উত্তেজিত বা ভীত। হয়তো উডলার্ক দেখেছে জলচর সাপ। বেশিরভাগ পাখির মতই ঝর্না বা পানিতে ভাইপার নড়লেই উঁচু গ্রামে চিৎকার জুড়বে ওটা। মনে হবে, দাবানল শুরু হয়েছে জঙ্গলে, তখন মিষ্টি ডাক পাল্টে যায় একেবারেই।

ওটা শুনেই বুঝে নেয়া যায়, কত কাছে ওই সাপ। বিরক্ত না করলে দিনের আলোয় নড়াচড়া করবে না এসব সরীসৃপ। আসলে অদৃশ্য সব প্রাণীর হাজারো আওয়াজ বুকে নিয়ে বন্য সমাজে কী চলছে, সর্বক্ষণ প্রচার করছে জঙ্গল। শুধু বুঝতে হবে, ওই সমাজের ঘোষণাকারীরা কী বলতে চায়।

স্থানীয়রা বলে ওই ভাষা বুনো প্রকৃতির।

তারপুলিনে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে হান্টার, ওর ঘাড়ের ঘন, কালো রোম এলোমেলো করে দিল রানা। বিমানের যাত্রীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, সেই ভয়ে নেকড়েকে যাত্রী কমপার্টমেন্টে রাখতে ভয় পেয়েছে মিলিটারি অফিশিয়ালরা। রানাও তর্কে যায়নি, হান্টারকে নিয়ে উঠে পড়েছে কার্গো হোল্ডে। ওর আপত্তি নেই বিশ্বস্ত বন্ধুর পাশে থাকতে।

রানার মনে পড়ল, কীভাবে পেয়েছিল দ্বিতীয় হান্টারকে। তখন মাত্র তিন সপ্তাহের নেকড়ে-ছানা ছিল ওটা। জঙ্গলে একটু দূরে লাশ হয়ে পড়ে ছিল ওর প্রিয় কুকুর *প্রথম হান্টার* আর তার সঙ্গিনী নেকড়ে। ওই দম্পতির অন্য চার ছানা খুন হয়েছিল পোচারদের হাতে। কিন্তু পড়ে থাকা এক গুঁড়ির আড়ালে মাটি খুঁড়ে আহত অবস্থায় লুকিয়ে পড়েছিল দ্বিতীয় হান্টার। ক্ষুধার্ত, অসুস্থ ও আহত। দু'একদিনের ভিতর মরত, কিন্তু ওকে

ডালপালার নীচ থেকে বের করে এনে এক টুকরো কাঁচা মাংসের লোভ দেখিয়ে কোলে তুলে নিয়েছিল রানা।

এতই দুর্বল, কয়েক মাস লেগেছিল বাংলো-বাড়ির ঘরে পায়চারি করতে। অবশ্য, তারপর ক্রমেই বড় হয়ে উঠল। নয় মাস বয়সেই হয়ে গেল প্রকাণ্ড এক নেকড়ে। ইচ্ছা করেই ট্রেইনিঙের মাঝ দিয়ে ওকে নিয়ে যায়নি রানা। কিন্তু নেকড়ে আর কুকুরের মিশ্রণ বলেই বোধহয় অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়েছে দ্বিতীয় হান্টার। যে-কোনও কিছু চট্ করে বুঝে নেয় অনায়াসেই। ওর জানা আছে, কোথায় মিলবে খাবার। কাকে বিশ্বাস করা যায়, কাকে নয়। কৌতূহলের শেষ নেই। আর প্রতি বছর রানা বাংলো-বাড়িতে ফিরলেই হাজির হয়েছে প্রিয় মানুষটাকে সঙ্গ দিতে।

ছয় মাস বয়স হওয়ার পর হান্টারকে বারান্দায় চমৎকার এক ডগহাউস তৈরি করে দিয়েছিল রানা। মেঝেতে পুরু করে বিছিয়ে দিয়েছিল খড়, তার ওপর পুরনো কম্বল। শীতের রাতে জ্বেলেছে হিট ল্যাম্প। কখনও বেঁধে রাখেনি নেকড়ের বাচ্চাকে। নিজের মন বুঝে স্বশিক্ষিত হয়ে বেড়ে উঠেছে ওটা।

বাংলোর আশপাশে আসত নেকড়ের পাল, তখন রাতে ঘুমিয়ে পড়বার আগে রানা ভেবেছে: একদিন বনের ডাকে হারিয়ে যাবে দ্বিতীয় হান্টার।

দুই বছর বয়সে পূর্ণ নেকড়ে হয়ে উঠল ওটা। তখন থেকে গায়েব হয়ে যেতে লাগল দিনের পর দিন। কখনও ফিরল রক্তাক্ত শরীর নিয়ে। রানা বুঝে গেল, এলাকার অন্য নেকড়ের পালের সর্দারদের সঙ্গে শুরু হয়েছে ওর লড়াই।

প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নিয়মেই নিজ রাজত্ব কায়েম করতে চাইল দ্বিতীয় হান্টার। মসনদ ওর বাংলো-বাড়ি, চারপাশে চাই প্রজা। কোনও কোনও রাতে রানা শুনল, চিৎকার জুড়েছে বহু দূরের নেকড়ের পাল। তাদের নেতাকে দমন করতে বিদায় নিয়েছে

দ্বিতীয় হান্টার। নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে চলতে চাইলে লড়াই করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে ওকে।

কখনও বাধা দেয়নি রানা। ভেবেছে, ওর মতই পরিবার নেই দ্বিতীয় হান্টারের। যদি ভিড়ে যেতে পারে কোনও নেকড়ের পালে, সহজ হবে ওর জীবন। কিন্তু বার-বার অন্তরের টানে আবারও ফিরেছে মস্ত নেকড়ে। একসঙ্গে দিনের পর দিন সৌখিন ট্র্যাপিং ও ট্র্যাকিং করেছে– কেউ কাউকে চোখের আড়াল হতে দেয়নি। রানাকে বোধহয় আপন পিতা বলে মনে করে নেকড়ে, অনুসরণ করে অন্ধের মত।

বোধহয় রানার কথা ভাবে: ওর বাবা নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে পৌঁছে যায় সতর্ক হরিণের পিছনে, আঙুল স্পর্শ করে চমকে দিতে পারে হতভম্ব প্রাণীটাকে। বা ঘুমন্ত গ্রিজলির ঘাড়ের রোম নেড়ে দিয়ে সরে পড়ে নীরবে। তখনও ঘুমিয়ে থাকে মস্ত ভালুক। অন্য কেউ এসব পারে না, কাজেই মন দিয়ে সব খেয়াল করে হান্টার। বুঝে গেছে, ওর কাছে কোনও দাবি নেই মানুষটার। পরস্পরের সত্যিকারের অন্তরের বন্ধু ওরা। কখনও বাংলো-বাড়ির বেডরুমে গভীর রাতে ঘুম ভাঙলে রানা দেখেছে, ওর বুকে পিরিচের মত থাবা রেখে অবাক, মুগ্ধ চোখে ওকে দেখছে নেকড়ে। নাক রেখেছে ওর গলার কাছে। বুঝতে চাইছে, প্রাণের বন্ধু সুস্থ আছে কি না।

রানাও অন্তরে স্বীকার করে নিয়েছে, জ্ঞানীরা ঠিক কথাই বলেন: জীবনে মাত্র একবার সত্যিই কোনও জন্তুকে ভালবাসতে পারে মানুষ। আর ওর ভালবাসার জন্তুটা দ্বিতীয় হান্টার। বোধহয় আর কখনও কোনও কুকুর বা নেকড়েকে এতটা পছন্দ করতে পারবে না। মাত্র তিন বছর বয়স দ্বিতীয় হান্টারের। আরও বহু বছর বাঁচবে। হয়তো অত দিন নিজেও বাঁচবে না রানা।

এবারের অভিযানে হান্টারকে এনেছে বলে খচ-খচ করছে ওর

মন। কিন্তু না আনলে ছটফট করত হান্টারের মন।

রুক্ষ-কঠিন-শীতার্ত এই এলাকার গভীরে গেলে মস্ত নেকড়ে সঙ্গে থাকলে নানাদিক থেকে সুবিধা পাবে ও। অসতর্ক হলে হানা দেবে ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর মৃত্যু; কিন্তু পাশে হান্টার থাকলে বহু আগেই সাবধান করবে ওকে। পাশাপাশি ওরা চললে জটিল ট্র্যাক খুঁজে বের করা সহজ হবে।

তাতে হয়তো রক্ষা পাবে একদল নিরীহ মানুষ।

যে-কোনও সময়ে আবারও হামলা করবে ভয়ঙ্কর ওই দানব।

ছয়

আবছা ধূসর আলোয় ঘুম ভাঙবার পর বুঝল, তেমন ঘুটঘুটে অন্ধকার নয় অরণ্য। নিজেকে দেখল: না, সম্পূর্ণ উলঙ্গ নয় সে। এখন আর নেই দামি শার্ট বা বুট। কিন্তু কোমর-উরুতে রয়ে গেছে ছেঁড়া প্যান্ট।

মেঝেতে বিছিয়ে আছে সবুজ শেওলা, চারপাশে আকাশ-ছোঁয়া মস্ত সব গাছ। ঘন পাতার মাঝ দিয়ে নেমে অরণ্যের মেঝেতে নানান আলপনা এঁকেছে সোনালি আলো।

ধীরেসুস্থে উঠে বসে মাথা স্পর্শ করল সে।

নতুন করে বদলে যায়নি খুলি।

তা হলে কি থেমে গেল দেহের পরিবর্তন?

পরিষ্কার মনে পড়ল, কী করেছে সে।

কী হয়ে উঠেছে!

ভয়ঙ্কর দানবের মত খুশিতে খল-খল করে হেসে ফেলল সে।

গাঢ় ঘুম ভেঙে এখন লাগছে সব ছেঁড়া স্বপ্নের মত। অবশ্য, স্পষ্ট মনে পড়ল গতরাতের দৃশ্য: জানের ভয়ে পালাতে চেয়েছিল ওরা, চিৎকার করছিল প্রাণপণে। মগজে গনগনে ক্রোধ নিয়ে রক্তিম চোখের নিখুঁত দৃষ্টিতে দেখেছে সে শত্রু-দেহের আতঙ্কের লালচে আভা। তখনই প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে হামলা করল। ছাড়ল না কাউকে। খুনের পর খুন করে পেয়েছে জান্তব আনন্দ। প্রতিদিন পাল্টে যাচ্ছে তার শরীর, সেই সঙ্গে হয়ে উঠছে ও আরও নিখুঁত একটা খুনের মেশিন; জঙ্গলের বিষয়ে বাড়ছে সচেতনতা, সেই সঙ্গে বাড়ছে গায়ের জোর।

বেশ ক'দিন আগে বাতিক চেপে বসেছিল বলে প্রসিজার বা নিয়ম না মেনেই এক্সপেরিমেন্ট করেছিল। সেজন্য পেতে হয়েছে প্রচণ্ড ব্যথা। দুই থাবা দিয়ে ছিটকে ফেলে দিয়েছিল ল্যাবোরেটরির সব ইকুইপমেন্ট। যে-ই সামনে পড়েছে, হয়ে গেছে খুন। নেশা ধরেছিল খুনের। অতিরিক্ত অ্যাড্রিনালিনের জোয়ারে দারুণ মজা লেগেছে সবাইকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিতে। সারারাত মানুষই হোক বা অন্য কোনও প্রাণী, কেউ রক্ষা পায়নি তার হাত থেকে। পরদিন সকালে ভয়ানক ক্লান্তিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল মেঝেতে লাশগুলোর পাশে। তখন ওই জ্বলন্ত ফ্যাসিলিটিতে সে ছাড়া জীবিত কেউ ছিল না।

এখন সে পুরো নিশ্চিত, সত্যিই সফল তার এক্সপেরিমেন্ট। আশা করেনি, সেই আমলের ওই দানবের দৈহিক ও মানসিক সব ক্ষমতা পেয়ে যাবে। কাজেই ক্ষোভও নেই। টের পেয়েছে, হারাতে শুরু করেছে ও তার নিজ পরিচয়। এমনই হওয়ার কথা। ইনফেকশন আরও বাড়লে হয়তো ভুলেই যাবে কে ছিল সে। তাতেই বা কী? মস্ত বড় এক বিজয়ী মনে হচ্ছে নিজেকে। ভেড়ার পালে যেন সত্যিকারের প্রচণ্ড শক্তিশালী এক সিংহ! প্রতিবার

বদলে যেতেই আরও আক্রমণাত্মক ও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে।

ভাবতে গিয়ে আবারও হেসে ফেলল। কী অবাকই না হয়েছিল, যখন পাল্টে যেতে লাগল দেহ! তখনও ভাবতে পারেনি, হয়ে উঠবে এত শক্তিমান! অথচ, আগে সামান্য মানুষ হিসাবে কাটাচ্ছিল সে সাধারণ জীবন!

প্রথম ফ্যাসিলিটির সব চুরমার করে দেয়ার পর নিজেই অবাক হয়েছিল। ব্যস্ত হয়ে ট্রান্সমিট করেছিল কমাণ্ড সেন্টারে। জানিয়ে দিয়েছিল, নিজ দেহে ইনজেক্ট করেছে এক্সপেরিমেন্টাল ডিএনএ। কিন্তু আরও বহু টেস্ট করতে হবে, নইলে নিশ্চিত হওয়া যাবে না, পূরণ হবে কি না ওদের গোপন উদ্দেশ্য। প্রসিজার না মেনে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে নিজ দেহে ডিএনএ দিয়েছে বলে ভীষণ খেপে গিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু মুখে যা-ই বলুক তারা, আসলে খুশি হয়েছে, মানব দেহে ব্যবহার করা যাবে ওই সিরাম।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর লাশ সরাতে এবং দায়িত্ব নেয়ার জন্য হাজির হলো দ্বিতীয় টিম। বিধ্বস্ত ফ্যাসিলিটি ও করুণভাবে খুন হয়ে যাওয়া রক্তাক্ত মানুষের লাশ দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সবার বুঝতে দেরি হয়নি, এক্সপেরিমেন্ট প্রায় সফল।

মৃত কলিগদের পরিণতি তাদেরও হোক, তা চায়নি কেউ। সবাই মিলে আটক করেছে ওকে। সবাই জানত, নির্দিষ্ট সময়ে আবারও উন্মাদ হয়ে উঠবে ও, পাল্টে যেতে থাকবে ওর শরীর।

ওকে বন্দি করে রাখতে বেছে নেয়া হয়েছিল স্টিলের রিইনফোর্সড় ঘর। ওখানে ছিল স্টিলের দরজা, চৌকাঠ আর আড়া নিয়েব্রিয়াম-টাইটেনিয়ামের। ওর রক্ত সংগ্রহ করে অ্যানালাইয করা হলো। দীর্ঘ ওই সারাটাদিন জেলের মেঝেতে বসে ভেবেছে সে, শুধু স্রষ্টাই জানেন এবার কী হবে রাতে।

ওর কাছ থেকে পাওয়া নতুন ডিএনএ-র জিন নিয়ে গবেষণা করছিল ফ্যাসিলিটির বিজ্ঞানীরা। লেলিহান শিখার মত ওর শরীরে

ছড়িয়ে পড়েছিল অদ্ভুত ওই জিন। অথচ, কিছুই বুঝতে পারেনি ওর প্রাক্তন ওই কলিগরা।

পরে তাদেরকে মরতে হয়েছে বলে, আবছা একটু যেন অনুশোচনাও এসেছিল মনে। হয়তো ঠাণ্ডা মাথায় সবাইকে খুন করা অনুচিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখ যেভাবে চেপে ধরার কথা, তেমন হয়নি। আর পরে স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে মনে হতে লাগল, শালার কুকুরের বাচ্চাগুলো মরলে তার কী!

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর খুলে গিয়েছিল মস্ত স্টিলের দরজা, চৌকাঠে এসে পা রেখেছিলেন মাথাভরা সাদা চুলের এক বিজ্ঞানী। উনিই ছিলেন গোটা অপারেশনের দায়িত্বে। তাঁকে ভাল করেই চিনত সে। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল, নিয়ম না মেনে নিজের দেহে সিরাম দিয়েছে বলে নাখোশ নন তিনি।

অখুশি হলেই বা কী হতো?

অন্তর থেকে যা চেয়েছিল, সেই ক্ষমতা তো পেয়ে গেছে সে!

একটা কথাও বলেননি বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। দরজা ভিড়িয়ে রেখে চলে যান নীরবে।

মৃদু হাসল সে। পরিষ্কার মনে পড়ছে, কীভাবে শুরু হলো সব।

আকস্মিক ভাবেই পাওয়া গেল দানবের লাশ। সবাই বুঝেছিল, ওটাই হোমো-সেপিয়েন্সের পূর্বপুরুষ– নর-দানব। দশ হাজার বছর ধরে বরফ জমাট গ্লেসিয়ারের সমাধিতে চমৎকার ভাবে সংরক্ষিত ছিল।

ডিএনএ অ্যানালাইয করে জানা গিয়েছিল: সাধারণ মানুষের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী ছিল ওই দানব। যেমন ছিল জোর, তেমনই তার গতি। অবিশ্বাস্য অকিউলার স্পেস মগজে– তাই ঘুটঘুটে আঁধারেও দেখত পরিষ্কার। অবশ্য, সবাই হতাশ হলো ওটার অপেক্ষাকৃত ছোট টেমপোরাল লোব দেখে। বেশি ভাবত

না ওই দানব। তা হতেই পারে। প্রকৃতি তাকে দিয়েছে প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি, বদলে কেড়ে নিয়েছে অতিরিক্ত চিন্তার ক্ষমতা।

বিজ্ঞানীরা নাম দিলেন দানবের: হোমো-সিমিটার বা তলোয়ার-মানব, তবে ঘরোয়া আলোচনায় বলা হয় নর-দানব।

শুভ্র বরফের কফিন থেকে লাশ খুঁড়ে নেয়ার পর, দেখা গেল নীচে পড়ে আছে সেবার টুথ্‌ড্‌ টাইগার বা দাঁতাল বাঘ। সাত শ' পাউণ্ডের শিকারি জন্তুর ঘাড় সরু কাঠির মত ভেঙে দিয়েছিল ওই মানব-দানব। ওরা সবাই বুঝল: বিশ্বের আর সব প্রাণীর চেয়ে হোমো সেপিয়েন্সের পূর্বপুরুষ হোমো-সিমিটারের হিংস্রতা, টিকে থাকার ক্ষমতা ও দৈহিক শক্তি ছিল বহুগুণ বেশি।

নিজেদের মাঝে তর্কে মেতে উঠলেন বিজ্ঞানীরা।

পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, দানবের ডিএনএ-তে রয়েছে অদ্ভুত কিছু অর্গানিক পদার্থ, যা পাওয়া যায় না বর্তমান বিশ্বে। সেই আমলের ফল-মূল ও ফুল খেয়ে তার সিস্টেমে ছড়িয়ে গিয়েছিল নানান কেমিকেল। আর সেসব তৈরি করেছিল জেনেটিক অ্যান্টিফ্রিয বা জমাট-বিরোধী পদার্থ। মৃতদেহে পানি জমাট বেঁধে যাওয়ার সময় মোটেও বিস্তৃত হয়নি তার কোষ। অর্থাৎ, শূন্য ডিগ্রির নীচে থাকলেও কখনোই পুরোপুরি জমাট বাঁধেনি দানবের লাশ।

আর এটাই এই শতাব্দীর সেরা আবিষ্কার।

অথচ, কিছুই আবিষ্কার করেনি বিজ্ঞান।

এতে কোনও কৃতিত্ব নেই কোনও বিজ্ঞানীর।

খল-খল করে হাসল এ যুগের নর-দানব।

বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে!

এবার ধরতে হবে কোনও শিকার।

সেটাকে খাওয়ার পর গভীর রাতে হামলা করবে আজ দূরের ফ্যাসিলিটিতে।

সাত

একটু পর ল্যাণ্ড করবে মস্ত বিমান, ম্যাক্সিমিলিয়ানের দেয়া ফাইল আরেকবার ঘাঁটছে রানা। ওর সঙ্গীদের বিষয়ে যতটা পারা যায় জেনে নেয়া উচিত।

ওকে অনানুষ্ঠানিক ভাবে ব্রিফ করেছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। তথ্য বলতে তেমন কিছুই ছিল না। তবে রানা বুঝতে পেরেছে, ওর সঙ্গে শিকার করতে যারা যাবে, তারা সাধারণ আর্মির লোক নয়— স্পেশাল রেসপন্স টিমের লোকও নয়।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলেছেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'ওরা সিএমসি বা সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের হয়ে কাজ করছে না।'

অর্থাৎ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্ক নেই। যতদূর মনে হয়, এই শিকারি দল জড় করা হয়েছে নানান দেশের আর্মি ত্যাগ করা সৈনিকদেরকে নিয়ে।

কিন্তু সেটা করা হয়েছে কেন?

সিএমসি একমাত্র ফেডারেল এজেন্সি, যেটা পসি কোমিটেটাসের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত নয়। ফলে ইচ্ছা করলে কংগ্রেশনাল অ্যাপ্রুভাল ছাড়াও আমেরিকার মাটিতে সিএমসিকে কাজে লাগাতে পারত ইউএস সরকার। এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। বিষয়টি অত্যন্ত সন্দেহজনক। মনে হয়, সরকার যেন ভয় পেয়েছে মিলিটারিকে কাজে লাগাতে। কিন্তু এমন হওয়ার তো কথা নয়।

রানা জানতে চাওয়ায়, সানগ্লাস পরা জেঙ্গ সিমঙ্গ অস্পষ্ট জবাব দিয়েছে: নানান কারণেই আমেরিকার সৈনিক ব্যবহার না করে মানুষ-শিকার বা জন্তু শিকারে দুনিয়া-সেরা লোকগুলোকে জড় করেছে তারা। প্রত্যেকে এরা হাইলি ট্রেইণ্ড, ভুল করবে না দায়িত্ব পালন করতে।

তর্ক করেনি রানা। ধরে নিয়েছে, জরুরি কিছু জানতে চাইলে এক গাদা মিথ্যা বলবে এই সিআইএ এজেন্ট।

এদিকে ম্যাক্সিমিলিয়ান রানাকে বোঝাতে গিয়ে বার-বার বলেছেন, কোনও বিপর্যয় হলে সঙ্গে সঙ্গে ওই এলাকায় পৌঁছে যাবে হেলিকপ্টার।

কথাটা হয় ভুল, নয়তো ডাহা মিথ্যা। চাইলেই হেলিকপ্টার পৌঁছে যেতে পারবে না আলাস্কার দুর্গম সব এলাকায়। প্রস্তুতি নিতেই অনেক সময় নিয়েছে আর্মি ও সিআইএ। ওরা যেন সাফল্য পাওয়ার চেয়ে দুর্যোগ ঠেকাতেই বেশি ব্যস্ত।

আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল দ্বিতীয় হান্টার। চোখ পড়ল রানার চোখে। সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠল সতর্ক। দেখে নিল খালি কার্গো হোল্ড, তারপর বার কয়েক চোখ পিটপিট করে হাই তুলল।

ওর চওড়া ঘাড়ে হাত রাখল রানা। শক্ত হয়ে আছে নেকড়ের পেশি। বন্ধু মৃদু হাসতেই নাক দিয়ে গুঁতো দিল বুকে।

'আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাক,' বলল রানা। 'একটু পর মাটিতে নামব। কিন্তু তখনও গাল চাটতে দেব না।'

একবার ওকে হতাশ চোখে দেখে নিয়ে ধুপ্ করে তারপুলিনে শুয়ে পড়ল হান্টার। কুচকুচে কালো চোখ থাকল স্লাট ফুটি কার্গো হোল্ডের দরজার উপর, সতর্ক।

একবার মস্ত হান্টারকে দেখল রানা। ভাবল, ওর নিজের আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। আর আরও নিরাপদ বোধ করবে

পাশে কালো নেকড়ে থাকলে। ওটা গভীর ভাবে ঘুমিয়ে থাকলেও কাছাকাছি কেউ এলেই তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। দেরিও করে না হামলা করতে।

নেকড়ের ছানা পাওয়ার পর ওই জাতের বিষয়ে রীতিমত গবেষণা করেছে রানা। তখনই জেনেছে, কুকুর বা কয়োটে থেকে নেকড়ে নানানদিক থেকে আলাদা। চারপাশের আওয়াজ অনেক বেশি লক্ষ করে তাদের মগজ। আছে দূর-দৃষ্টি। কল্পনা করে নিতে পারে সামনে কী ঘটবে।

বিড়াল ছাড়া অন্য আর সব প্রাণীর চেয়ে বহু দূরের আওয়াজ শুনতে পায়। আবার পাত্তাও দেয় না অপছন্দের শব্দকে। এদিক ওদিক সরে ওদের নাক, টের পায় সামান্য সব গন্ধ। ইনফ্রারেড ছুঁড়তে দক্ষ বাদুড় ছাড়া অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ ওদের চোখ। রাতে শিকারে বেরোলে ব্যবহার করে ওই ক্ষমতা। প্রখর দৃষ্টি ও গন্ধ পাওয়ার শক্তি ওদেরকে করে তুলেছে দক্ষ শিকারি।

বেশিরভাগ শিকারি প্রাণী কোনও না কোনও বিশেষ দক্ষতার উপর ভর করে শিকার ধরে। ওই ক্ষমতা আসে প্রকৃতিগত ভাবে। কিন্তু নেকড়েরা শিকার করতে গিয়ে প্রয়োজনে বার-বার চোখ ও ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে। একবার শিকারের পিছু নিলে সফল না হওয়া পর্যন্ত পিছু ছাড়ে না। এদিক থেকে ওদেরকে সেরা শিকারি বলা যায়। আর ধূসর নেকড়েদের চেয়েও এক কাঠি সরেস দ্বিতীয় হান্টার। ওর আছে মানসিক ও দৈহিক প্রচণ্ড ক্ষমতা। আকারও প্রকাণ্ড, প্রায় পূর্ণবয়স্ক একটা ভালুকের সমান।

বেশিরভাগ নেকড়ে চর্বিহীন ও হাড় জিরজিরে হয়। টিকে থাকতে গিয়ে দিনের পর দিন বা সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলতে হয় তাকে, সহ্য করতে হয় ভীষণ ক্ষুধা। কিন্তু হান্টারের জীবনে তেমন হয়নি। ছোটবেলায় রানার অঢেল যত্ন পেয়েছে বলেই

হয়তো হয়ে উঠেছে অন্য সব নেকড়ের চেয়ে অনেক বড় ও শক্তিশালী। ওকে বলা যেতে পারে নেকড়ের মাঝে হেভিওয়েট দানব। কাঁধে-পায়ে থোকা-থোকা পেশি। ইস্পাতের তারের মত ঘাড় ওজন ধরে রাখছে মস্ত মাথার। একবার মাঝারি আকারের কোনও হরিণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তার আর রক্ষা নেই।

হাত বাড়িয়ে হাণ্টারের থাবা ধরল রানা।

মাথা নিচু করে নিল নেকড়ে।

ওটার শ্বদন্ত স্পর্শ করল রানা।

হাণ্টারের চোয়ালের হাড়ে গভীর ভাবে গেঁথে আছে গজালের মত ক্ষুরধার দাঁত– প্রায় বুনো শুয়োরের চোখা দুই দাঁতের সমান। গত বছর অসুস্থতার ছুটির সময়ে দ্বিতীয় হাণ্টারকে নিয়ে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় গিয়েছিল, মনে পড়ল রানার।

গহীন অরণ্য কিসপিয়ক্স-এ দুই টুরিস্ট দম্পতি হারিয়ে গেছে শুনে ট্র্যাক করেছিল। পুরো চার দিন লেগেছিল তাদেরকে খুঁজে বের করতে। এত সময় ব্যয় হয়েছিল, কারণ জঙ্গল সম্পর্কে তাদের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। উচিত ছিল চুপচাপ বসে-শুয়ে কাটিয়ে দেয়া সময় তাতে থাকত দেহে যথেষ্ট সামর্থ্য। পরবর্তীতে সাহায্য এলেই ফিরে যেতে পারত সভ্য এলাকায়। কিন্তু বোকার মত দু'জন ঘুরে বেড়িয়েছে নানানদিকে। ব্যয় করে ফেলেছে জরুরি ক্যালোরি। তাদেরকে খুঁজতে গিয়ে শীতের ভিতর অনেক ক্যালোরি খরচ করতে হয়েছে রানাকেও। বোকা ওই দম্পতিকে পাওয়ার পর মেডিকেল হেলিকপ্টারের জন্য রেডিয়ো করেছে। কিন্তু সেই সময়ে হারিয়ে গেল দ্বিতীয় হাণ্টার।

চিন্তিত হয়ে নেকড়ের ট্র্যাক অনুসরণ করল রানা।

অনেকটা দূরে এক ঝাড় লম্বা বার্চ গাছের নীচে পাওয়া গেল হাণ্টারকে। মুখোমুখি হয়েছে আরেক নেকড়ের।

ওটা ছিল মস্ত এক ধূসর আলফা মেল, দলের নেতা।

ওই দল খতম করে দিয়েছিল বড় এক এল্‌ক্‌ হরিণকে।

দলের নেতা হিসাবে প্রথমে খাওয়ার অধিকার আছে শুধু ধূসর নেকড়ে দলের নেতার।

কিন্তু হঠাৎ করেই ওখানে হাজির হয়েছে হান্টার। কোনও ভাবেই মানবে না, ওর আগে হরিণের মাংস পেটে পুরবে আর কেউ। গর্জন ছেড়ে হান্টারকে ভাগিয়ে দিতে চেয়েছে আলফা মেল। কিন্তু তখন পাল্টা গর্জন ছাড়ল কালো নেকড়ে। ওই ভয়ানক হুঙ্কার শুনে থমকে গিয়েছিল রানাও।

তখনই হামলা করল ধূসর নেকড়ে।

প্রথম আক্রমণ বিদ্যুদ্বেগে এড়িয়ে গেল হান্টার। কাঁধ দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল ধূসর নেকড়েকে। ওটা দ্বিতীয়বার হামলা করবার আগেই সরে গেল নিজেই। আসলে তখনই শুরু হলো দুই নেকড়ের সত্যিকারের দীর্ঘ লড়াই। বন্য ওই সংগ্রাম চলল কয়েক ঘণ্টা। বার-বার পিছিয়ে গেল হান্টার, আবারও হামলা করল, ছিটকে সরে গেল নানানদিকে, ঝাঁপিয়ে পড়ল নতুন উদ্যমে।

নীরবে লড়াই দেখল রানা।

পুরো ছয় ঘণ্টা চলল যুদ্ধ।

কেউ রাজি নয় হারতে।

শত্রুকে খুন করে ফেলবার মত মারাত্মক কোনও হামলা করতে পারল না ওরা। কিন্তু এক পর্যায়ে আলফা মেলের ঘাড়ে দাঁত বসাল হান্টার। কুলকুল করে ক্ষত থেকে ঝরতে লাগল রক্ত। তখন বাধ্য হয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে হলো ধূসর নেকড়েকে।

জঙ্গলে মাফ করে না কেউ কাউকে।

ব্যতিক্রম নয় হান্টারও, সতর্ক ভাবে সামনে বেড়ে কামড় বসাল ধূসর নেকড়ের ঘাড়ে। পরক্ষণে হামলা করল সর্বশক্তি নিয়ে। আলফা মেলের ঘাড়-গলার ক্ষত থেকে ছিটকে বেরোল উষ্ণ রক্ত। মাটিতে পড়ে বার কয়েক দাপাদাপি করে স্থির হয়ে

গেল পূর্ণবয়স্ক ধূসর নেকড়ে। ওটার লাশের পাশে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল হান্টার, তারপর ক্লান্ত পায়ে সরে এসে থেকে লাগল মৃত এলক।

হান্টারের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল নেকড়ের পাল। তারপর তাদের নতুন নেতা সন্তুষ্ট হয়ে সরে যেতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল অবশিষ্ট মাংসের উপর।

হান্টারের ওই লড়াই কখনও ভুলবে না রানা। যে বন্য-হিংস্রতা নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কালো নেকড়ে, তা ছিল দেখবার মত। ওর পেট পুরে খাওয়া শেষ হলে একবার ফাঁকা গুলি করে নেকড়েদের সরিয়ে দিয়েছিল রানা। নীরবে ওকে দেখছিল হান্টার। হরিণের পিছন দিকের মাংস কেটে স্টেক সংগ্রহ করেছিল রানা। এরপর আগুন জ্বেলে মাংস ঝলসে নিয়েছে ও। ফিরতি পথে খাবার হিসাবে কাজে আসবে, তাই বাতাসে শুকিয়ে তৈরি করল বিশ পাউণ্ড মাংসের জার্কি। হরিণের পিছনের পায়ের মস্ত এক অংশ কেটে ওটার চামড়া দিয়ে ঢেকে দিয়ে মাংসের টুকরো রেখে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। জানত, রেঞ্জার বেস পর্যন্ত পৌঁছুতে ওই পরিমাণ মাংস লাগবে ওর নেকড়ের।

রানার জানা ছিল, ওরা চলে গেলে হামলে পড়বে শিকারি নানান বন্য প্রাণী। কোনও কিছুই ফেলনা যাবে না এলকের।

হান্টারের সেদিনের ওই লড়াইয়ের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে রানার। অবাক হয়ে ভাবে, সেদিনের পিচ্চি নেকড়ে শাবক বড় হয়ে গেছে সত্যি! বন্যদের মাঝেও যে নিজের মত এক বন্য। অন্তর থেকে জানে, লড়াই করতে হবে, ছাড় দেবে না।

আর হান্টারের ওই লড়াই থেকে রানাও বুঝেছে, যতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বে কালো নেকড়ে। প্রাণ থাকতে কখনও পিছিয়ে যাবে না।

হাত বাড়িয়ে হান্টারের ঘাড়ের রোম এলোমেলো করে দিল

রানা। লক্ষ করল, মনোযোগ দিয়ে দূরে চেয়ে আছে কালো নেকড়ে। যেন সামনে বিপদ টের পেয়ে হয়ে উঠেছে হুঁশিয়ার। ওর চোখ অনুসরণ করে কার্গো হোল্ডে কিছুই দেখল না রানা।

আবছা আঁধার ছাড়া চারপাশে কিছুই নেই।

আট

ছায়াচ্ছন্ন অরণ্যে অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সে। অবাক হয়ে ভাবছে, কী করে ভুলে গেল নিজের নাম!

সামান্য বিব্রত।

দু'হাত তুলল মুখের সামনে। কুঁচকে গেল ঝোপের মত দুই সাদা ভুরু। গতবার ঘুম থেকে উঠে দু'হাত দেখেছে, কিন্তু এখন সব বদলে গেছে একেবারে!

চওড়া ও পুরু থাবার শেষে ধারালো নখর। ক্রমেই আরও পাল্টে যাচ্ছে সে, হয়ে উঠছে ওই দানবের মতই প্রচণ্ড শক্তিশালী। এমনই হওয়ার কথা। হিংস্রতার দিকে থেকে কেউ কিছুই নয় ওর কাছে। আর কখনও মানুষের মত হতে পারবে না। কখনও দুর্বল হবে না, হবে না অসুস্থ। দশ হাজার বছর আগের ওই দানবের মতই থাকবে সে রাজার হালে। যা খুশি করবে।

বাধা দেবে কে?

কারও সাধ্য নেই ওকে খতম করবে!

অবাক কাণ্ড, মনে পড়ছে না নিজের নাম!

ঠিকই আছে আর সব স্মৃতি।

পরীক্ষা করে দেখেছে নিজেকে।

যে অদ্ভুত ডিএনএ নিজ দেহে ইনজেক্ট করেছে, ওই বিষয়ে সবই মনে রয়ে গেছে। শব্দটা ইলেক্ট্রোফোরেসিস।

এ কথা ঠিক, পুনর্গঠিত বেশিরভাগ ডিএনএ এখনও হোমো সেপিয়েন্সের, কিন্তু এক্সপেরিমেন্টের পর অন্য এক শতাংশ ডিএনএ একেবারেই পাল্টে দিয়েছে তাকে।

ওই এক শতাংশ ডিএনএ পরীক্ষা করে জানা গেছে, সব ধরনের অসুখের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলছে ওটা। ওই ডিএনএ যেন অসীম শক্তির এক রিচার্জেবল ব্যাটারি, প্রায় অনন্ত কাল ধরে কাজ করবে দেহে।

সব কোষ বুড়ো হলে মৃত্যুর দিকে যেতে হবে, জানে সে। এক পর্যায়ে নতুন করে তৈরি হবে না কোষ। কিন্তু বর্তমানের আধুনিক মানুষের করুণ পরিণতি কখনও বরণ করবে না অদ্ভুত দানব হোমো-সিমিটার। তার ডিএনএ থেকে গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, এক সময় আর পুনর্গঠিত হবে না ওই কোষ। মরতেই হবে, কিন্তু সেই মরণ হবে বহু শত বছর পর। হিসাব-নিকাশ থেকে আন্দাজ করা হয়েছে, এক থেকে দেড় হাজার বছর বাঁচবে হোমো-সিমিটার।

গবেষণা করেও বের করা যায়নি, ঠিক কী কারণে এত বছর বাঁচত ওই দানব। বিজ্ঞানীদের ধারণা: দীর্ঘ জীবনের পিছনে ছিল বিশেষ ইমিউন সিস্টেম। কোনও রোগ ধরে বসলে ডিএনএ-র কোডিং ভেঙে বেরিয়ে আসত অবিশ্বাস্য পরিমাণের নিয়ন্ত্রক এনযাইম। দেরি না করে হামলা করত ফরেন এজেন্ট বা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াকে। গবেষণা অনুযায়ী, মাত্র গোটা দশেক ভাইরাসকে বন্দি করত কোটি কোটি এনযাইম। আর এ কারণে মানুষের চেয়ে অনেক পোক্ত ছিল নর-দানবের ইমিউন সিস্টেম

বিজ্ঞানীরা যখন জিজ্ঞাসু চোখে পরস্পরকে দেখছেন, জানতে

চাইছেন মানুষের দেহে ওই ডিএনএ কপি করা যাবে কি না; ওই সময়ে নিজের দেহে টেস্ট করল সে, নিল ওই ডিএনএ-র কোডিং।

কখনও ভাবতে যায়নি, ওই জিনিস দেহে ইনজেক্ট করবার অধিকার তার আছে কি না। ভাল করেই জানত, যদি সফল হয়, পেয়ে যাবে সুপার হিউম্যানের যোগ্যতা। দেরি করেনি ঝুঁকিটা নিতে। তার উদ্দেশ্য বিজ্ঞান চর্চা ছিল না।

কিন্তু তাতেই বা কী?

চেয়েছে বহু কাল ধরে বাঁচবে, আর সেজন্য যা করা দরকার, তাই করেছে।

তখন বুঝতে পারেনি কত বদলে যাবে সে। এখনও টের পাচ্ছে, দেহের ভিতর তৈরি হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তি। ফুলে ফুলে উঠছে সব পেশি। আরও শক্ত ও পুরু হচ্ছে সব হাড়। কে জানে, হয়তো পরের ঘুম ভেঙে উঠে দেখবে, আরও পাল্টে গেছে সে।

মনে নেই, প্রথম রাতে কী কারণে ল্যাবোরেটরিতে হামলা করেছিল। শুধু লাল এক আভার ভিতর দিয়ে দেখেছিল চিৎকার করছে মানুষগুলো। কালো সব নখ বাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে সবার উপর। ডামে, বামে, সামনে বা পিছনে, যাকে পেয়েছে, খুশি মনে খুন করেছে। রক্তে ভেসে গিয়েছিল মেঝে। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে বুঝল, কী করে ফেলেছে। তখন দেরি না করে যোগাযোগ করেছে কমাণ্ড সেন্টারে।

তারপর এল দ্বিতীয় রিসার্চ টিম।

তখনও মনে হয়েছিল, খুন করে ফেলা উচিত সবকটাকে। তাকে বন্দি করলে কী হবে, ঠিকই বেরিয়ে গিয়েছিল কম্পাউণ্ডে– তা-ই করেছে, যা আগেও করেছিল।

স্টিলের দরজা আগেই ভিড়িয়ে রেখে গিয়েছিল বুড়ো বিজ্ঞানী।

আর রাত বাড়তেই দুই হাতের প্রচণ্ড শক্তি ব্যবহার করে কবাট ও সিমেন্টের দেয়াল বিধ্বস্ত করে দিল সে। ছিটকে পড়ল স্টিলের মস্ত কবাট, ল্যাবোরেটরিতে ভাসতে লাগল ভাঙা দেয়ালের গুঁড়ো। তখনই লালচে দৃশ্যপটে ধরা পড়ল লোকগুলো। হামলা করল সে সবার উপর। পালিয়ে যেতে চেয়েছিল তারা, চিৎকার-চেঁচামেচি হচ্ছিল।

কিন্তু যাবে কোথায়?

দ্বিতীয় রাতের খুনগুলো আগের চেয়েও অনেক বেশি আনন্দ দিয়েছে তাকে। ভেবে পায়নি, কোথা থেকে এল এত ক্ষমতা!

জঙ্গলের ভিতর খল-খল শব্দে হাসল সে।

সত্যিই হয়ে উঠেছে পৃথিবীর বুকে একমাত্র আরাধ্য দেবতা।

কেউ ঠেকাতে পারবে না তাকে।

কেউ না!

চাইলে ছুটন্ত গণ্ডারকে ছিটকে ফেলবে। তার মস্ত দুই হাতের আওতায় এলে বাঁচবে না কোনও মানুষ বা জানোয়ার। গভীর চাওয়া ছিল মনে, মানুষের শয়তানী বুদ্ধি আর প্রাগৈতিহাসিক দানবের প্রচণ্ড শক্তি তার হোক। কিন্তু এখন বার-বার পরিবর্তনের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে মানুষের খল-বুদ্ধি। জেগে উঠছে বুকের গভীরে ঘুমিয়ে থাকা এক দানব। সামনে এমন এক সময় আসবে, যখন সামান্য নিয়ন্ত্রণও থাকবে না নিজের ওপর। মানুষের মত চিন্তা না করে ভাববে নর-দানবের বোবা ভাষায়।

কিছুক্ষণ এসব নিয়ে ভাবল সে, তারপর মেনেও নিল।

আসলে কিছুই যায় আসে না তার।

ওকে নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা বা টেস্ট চুলোয় যাক!

আসল কথা ক্ষমতা আর দীর্ঘ আয়ুষ্কাল!

এ তো মিথ্যা নয়, আগামী একটি হাজার বছর বিশাল এ দেশে রাজত্ব করবে সে!

পুরো স্বাধীন জীবন!
বাধা দেবে না কেউ!
ইচ্ছা মত খুন করবে!
খুন করবে!
খুন করবে আর খুন করবে!

নয়

দুপুরে প্রকাণ্ড মিলিটারি বিমান থেকে নামল রানা, আড়ষ্ট দেহে একবার ভেঙে নিল আড়মোড়া। কাঁধে তুলে নিল ছোট প্যাক ও মারলিন রাইফেল। র‍্যাম্প বেয়ে নামলেন ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম পরা লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান।

মনে হলো নিজ হাতে কর্তৃত্ব রেখেছেন। হাঁটার ভঙ্গি অলস। থেমে দু'হাত পিছমোড়া করলেন একবার, মৃদু হাসলেন। কোমরের হোলস্টারে কোল্ট .৪৫ রিভলভার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওটা ছিল স্ট্যাণ্ডার্ড আর্মি ইস্যু।

'আফটারনুন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল,' বলল রানা। র‍্যাম্প বেয়ে নামতে শুরু করেছে। পাশেই হান্টার।

মন্ত নেকড়েকে দেখে সতর্ক হয়ে উঠেছেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। কিন্তু কেটে গেছে প্রথম দর্শনের নার্ভাস ভাব। প্রয়োজন পড়লে গুলি চালাবেন। বার-বার চোখ যাচ্ছে হান্টারের ওপর।

'আমাদের বেস-এ স্বাগতম, মিস্টার রানা। বিমানের কার্গোয় করে আসতে গিয়ে খারাপ লাগেনি তো?'

'না,' মস্ত ফ্যাসিলিটির উপর চোখ বোলাতে শুরু করেছে রানা। চোখ এড়াচ্ছে না কিছুই। ওর মনে হলো না জায়গাটা কোনও ব্যাটল পোস্ট। মিল বেশি রিসার্চ স্টেশনের সঙ্গে। উঁচু তারকাঁটার দেয়ালের ওপাশে ছয়টা ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার, সম্পূর্ণ সশস্ত্র। পড ভরা রকেট, খোলা বে থেকে নাক বের করেছে এম-৬০।

উজ্জ্বল রোদে ভুরু কুঁচকে দূরে চাইল রানা।

ওদিকে ২৫এমএম বুশমাস্টার কামানসহ আটটি বিপজ্জনক হালকা সাঁজোয়া যান। আরেক পাশে অন্তত পনেরোটি হামভি। প্রতিটার ছাতে এম-৬০ মেশিনগান। এ ছাড়া, রয়েছে ছয়টি পার্সোনেল ট্রাক। টহল দিচ্ছে কমপক্ষে ষাটজন সৈনিক। কোনও রিসার্চ স্টেশনে এত লোক থাকে না। কম্পাউণ্ডের চারপাশে টিনের ছাত দিয়ে তৈরি উইন্টার হাট। ওপাশে দুই একর জমি জুড়ে একতলা টিনের লম্বা বাড়ি। আলাস্কার আরও উত্তর দিকে দেখা যায় এসব রিসার্চ আউটপোস্ট।

'ওরা ভাবছে এখানে হামলা হবে,' মনে মনে বলল রানা। চারপাশে কেমন যেন ভয়ের পরিবেশ।

লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ানের দিকে চাইল রানা।

'রাত আটটার সময় ব্রিফ করা হবে,' বললেন তিনি। 'ততক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারেন।'

আলতো করে হান্টারের ঘাড়ে হাত রাখল রানা। 'খাবারও লাগবে।'

'নিশ্চয়ই! ক্যান্টিন খুলে রাখা হয়েছে, আসুন,' একটু দূরের একতলা দালান দেখালেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

রানা ক্যান্টিনে ঢুকে অর্ডার দিতেই চমকে গেল সৈনিকরা। হান্টারের জন্য তিরিশ পাউণ্ড কাঁচা মাংস চেয়েছে ও। আপত্তি নিয়ে মুখ খুলতে যাচ্ছিল বাবুর্চি, কিন্তু তাকে হাতের ইশারায়

নির্দেশ দিলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

নিজে খেতে বসবার আগে বাইরে হান্টারের সামনে মাংস রেখে এল রানা। সারাদিন ও রাতে ওই মাংস সাবাড় করবে নেকড়ে। দেহে জমা করবে খাবার। যখন শিকার পাবে না, তখন ওই চর্বি ভেঙে চলবে ওর।

নেকড়েরা তা-ই করে। সহজ বুদ্ধি, কেউ জানে না আগামী এক সপ্তাহ শিকার ধরতে পারবে কি না, কাজেই শিকার পেলে পরবর্তী দিন-রাত ধরে সেটা খেয়ে শেষ করে। ক্যান্টিনের বাইরে হান্টারকে রেখে নিজের টেবিলে এসে বসল রানা।

এ মিশনের গুরুত্ব নিয়ে বলতে শুরু করলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'খোলা এই জায়গায় সব খুলে বলা সম্ভব নয়,' নিচু স্বরে বললেন, 'কিন্তু একটা বিষয়ে কোনও সন্দেহ রাখবেন না: ওই জন্তুকে শেষ করতে দুনিয়ার সেরা সৈনিক জড় করেছি। হিসেবের ভেতর রাখা হয়েছে সব ধরনের বিপদের কথা। আপনার মূল কাজ হবে ট্র্যাক করে ওই জন্তুর কাছে দলের সবাইকে পৌঁছে দেয়া।'

সুস্বাদু স্টেক খাওয়ার মাঝে চট্ করে হান্টারকে দেখল রানা। নেকড়ের আশপাশে কেউ নেই। পঞ্চাশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে কয়েকজন সৈনিক। চোখে ভয় ও কৌতূহল। মনে হলো না বিরক্ত করবে হান্টারকে। কিন্তু, সত্যিই যদি বিরক্ত করা হয়, খুন হয়ে যাবে সেই লোক।

আবারও নিজের খাবারে মন দিল রানা। কিন্তু একটু পর দেখল, মাথা তুলে চাইলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

খুব কাছে পৌঁছে গেছে কেউ, টের পেয়ে মুখ তুলল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন খাটো গড়নের সাদা চুলের এক বৃদ্ধ।

প্রফেসর আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি। পরনে সাফারি সুট, আর্কটিকে বেমানান। দু'হাত ভরেছেন পুরনো ফিশিং ভেস্টের

পকেটে। ডানদিকের পকেট থেকে ঝুলছে ঘড়ির চেন। চওড়া হাসি দিলেন রানার উদ্দেশে।

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল রানা, মৃদু হাসছে। আলিঙ্গন করল বৃদ্ধকে।

'আরেব্বাপরে! তোমাকে দেখতে লাগছে নায়ক জন ওয়েইনের মত, বাছা!' খুশি মনে রানার পিঠ চাপড়ে দিলেন বৃদ্ধ। 'শুনেছি মাঞ্চুরিয়ার অভিযানের কথা। আহত হওনি তো?'

মাঞ্চুরিয়া থেকে ফিরে যোগাযোগ করতে ভুলে গিয়েছিল বলে একটু লজ্জিত রানা। ওর অসুখটা মাঝে মাঝে চরম বিরক্ত করে তুলছে ওকে। হ্যাঁ, মরতে মরতে বেঁচে গেছে মাঞ্চুরিয়ায়। আটকা পড়েছিল পাহাড়ি এক গুহায় সাইবেরিয়ান মস্ত দুই সাদা বাঘের মাঝে। এলাকার অধিকার নিয়ে লড়ছিল তারা। কাবাবের হাড্ডি হওয়ার ইচ্ছা রানার ছিল না। কিন্তু সরে যাওয়ারও উপায় ছিল না। দুই বাঘের যে-কোনওটা খুন করত। অল্পের উপর দিয়ে বেঁচে গেছে, কারণ নিজেদেরকেই খুন করে ফেলেছে দুই বাঘ।

মাথা নাড়ল রানা। 'আহত হইনি, তবে মরার জন্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম।'

'মরে যাওয়া কোনও কাজের কথা নয়,' বললেন সিরাজউদ্দীন। খেয়াল করেছেন খাবার ছেড়ে উঠে পড়েছে রানা। 'আরে, বসে পড়ো। খেয়ে নাও। শান্ত পরিবেশে আপাতত এটাই আমাদের শেষ দিন। তারপর থাকতে হবে দৌড়ের ওপর।' রানা চেয়ারে বসতেই পাশে নিজে বসে বললেন, 'কী বুঝলে মাঞ্চুরিয়ার বাঘের ব্যাপারে?'

মুখের খাবার শেষ করে বলল রানা, 'ট্র্যাক ছিল ছয় দিন আগের। বিউরেইঙ্কিয় ক্রেবেটের উঁচু এলাকা। বছরের বেশিরভাগ সময় বরফ-শীতল পরিবেশ। জেনেটিক কারণে বা শীতে ওটার হয়েছিল ঘন দাড়ি। সাইবেরিয়ান টাইগার, বিশাল।'

'স্মৃতি রোমন্থন করল রানা, 'বয়স সতেরো বছর। ওজন সাত শ' পাউণ্ডেরও বেশি। লেজসহ দৈর্ঘ্যে তেরো ফুট। দূর থেকে মনে হয়েছিল কাস্পিয়ান। কিন্তু আসলে তা ছিল না।'

মাথা দোলালেন সিরাজউদ্দীন।

চুপ হয়ে গেছে রানা। ওরা চলেছে শীতের উষ্ণ এলাকায়। এখন থেকে সঞ্চয় করতে হবে এনার্জি। শুধু উষ্ণ থাকতে গিয়েই খরচ হবে চারগুণ ক্যালোরি।

এতক্ষণ বাংলায় কথা হচ্ছিল, একটি বর্ণও বুঝতে পারেননি লে. কর্নেল। তাঁর কথা শুনে ভেতরে ইংরেজি শুরু করলেন বৃদ্ধ: 'এবারে সমস্যার দিকে নজর দেয়া যাক, নানান ধরনের ঝামেলা...'

বাধা দিলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'প্রফেসর, এখানে আলাপ না করলেই কি নয়?'

হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিলেন সিরাজউদ্দীন। 'রাখুন তো আপনার ফালতু ভয়! আমার পাক হায়েনা মারা মুক্তিযোদ্ধা, জীবনে কখনও ভয় পাইনি, আর এখন এই পা কবরে রেখে নতুন করে শিখব কীভাবে ভয় পেতে হবে? তবে একটা কথা, বুড়ো হয়ে গেছি বলেই ভাবছি, আমার হয়তো উচিত হবে না আপনাদের অভিযানে যাওয়া। আমার কারণে বিপদে পড়তে পারে অন্যরা।'

ঝট করে ম্যাক্সিমিলিয়ানের দিকে ফিরল রানা। 'আপনি তো একবারও বলেননি আমাদের সঙ্গে ট্র্যাকিং করবেন প্রফেসর!'

'মিস্টার রানা, বলার সময় পেলাম কোথায়,' সিরাজউদ্দীনকে দেখালেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল, 'হ্যাঁ, তাঁর যাওয়ার কথা অবযার্ভার হিসেবে। তবে ভাবনে না, যে-কোনও বিপদ হলে, বা তাঁর শরীর খারাপ হলে, পাহাড় থেকে হেলিকপ্টারে করে পৌঁছে দেয়া হবে কাছের হাসপাতালে। তাতে লাগবে বড়জোর তিরিশ

মিনিট।' পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ঝরল কণ্ঠে, 'ভরসা রাখতে পারেন আমাদের ওপর। তাঁর সুস্থতার বিষয়ে সামান্য ঝুঁকিও নেব না আমরা।'

'প্রফেসর?' বৃদ্ধের দিকে চাইল রানা।

রানার কাঁধে হাত রাখলেন সিরাজউদ্দীন। 'আমার কোনও বিপদ হবে না, রানা। তোমার বোধহয় মনে নেই, গত কয়েক বছরে কঠিন কয়েকটা অভিযানে গিয়ে কষ্টসহিষ্ণু হয়ে গেছি।' মৃদু হেসে চেয়ারের পিঠে হেলান দিলেন। 'হ্যাঁ, বুড়ো হয়ে গেছি, কিন্তু একেবারে বাতিল মাল হয়ে যাইনি। আর দরকার পড়লে...'

'হেলিকপ্টারে করে সরিয়ে নেয়া হবে,' বললেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'তাতে মোটেও সময় নেব না আমরা।'

'ঠিক-ঠিক,' সায় দিলেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের বন্ধু। 'কাজেই কোনও চিন্তা কোরো না তুমি।'

'কিন্তু ওই ট্র্যাক অত্যন্ত দুর্গম, প্রফেসর,' আপত্তির সুরে বলল রানা। 'প্রতিদিন পেরোতে হবে মাইলের পর মাইল পাহাড়ি এলাকা। চলার পথে বাধ্য হলে আরও বাড়াতে হবে হাঁটার গতি। তাল রাখা কঠিন হবে আপনার জন্য। আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লে অনেক পিছনে পড়বে সাপোর্ট টিম। ...এসব বাদ যাক, আমরা কিন্তু জানি না কোন্ জন্তুর পিছু নেব, ওটা কতটা ভয়ঙ্কর। যে ধারণা দেয়া হয়েছে, ওটা পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক জন্তু। তার অভ্যেস জানা নেই। কী করবে জানা নেই। ...টেরিটোরিয়াল না নকটারনাল কেউ জানে না। আমি অনুসরণ করব, কিন্তু আমার জানা নেই, ওটা আহত হলে বা কোণঠাসা হলে কী করবে। হয়তো পাল্টা হামলা করবে, বা উল্টো শিকার করতে চাইবে।' একটু কড়া হয়ে গেল রানার কণ্ঠ, 'প্রফেসর, আপনি বয়সের তুলনায় যথেষ্ট শক্ত, কিন্তু আমরা যে কাজে যাব, সেটা কিন্তু হাড় খুঁজে বের করার অভিযান নয়। আমরা যার পিছু নেব, ওটা খুন

করতে পারে বাঘের মত। আরও খারাপ দিক, কোনও কারণ ছাড়াই খুন করে খুনের নেশায়।'

মৃদু হাসলেন সিরাজউদ্দীন। 'বুঝতে পারছি, তুমি আমার জন্যে চিন্তিত। সব সময় আমার ভাল চেয়েছ অন্তর থেকে। কীসে আমার ভাল, সেদিকে নজর রেখেছ। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্ত নিয়েছি: আমি অবশ্যই যাব এই অভিযানে।' রানার চোখে চোখ রাখলেন তিনি। নরম সুরে বললেন, 'রানা, বাছা, তুমি বুঝতে পারছ, ওখানে কী পেয়ে যেতে পারি? কল্পনা করতে পারো?'

চোখের পলক পড়ল না রানার। 'আপনি বড়জোর দেখবেন মারাত্মক এক খুনিকে। এত দ্রুত খুন করে, বুঝবার আগেই খতম হয় যে-কেউ।' গলা নিচু করল, 'আগ্নেয়াস্ত্র বা বড় দলের তোয়াক্কা করে না। প্রফেসর, ওটাকে বাঘের মত তাড়িয়ে দেয়া যাবে না। টোপ ফেলে বা অ্যাম্বুশ করে ফাঁদে ফেলা যাবে না। যে ধরনের জানোয়ারই হোক, তার সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা নেই। শুধু আঁচ করছি, ওটা পৃথিবীর সবচেয়ে নৃশংস খুনি, এক কিলিং মেশিন। চলেছি তার আস্তানায়। আর্মির লোক বলছে, ব্যাক আপ হিসাবে দক্ষ একদল সৈনিক থাকবে। কিন্তু সত্যিই যদি ওই জানোয়ার হামলা করে, ব্যাক আপ টিম পৌঁছুবার আগেই খুন হব আমরা। কাজেই আরেকবার ভেবে দেখুন, জন্তুটাকে খুঁজতে গিয়ে ওই পাহাড়ি এলাকায় খুন হবেন কি না।'

এসব বলেছে, তাই কৃতজ্ঞ চোখে রানাকে দেখলেন প্রফেসর। 'সবই বুঝতে পারছি, রানা। কিন্তু এই অভিযান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেব না।' আন্তরিক হাসলেন তিনি। 'আমার যে বয়স, হয়তো চলেছি জীবনের শেষ অভিযানে। রানা, বলো তো, বাছা, তুমি আমাকে শেষবারের মত দারুণ এক অভিযান থেকে জোর করে বাদ দিতে চাও?'

এক মুহূর্ত পর প্লেটের দিকে চাইল রানা। চুপ করে আছে।

'যাক, তা হলে কথা শেষ,' বললেন প্রফেসর, 'এবার বলো, তোমার ঘোড়াটা, মানে, ওই নেকড়েটা কোথায় গেল?'

'বাইরে,' বলল রানা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন প্রফেসর আহমেদ সিরাজউদ্দীন, স্লেটের মত ধূসর র‍্যাম্পের দরজা পেরিয়ে পৌঁছে গেলেন বাইরে। গমগম করে উঠল ভারী গলা।

জানালা দিয়ে রানা দেখল, খাটো প্রফেসরের দুই কাঁধে দুই পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে হান্টার। চেটে চলেছে মানুষটির মুখ। শোনা গেল তাঁর সন্তুষ্টির হাসি।

আহত দ্বিতীয় হান্টারকে জঙ্গল থেকে নিয়ে ফিরবার পর, সোজা রানা যোগাযোগ করেছিল প্রফেসর সিরাজউদ্দীনের সঙ্গে। তিনি বলে দিয়েছিলেন: 'নিয়ে এসো ওকে, আমি দেখব কী করা যায় ওর জন্যে।'

বিনা টাকায় নেকড়ে-ছানার চিকিৎসা করেন। রানার কাছ থেকে সব দায়িত্ব বুঝে নিয়ে জরুরি সব অ্যান্টিবায়োটিক, ড্রাগস ও ভিটামিন দিয়েছেন হান্টারকে। সব সময় নরম আচরণ করেছেন, ঠিক ভাবে পরিষ্কার করেছেন ক্ষত, নিজ বাড়িতে আদরে রেখে সুস্থ করে তুলেছেন।

ছয় সপ্তাহ যমের সঙ্গে লড়াই করেছে বাচ্চাটা। সর্বক্ষণ পাশে থেকেছেন প্রফেসর। কখনও নেকড়ে-ছানার ইনটেসটাইনের প্লেগের খিঁচুনি ঠেকাতে প্রায় লিথাল ডোয দিয়েছেন স্যালাইন সলিউশন ও থোরাযিনের। কিন্তু আসলে নেকড়ে-ছানাকে রক্ষা করেনি বিজ্ঞান। হান্টার টিকে গেছে, কারণ ওর রয়েছে বাঁচার অদম্য আগ্রহ। যেন জেদ ধরেছিল, প্রকৃতি যা খুশি করুক, এভাবে মরবে না ও। আরও তিন সপ্তাহ পর একদিন সত্যিই চার পায়ে উঠে দাঁড়াল।

জানালা দিয়ে প্রফেসর আর নেকড়ের কুস্তি দেখছে রানা।

বুঝতে পারছে হান্টারের মনের কথা। ওর জান্তব হৃদয় কখনও ভুলবে না ওই লোকটা ওকে ভালবাসে। কখনও ভুলবে না। রানা ও প্রফেসর ছাড়া কাউকে নিজের শরীর স্পর্শ করতে দেয়নি হান্টার কোনওদিন।

খাবার শেষ ওর, অন্য বিষয়ে মন দিল রানা। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার সংক্ষেপে বলে ফেলুন।'

'ওই জানোয়ার,' টপোগ্রাফিকাল ম্যাপে লেসার তাক করলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'সরল রেখার মত দক্ষিণে চলেছে– অ্যানাকটুভুক পাস ব্যবহার করে এনডিকট পাহাড়ি এলাকায় ছিল। আমাদের ট্র্যাকাররা বলেছে, তখনও দক্ষিণেই চলছিল। এ পর্যায়ে পাথফাইণ্ডার হারিয়ে ফেলেছে তাকে।' সিসটানশে গিরি সঙ্কটের এক মাইল নীচের এলাকায় রশ্মি ফেললেন তিনি।

এখনও শিকারি দল পৌঁছায়নি, ভাবল রানা। ঘরের চারপাশে ঘুরে এল ওর চোখ। 'আর কাউকে তো দেখছি না, শুধু প্রফেসর আর আমি অনুসরণ করব ওই জানোয়ারকে?'

'ছি-ছি, তা নয়,' মাথা নাড়লেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। কথা গুছিয়ে নিয়ে বললেন, 'আগে কখনও এমন দল গঠন করিনি আমরা, মিস্টার রানা। দুনিয়া থেকে সেরা লোকদের জড় করা হয়েছে। তারা দুনিয়ার সবচেয়ে দক্ষ সৈনিক। এক এক করে প্রত্যেককে বাছাই করা হয়েছে, কারণ প্রত্যেকে সত্যিকারের সৈনিক। অন্তর থেকে শিকারি।'

চুপ করে রইল রানা। বাইরে হাসছেন প্রফেসর। কয়েক মুহূর্ত পর ও বলল, 'আপনি বলছেন, বিশেষ দল একত্র করেছেন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল। আমার প্রশ্ন হচ্ছেঃ এরা অন্য যে-কোনও দল থেকে কোন্ দিক থেকে আলাদা?'

'আসলে বুঝিয়ে বলতে পারিনি,' বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষদের জোগাড় করেছি আমরা। আপনি তো

জানেন, ব্যবহার করতে পারব না ইউনাইটেড স্টেটস আর্মিকে। গত সপ্তাহে এখানে যা ঘটল, তাতে হৈ-চৈ পড়ে গেছে রাজনৈতিক আঙিনায়। আর্মি ব্যবহার করলে অনুমতি লাগত কংগ্রেশনাল কমিটির। কিন্তু বিদেশি একদল সৈনিক ভাড়া করলে এসব কথা উঠছে না।'

'ওরা কখন আসছে?' জানতে চাইল রানা একটু তেড়া সুরে।

'আসবে... থমকে গেলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'বুঝলাম না, আসলে কী জানতে চাইছেন?'

'পুরনো হয়ে যাচ্ছে ট্র্যাক,' বলল রানা। 'এদিকের জমি শক্ত। ট্র্যাক করা সহজ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানাদিক থেকে ক্ষয় হবে। আর ছবি থেকে যা দেখেছি, পেরিয়ে গেছে অনেক সময়। ট্র্যাক থেকে কিছু বুঝে নেয়া কঠিন হয়ে উঠছে। তা ছাড়া, ধুলো ও পাতার নীচে হারিয়ে যাবে অনেক চিহ্ন। পাহাড়ি এলাকার উঁচু-নিচু তাপমাত্রার কারণে পাল্টে যাবে ছাপ। গরম ও শীত, দুটোই পাল্টে দেবে চিহ্ন। আপনারা যদি আশা করেন, পিছু নেব ওই জানোয়ারের, তো যত দ্রুত সম্ভব ওসব ছাপের কাছে আমাকে পৌঁছে দিতে হবে। আপনারা ভুলে যাচ্ছেন, এখনও কাজেই নামতে পারিনি আমরা।'

কয়েক মুহূর্ত রানার দিকে চেয়ে রইলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, মিস্টার রানা, শেষ খবর অনুযায়ী আগামীকাল সকালে পৌঁছবে ওই টিম। তখনই রওনা হবেন আপনারা।' মেঝে থেকে তুলে কী যেন রাখলেন টেবিলের উপর। 'এবার দেখুন, এটা থেকে কিছু বুঝতে পারেন কি না।'

জিনিসটা দানবের ফুট প্রিন্টের প্লাস্টার করা ছাপ। ওই একই সময়ে আবারও টেবিলের পাশে পৌঁছে গেলেন ডক্টর সিরাজউদ্দীন। বুক পকেট থেকে চশমা বের করে ঝুঁকে পড়লেন পায়ের ছাপের উপর।

নীরবে ছাপ দেখছে রানা।

'কী বুঝলেন?' একটু পর জানতে চাইলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'কোনও অনুমান? নিশ্চয়ই ফোটোগ্রাফের চেয়ে অনেক পরিষ্কার?'

ছাপে আলতো করে হাত বোলাল রানা। 'যখন হামলা করেছে, তার কতক্ষণ পর এই ছাপ তোলা হয়েছে?'

'আন্দাজ ছয় ঘণ্টা।'

'আবহাওয়া কেমন ছিল?'

'শুকনো।'

'বাতাস?'

সামান্য ভেবে নিয়ে বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'মৃদু হাওয়া ছিল, আমার অনুমান।'

'ছাপ কি বালি, ধুলো না কাদার ভেতর ছিল?'

'ধুলোর ভেতর,' দৃশ্যতই বিরক্ত হয়ে উঠছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'এসব জেনে কী হবে? আপনি বলেছেন, পায়ের ছাপ কতক্ষণ আগের বা কী ধরনের ক্ষত হয়েছে, তা খুব জরুরি; কিন্তু এসবই তো থাকার কথা ছাপের ভেতর। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কী ধরনের জন্তুর বিরুদ্ধে লড়তে হবে?'

চট করে রানাকে দেখলেন ডক্টর সিরাজউদ্দীন। ডক্টর ভাল করেই জানেন, এই আমেরিকান কর্নেল ভুল করছে, দুর্ব্যবহার করলে ট্র্যাকিং করবার কাজটাই নেবে না রানা, স্রেফ মানা করে দেবে।

মাথা নাড়ল রানা, 'না।'

'অ্যাঁ?' বিজ্ঞানী ও রানাকে দেখলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। বুদ্ধিমান লোক, ঝটপট বুঝে গেছেন, ঠ্যাকা আসলে তাঁর। মুখ থেকে মুছে ফেললেন আগের বিরক্তি, সেখানে ফুটল নার্ভাসনেস।

বুঝিয়ে বলল রানা, 'এটা পায়ের নীচের ছাপ। জমিতে পা ফেলেছে মানুষের মত করে। সাধারণত, যে-কোনও ট্র্যাকে দেখা

যায়, ধীর গতিতে গেছে কোনও জন্তু। কিন্তু এই জানোয়ার ছুটতে শুরু করে অনেক গতি তুলেছে। সম্ভবত দৌড়াচ্ছিল। পা জমির দিকে নামাবার সময় যেভাবে ছাপ ফেলেছে, তাতে মনে হচ্ছে সে পুরুষ। পায়ের বাইরের দিক বেশি ব্যবহার করে পুরুষ। মেয়েরা ভিতরের অংশ। এই জানোয়ারের বয়স বেশি নয়, কারণ চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে মোটেও সময় নষ্ট করেনি।'

'চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে সময় নষ্ট করেনি, তা কোথা থেকে বুঝলেন?'

মৃদু মাথা নাড়ল রানা। 'বুঝিয়ে বলা কঠিন, তবে বহুবার ট্র্যাক করলে এক সময় ট্র্যাকারের মনে নিশ্চিত অনুভূতি তৈরি হয়। বলে দিতে পারে, যাকে ট্র্যাক করছে, তার বয়স কত। আমার কোনও ভুল না হয়ে থাকলে, ওই জানোয়ারের বয়স বড়জোর পাঁচ বা ছয় বছর।'

'নিশ্চিত নন, যে ওটা কী?'

'না, জানা নেই।'

লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে হতভম্ব মনে হলো। কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, 'কিন্তু নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছেন, ওটা কী?'

চিন্তা করতে শুরু করে আনমনে বলল রানা, 'জানি, ওটা কীভাবে চলে। কী ভেবেছে, তা-ও আঁচ করতে পারি; বা কীভাবে হামলা বা খুন করবে। ব্যবহার করে ডান হাত। বয়স বোঝা গেছে। ওজন তিন শ' পাউণ্ড। শক্তিশালী, দ্রুত আর বিপজ্জনক। কিন্তু জানি না, ওটা আসলে কী।'

'আপনি অবশ্য বলেছেন, ট্র্যাক অনেকটা ভালুকের মত।'

'ট্র্যাক নষ্ট হয়েছে, এবং তার মানে এই নয় যে, ওটা কোনও ভালুক,' বলল রানা, 'আগেও বলেছি, এসব ছাপ অনেকটা মানুষের পায়ের ছাপের মত। শুধু বলা যায়, ওটা কোনও বাঘ নয়। কোনও মানুষ হতে পারে না, কারণ একেকবারে যেভাবে

দূরে দূরে পা রেখে গেছে, তা পারবে না কোনও মানুষ। আমার ধারণা, ওটা এমন কোনও জন্তু, যেটা আগে কখনও দেখিনি আমি। দেখেনি অন্য কেউ।'

প্লাস্টারের ছাপ মনোযোগ দিয়ে দেখছেন বাঙালি বিজ্ঞানী, একটু পর মুখ তুলে ম্যাক্সিমিলিয়ানকে দেখলেন। 'লেফটেন্যান্ট কর্নেল, আপনার আপত্তি না থাকলে এই ছাপ আমার ইন্সটিটিউটে পাঠাতে চাই। সেক্ষেত্রে ভালভাবে অ্যানালাইয করা যাবে। এটা যথেষ্ট ভাল ছাপ, হয়তো এ থেকে জরুরি কোনও সূত্র পাবে আমার সহকারীরা। এমন কিছু, যেটা খালি চোখে দেখা যাচ্ছে না।'

'তা অসম্ভব নয়, প্রফেসর,' এতক্ষণ সব শুনে হতাশ হয়েছেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'আপনারা একটু বসুন, আমি আসছি,' বলে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার ঘরে ঢুকে থামলেন ওদের সামনে। সিদ্ধান্তের সুরে বললেন, 'ঠিক আছে, জেন্টলমেন, আগামীকাল ভোরে সূর্য উঠতেই পৌঁছবে স্পেশাল রেসপন্স টিম। আপনারা বলেছেন, এই মিশনে সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই পাল্টে নিয়েছি আমার নির্দেশ। আগামীকাল প্রথম বেসে আপনাদের সঙ্গে দেখা করবে ওই টিম। প্রথমে হামলা হয়েছিল ওখানে। আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর আমরা কপ্টারে করে যাব দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্টেশনে তখন বঝবেন কী ধরনের হামলা হয়েছিল। আর, মিস্টার রানা, ওখান থেকেই ট্র্যাক শুরু করবেন আপনি।'

মাথা নাড়ল রানা। 'প্রথম বা দ্বিতীয় বেস ঘুরে দেখার ইচ্ছে আমার নেই। সরাসরি পৌঁছুতে চাই তৃতীয় বেসে। ...শেষ স্টেশনে কখন হামলা করা হয়েছিল?'

'চব্বিশ ঘণ্টা আগে।'

'বাঁচতে পেরেছে কেউ?'

আড়ষ্ট কণ্ঠে জবাব দিলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'না।'

দুই ভুরু মৃদু কুঁচকে গেল বিজ্ঞানীর। বললেন, 'আপনাদের

বোধহয় এসব আউটপোস্টের সিকিউরিটি আরও বাড়ানো উচিত। লোকবল চাই, সেই সঙ্গে অস্ত্র। বুঝতে পারছি না, ওই জন্তু এখন পর্যন্ত বেঁচে থাকল কী করে!'

রক্তাক্ত তুষারের ছবি স্পর্শ করলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'আসলে... ওটা... কীভাবে যেন সবকিছু...' চুপ হয়ে গেলেন।

'কীভাবে যেন সব বুঝে ফেলে?' জানতে চাইলেন ডক্টর।

'হ্যাঁ। কাজে আসছে না আমাদের কোনও ট্যাকটিক।' ছবি থেকে মুখ তুললেন না ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'ওটা ভাল করেই জানে, কীভাবে ভেদ করতে হবে আমাদের সিকিউরিটির পর্দা। কখন পাহারা দিচ্ছে গার্ড বা কোথায় থামবে– সব জানা তার। হামলার আগে ভাল করে দেখে নিচ্ছে চারপাশ। বেস আক্রমণ করার আগেই শেষ করে দিচ্ছে লিসেনিং পোস্টের গার্ডদের। তারপর ঢুকে পড়ছে কম্পাউণ্ডে।'

একের পর এক অসংখ্য জিজ্ঞাসা রানার মনে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু জানতে চাইল না। একটা বিষয় পরিষ্কার, যে হামলা করছে, সে এমন কোনও প্রাণী, যেটাকে আগে কখনও দেখেনি কোনও মানুষ। বুঝতে পারছে, মনে যেসব প্রশ্ন জেগেছে, সেগুলোর জবাব পেতে হলে আগে যেতে হবে শেষ সাইটে। চিন্তা করতে হবে জন্তুটার মত করে। নইলে ট্র্যাক করতে পারবে না। লেফটেন্যান্ট কর্নেলের চোখে তাকাল রানা। ওর মনে হলো না কিছু গোপন করছেন তিনি। চেয়ার ছেড়ে উঠে সিরাজউদ্দীনকে বলল ও, 'আজ রাতে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নেবেন। আগামীকাল থেকে শুরু হবে খাটুনি।'

'ঠিকই বলেছ, বাছা,' চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে পড়লেন প্রফেসর, 'বেশ, কর্নেল। আমরা রওনা হব...'

মাথা দোলালেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'ভোর পাঁচটায়। সাইটে পৌঁছব ছয়টার সময়।'

'ভাল। রাতে ডিনার সেরে শুয়ে পড়ব।'

'যা লাগবে, দরকারী সব পাবেন আপনার কোয়ার্টারে, প্রফেসর।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' একবার রানাকে দেখলেন তিনি। 'আমি তা হলে বিশ্রাম নিতে গেলাম, রানা।'

মাথা দোলাল রানা। নেকড়ের পাশে থেমে দেখল, বিজ্ঞানীর কোয়ার্টার দেখিয়ে দিয়ে অন্য দিকে গেলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল।

রাতের আঁধার নেমেছে চারপাশে।

হাঁটতে শুরু করে কনস্ট্রাকশনের পুরনো জিনিসপত্রের একটা স্তূপের সামনে থামল রানা। খুঁজতে গিয়ে একটু পর পেয়ে গেল জুতোর ফিতার মত সরু তার। ওটা টাইটেনিয়াম অ্যালয়ের তৈরি। খুঁজে নিল নিরেট ইস্পাতের খাটো টিউব। শীতল জিনিসটা চমৎকার ভাবে এঁটে গেল মুঠোর ভিতর।

নিজ ঘরে ফিরল রানা, তিন ঘণ্টা পর ক্যান্টিন থেকে সেরে এল ডিনার। রাতে বিছানায় গেল না। ভোর পর্যন্ত কাজ করে তৈরি করে নিল ওর অস্ত্র। রেখে দিল চওড়া ও পুরু চামড়ার বেল্টের ভাঁজে। ভুরু কুঁচকে ভাবল, ওই জন্তুর মুখোমুখি হলে, হয়তো এই অস্ত্র রক্ষা করবে ওকে।

দশ

ঘন কালো মেঘের মাঝ দিয়ে গর্জন ছাড়তে ছাড়তে নেমে আসছে

ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার। বেসের উঠানে পরিষ্কার দেখা গেল, সাদা তুষারে দেড় দিন আগের রক্তের ছোপ ছোপ দাগ। বহুবার মাড়িয়ে দেয়া হয়েছে আর্মির বুট দিয়ে। নীচে চেয়ে নানান ধরনের গিরিখাদ ও টিলা মনে গেঁথে নিল রানা। বুঝতে পারছে, অত্যন্ত যৌক্তিক ছিল ওদিক থেকে হামলা করা।

যান্ত্রিক ফড়িং মাটি স্পর্শ করতেই দরজা খুলে নামল রানা। প্রফেসর সিরাজউদ্দীনকে নেমে পড়তে সাহায্য করল। হাত দিয়ে পোশাক ঝেড়ে সরে গেলেন তিনি। রানার পাশেই হান্টার। এক শ' গজ দূরে আগুনে পোড়া ফ্যাসিলিটি। দুর্ভাগ্যক্রমে ওই টিনের ছাতের দালানে রয়ে গিয়েছিল বিজ্ঞানীরা, এমন সময় হামলা করেছে ওই দানো। উপায় ছিল না কারও বাঁচবার। প্রচণ্ড শক্তি ব্যবহার করে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছিল ফায়ার-রেযিস্ট্যান্ট স্টিলের দরজা ও চৌকাঠ।

বিধ্বস্ত হয়েছে গোটা ফ্যাসিলিটি।

রানাকে সাহায্য করতে যাদেরকে আনা হয়েছে, তারা নেমে পড়েছে দ্বিতীয় কপ্টার থেকে। সেদিকে চাইল রানা।

দলের প্রত্যেকের পরনে স্পেশালাইয্‌ড্ ফরেস্ট ক্যামোফ্লেজ্‌ড্ বিডিইউ বা ব্যাটল ড্রেস ইউনিফর্ম। ভেস্ট থেকে ঝুলছে নানান অস্ত্র ও ম্যাগাযিন। রানা বা বিজ্ঞানীকে পাত্তা দিল না কেউ.। মালপত্র নামাতে শুরু করেছে তৃতীয় ব্ল্যাকহক থেকে।

পারতপক্ষে কথা বলছে না, প্রশ্ন নেই কারও, চোখ-মুখ আবেগহীন। ট্রেইণ্ড, জানে কার কী দায়িত্ব। তাদেরকে দেখতে গিয়েই দ্বিতীয় একটা বিষয় খেয়াল করল রানা।

অন্যদের পাশেই বিডিইউ পরনে কাজ করছে এক মেয়ে। গায়ে বাড়তি হাই-টেক কোনও হালকা আর্মার। এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল কপ্টারের পাশে, ঝুঁকে গেল মস্ত এক রাইফেলের উপর। ওটা চিনতে পেরে অবাক হলো রানা।

অত ভারী অস্ত্রের রিকয়েল সহ্য করতে পারবে ওই মেয়ে?

প্রায় আধ হাত লম্বা বুলেট ম্যাগাযিনে ভরে নেয়ার পর ক্লিক শব্দে রাইফেলের ব্রিচে আটকে নিল সে ওটা। চেম্বারে বুলেট পাঠিয়ে কাঁধে তুলল রাইফেল। ভাব দেখে মনে হলো, কোনও ওজন নেই ওটার। ডানে-বামে ঘোরাল রাইফেলের নল। তারপর পেয়ে গেল টার্গেট।

স্টেশনে বইছে হু-হু শীতল হাওয়া। শিরশির করে উঠল রানার পিঠ, কঠোর চোখে চাইল মেয়েটার দিকে।

স্নাইপার স্কোপের মাধ্যমে ওকেই টার্গেট করেছে ওই মেয়ে।

কয়েক সেকেণ্ড পর প্রকাণ্ড রাইফেল নামিয়ে অন্য দিকে চাইল সে। অস্ত্র রেখে গোছাতে লাগল নিজের মালপত্র।

বিধ্বস্ত ফ্যাসিলিটির দিকে মন দিল রানা। দেখলে মনে হবে, করুণ ভাবে এখানে হেরে গেছে একদল সৈনিক। বার-বার বিস্ফোরণে ধরেছে আগুন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভাঙা স্টিলের দরজা, জানালা ও নানান পোড়া জিনিস। রক্তিম তুষার জানিয়ে দিচ্ছে: এখানে খুন হয়েছে একদল মানুষ।

রক্তের পাশ দিয়ে হেঁটে পুরো কম্পাউণ্ড ঘুরে এল হাণ্টার। শুঁকল রক্ত ও অন্যান্য ঘ্রাণ। মানুষের গায়ের গন্ধ থেকে আলাদা করতে চাইছে অমানুষের গন্ধ।

ট্র্যাক দেখল রানা, ভীষণ ভয়ে বরফ-ঠাণ্ডা পরিবেশে নানানদিকে পালাতে চেয়েছে নারী-পুরুষ বিজ্ঞানী, তাদের সহকারী ও সৈনিকরা। ফ্যাসিলিটিতে ঢুকেছিল যে ভয়ঙ্কর জন্তু, তাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করেছে তারা। এই মৃত্যুর চেয়ে রাতের আঁধারে শীতে জমে মারা যাওয়াও ভাল ছিল তাদের কাছে।

ফ্যাসিলিটির দিকে পা বাড়াল রানা। একবার দেখে নিল লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ানকে। 'ওদের বলুন, আমি ফিরে

না আসা পর্যন্ত যেন ওদিকেই থাকে।'

ঘুরে চাইলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, স্পষ্ট শুনতে পাননি। 'কিছু বললেন?'

'যে-যেখানে আছে, সেখানেই যেন থাকে।' ভাঙা দরজার দিকে চলল রানা। বুঝে গেছে, ডিসকভারি টিম, স্যানিটেশন টিম বা যে দলের লোকই হোক, ইতিমধ্যেই না বুঝে নষ্ট করেছে ফ্যাসিলিটির সব জরুরি প্রমাণ ও সূত্র।

তবুও একবার নিজ চোখে দেখবে, ঠিক করেছে রানা। এখন ওই জানোয়ারের ট্র্যাক খুঁজে বের করা জরুরি। সেক্ষেত্রে বুঝবে, কী ভাবছে তার মগজ। অন্তত ট্র্যাক বলে দেবে জানোয়ারটার অভ্যাস কেমন। দরজার কাছে পৌঁছে কবজা দেখল রানা। ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ব্যবহার করে। এই কাজ করতে চাইলে ক্ষুরধার কুঠার ব্যবহার করতে হবে দানবের মত কাউকে।

মেঝের কাছে ঝুঁকল রানা। ভিতরে গেছে পায়ের ছাপ। শক্ত হয়ে গেল ওর চোয়াল। ফ্যাসিলিটি ছেড়ে পালাতে গিয়ে সব ছাপ জাবড়ে দিয়েছে আতঙ্কিত মানুষগুলো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মস্ত ঘরে ঢুকল রানা। তার আগে হাতের ইশারা করেছে। অন্ধকারে যেন ওর পিছু না নেয় কেউ।

ফ্যাসিলিটির মাঝে বাসি রক্তের পাঁশুটে গন্ধ। থমথম করছে চারপাশ। আবছা আলোয় চোখ চালাল রানা। মানিয়ে নিল বদ্ধ পরিবেশে। চোখ সরু করে চাইল দূরের আঁধারে।

সতর্ক করছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়: রানা, সামনে মস্ত বিপদ!

ধোঁয়া ও রক্তের গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে জং-ধরা তামার ঘ্রাণ। দূরে টিপটিপ করে জ্বলছে লাল বাতি। ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রানা। বিশেষ কোনও দিকেই চেয়ে নেই। ভাবছে: সেই রাতে জানোয়ারটা হামলা করলে কী ছিল সবার মনের অবস্থা? দানব এসেছে খুন করতে! এবং পেয়েও গেছে সবাইকে

হাতের মুঠোয়!

বেশি ভাবতে গেল না রানা। একপাশে চওড়া করিডোর। হামলা করলে নিজে ওদিকে যেত আগে। সাইড প্যাক থেকে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে বাতি জ্বেলে করিডোরের মেঝেতে আলো ফেলল। রক্তাক্ত পায়ের ছোপ গেছে দরজার দিকে। কোনও চিহ্ন নষ্ট না করেই করিডোরের আরও গভীরে ঢুকল রানা। যাওয়ার পথে মনোযোগ দিয়ে দেখছে চারপাশ। বিশ ফুট যাওয়ার পর পেল প্রথম শুকনো রক্তের ছাপ। ওটা দানবের পায়ের। বামদিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, কোনও উদ্দেশ্য ছিল।

পায়ের তৈরি চিহ্ন খেয়াল করল রানা। বুঝল, ওটার গতি ও দ্বিধাহীনতা। সামনে বাড়ল। মেঝেতে থকথক করছে রক্ত। চিহ্ন খুঁজে নেয়া কঠিন। ঢুকে পড়ল ফ্যাসিলিটির অনেকটা ভিতরে। শীতল এই পরিবেশেও দরদর করে ঘামছে। কপাল থেকে ঝেড়ে ফেলল নোনা ঘাম। নিঃশব্দে চলেছে চিতার মত, যেন হামলা করবে কোনও অবলা প্রাণীর উপর। অনেক আগেই সবাইকে খুন করে গেছে ওই জানোয়ার, কিন্তু দুরু-দুরু করছে বুক। অজান্তেই দম হয়ে উঠেছে গভীর ও কাঁপা।

ডানদিকে কী যেন। থামল রানা। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল দেয়ালে। কয়েক সেকেণ্ড ভুরু কুঁচকে দেখল। আলো পড়েছে চারটে দীর্ঘ আঁচড়ের দাগে।

প্রচণ্ড আক্রোশে পাতলা কাগজের মত ছিঁড়ে ফেলেছে ইস্পাতের দেয়াল। ততক্ষণে লাশ হয়ে গেছে অন্তত বারোজন মানুষ। তাতে কমেনি দানবের রাগ, ধ্বংস করে দেবে সব!

দেয়ালে আবারও আলো ফেলল রানা। ওই ইস্পাতের চেয়েও কঠিন কিছু ভয়ঙ্কর শক্তিতে ছিঁড়ে ফেলেছে ধাতব দেয়াল।

তিন নখরের টান মসৃণ।

কিন্তু চতুর্থ নখের আঁচড় অন্যরকম।

ছেঁড়া ধাতব দেয়ালের একটা ফাটলে আলো ফেলল রানা।

ওই যে!

দুই সেকেণ্ড পর বুঝল, জিনিসটা কী।

পকেট নাইফ বের করে ফাটল থেকে সাবধানে বের করল নখটা। বাঁকানো, ধারালো করাতের মত।

চট্ করে একবার কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিক দেখে নিল রানা। কেউ নেই। সাবধানে বুক পকেটে রেখে দিল কালো নখ।

ফ্যাসিলিটির আরও ভিতরে চলল।

পরের অংশ বিধ্বস্ত ল্যাবোরেটরি। ভেঙে ফেলা হয়েছে সব। একপাশে ধাতব কবজা থেকে ঝুলছে স্টিলের এক দরজা। ভিতরে আলো ফেলল রানা। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, এটা আসলে স্টোরেজ ভল্ট। পিছনের দেয়ালে সারি দিয়ে রাখা রেফ্রিযারেটার। গোটা ফ্যাসিলিটির একমাত্র ঘর, যেখানে ভাংচুর করেনি দানব।

কাঁচের প্রতিটি দরজা অক্ষত। ছেঁড়া হয়নি ভারী কবজা। ঘরের মাঝে ঠিক-ঠাক আছে স্টেইনলেস স্টিলের অটপসি টেবিল। মেঝেতে ঝুঁকে নির্দিষ্ট অ্যাংগেলে আলো ফেলল রানা। ভাবছে, প্রচণ্ড আক্রোশের বশে তছনছ করেছে ফ্যাসিলিটি, সেক্ষেত্রে কেন রক্ষা পেল এই ঘর?

ধূসর টাইলে কোনও চিহ্ন নেই যে এখানে ঢুকেছে দানব।

রানার মন বলছে, চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে কিছু।

প্রায় অদৃশ্য ছাপ এড়িয়ে পুরো ঘর সার্চ করল রানা।

দেয়ালে কোনও আঁচড় নেই। ভাঙা হয়নি কিছু।

আরও কিছুক্ষণ পর পাউডারের সরু রেখা দেখল রানা। ওটা অনুসরণ করে খুলল একটা রেফ্রিযারেটারের দরজা।

ভিতরে অসংখ্য সিরাম। এখনও চলছে ফ্রিয।

সিরামের লেবেল দেখল রানা, বুঝে গেল এখানে কী ঘটছে।

খুঁজে বের করল সিরামের ম্যানিফেস্ট।

নিশ্চিত হয়ে গেল আরও।

বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে।

এসব ফ্যাসিলিটি প্রথম দৃষ্টিতে যা মনে হয়, তা নয়।

মনে মনে বলল, পুরো নিশ্চিত না হয়ে মুখ খুললে মস্ত বিপদ হবে।

সতর্ক পায়ে ফ্যাসিলিটির সদর দরজার দিকে চলল রানা।

ওই হোল্ডে যা দেখেছে, অন্যরাও তা বুঝবে। ভুলেও বলা উচিত হবে না ও পেয়েছে ওই দানবের নখ।

খোলা জায়গায় বেরিয়ে ম্যাক্সিমিলিয়ানের সামনে থামল রানা। বুঝে গেছে, ওই জানোয়ারের ছাপ আশপাশে খুঁজে লাভ হবে না, সবই নষ্ট করা হয়েছে বুট দিয়ে মাড়িয়ে।

'ইচ্ছে হলে ওই দালান ঘুরে আসতে পারো,' সাপোর্ট টিমের উদ্দেশে বলল রানা।

চুপ করে আছে সবাই, যেন মেপে নিচ্ছে রানাকে।

ওই দলের একজনের উপর স্থির হলো রানার চোখ।

সে প্রকাণ্ডদেহী যোদ্ধা। পিপের মত বুক। পেশিবহুল হাত। হেভিওয়েট বক্সারদের মত দেহ। রানাকে নিরীখ করছে সে। মুখের একপাশ পুড়ে গিয়েছিল আগুনে। ওদিকের চোখ নিষ্প্রাণ, পাথরের মার্বেল। অন্য চোখে কষছে নানান হিসাব। দৃষ্টি শীতল ও বন্য।

তাকে পাত্তা না দিয়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেলের দিকে ফিরল রানা। 'এখান থেকেই দলের দায়িত্ব নেব। নিশ্চয়ই এদেরকে জানানো হয়েছে আমার বিষয়ে?'

'হ্যাঁ। দলের নেতা আপনি, তা জানানো হয়েছে।'

'ঠিক আছে।' বরফ ছাওয়া টিলা দেখল রানা। 'এবার রওনা হব। প্রথমে যাব আমি। খুঁজে বের করব ট্র্যাক। আপাতত

কম্পাউণ্ডে থাকবে সবাই।'

নিঃশব্দে ওর পাশে পৌঁছে গেল হান্টার।

'বেশ,' বললেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল, 'গুড লাক। আপনি ট্র্যাক পেলেই পিছু নেবে ওরা।'

হেলিকপ্টারের কাছে ডক্টর আহমেদ সিরাজউদ্দীনের পাশে থামল রানা। বৃদ্ধ বুঝে গেলেন, রানা কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু আপাতত বলবে না সবার সামনে। মারলিন রাইফেল তুলে পিঠে ঝুলিয়ে নিল রানা। যেন হঠাৎ করেই ট্র্যাকিঙের দিকে চলে গেছে সমস্ত মনোযোগ। বেরিয়ে এল খোলা গেট দিয়ে। ইশারা করতে হয়নি, পাশে চলেছে হান্টার।

গেট পেরোবার পর থামল রানা, সময় নিয়ে দেখল চারপাশ। এবড়োখেবড়ো তুষারের মাঝে প্যাচ-প্যাচে কাদাটে জমি। ঝুঁকে একমুঠো শুকনো তুষার তুলল রানা, সরু রেখায় ফেলল নীচে। মৃদু হাওয়ায় কাত হয়ে একপাশে পড়ছে গুঁড়ো। কিছুক্ষণ অটল পাথুরে মূর্তির মত চুপ করে থাকল রানা, চোখ-কান খোলা।

পিছনে আওয়াজ। নুড়ি পাথরে পড়ছে বুট।

ঘুরে চাইল না রানা। শুনল কর্কশ এক কণ্ঠ: 'আমরা যে-কোনও সময়ে রওনা হতে পারি, ট্র্যাকার।'

মনে হলো না কথাটা শুনতে পেয়েছে রানা।

'আরে, তুমি দেখছি ওয়েস্টার্ন সিনেমার ইণ্ডিয়ানদের মত নাটক শুরু করলে! আমরা শিকারে বেরিয়েছি, ঘাড়ে ভূত নামিয়ে তারপর জানতে হবে শিকার পাবে কি না?' রানা টের পেল, লোকটার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে হান্টার। কর্কশ হাসল সে। 'ভাল কুকুর জোগাড় করেছ।'

না ঘুরেও প্রকাণ্ডদেহী যোদ্ধাকে দেখল রানা। পুড়ে গেছে তার একদিকের মুখ। হান্টারের দিকে তাক করল তর্জনী। ভঙ্গি দেখে মনে হলো, ওটা পিস্তল। জোরে বলল, 'ক্লিক!' হাসির সুরে স্পষ্ট

টিটকারি। ঘুরে চলে গেল কম্পাউণ্ডে।

আবারও টিলার দিকে মন দিল রানা। পরিষ্কার দেখছে প্রতিটা ঝোপঝাড়, গাছ বা পাতা। দূরের ঢাল উঠে গেছে বহু ওপরে। ওদিকে না গিয়ে সবচেয়ে কম বাধা যেদিকে, সে আঁধার পথ ব্যবহার করবে প্রতিটি প্রাণী। কিছুক্ষণ পর নিশ্চিত হলো রানা, স্বাভাবিক পথ কোন্‌টা হওয়া উচিত।

তখনই আবারও শুনল পায়ের আওয়াজ। পা ফেলা হচ্ছে সাবধানে, ওর প্রতি সম্মান রেখে। ধৈর্য আছে তার। যেন বিরক্ত করতে চাইছে না। পনেরো ফুট পিছনে থেমে গেল শব্দ। চারপাশে আর কোনও আওয়াজ নেই।

ঘুরে দাঁড়িয়ে অবাক হলো রানা। ধারণা করেছিল, যে এসেছে, সে থেমেছে পনেরো ফুট দূরে। তা নয়, দশ ফুট দূরে দানবের মত জাপানি যোদ্ধা— ওর সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। কুঠারের মত চেহারা, অনুভূতি নেই কালো চোখে। জাপানিদের তুলনায় দানব বলা চলে তাকে, পরনে বিডিইউ। হাতে ক্যামোফ্লেজড় এমপি-৫। আরেক হাতে নল-কাটা পাম্প-অ্যাকশন রেমিংটন শটগান। ডান কাঁধের উপরে দীর্ঘ কাটানার বাঁট। এক মুহূর্ত রানাকে দেখল সে, তারপর মাথা দোলাল।

পাল্টা নড করল রানা।

'আমি তানামুরা,' ভারী কণ্ঠে বলল জাপানি। অদ্ভুত জোর গলায়। আবার একই সঙ্গে প্রকাশ পেল ধৈর্য। যেন নিয়ন্ত্রিত সবদিক থেকে। তাকে দেখে রানার মনে হলো, এক শ' বছর আগের লড়াইরত এক সামুরাই যোদ্ধা উঠে এসেছে।

'আমি আপনার সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। বলতে এসেছি, আপনার সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছি। আর আপনার নির্দেশ জানিয়ে দেয়া হয়েছে আমাদেরকে। অমান্য করা হবে না কোনও নির্দেশ। আপনি যোগাযোগ করবেন, সেজন্য অপেক্ষা করব আমরা।'

সামনে বেড়ে ছোট একটা রেডিয়ো রানার হাতে দিল সে। 'পাহাড়েও ভালভাবেই কাজ করবে ওটা।'

'ধন্যবাদ,' হিপ পকেটে রেডিয়ো রাখল রানা। আরেকবার দেখল দূরে দলের সবাইকে। 'ট্র্যাক পেলে যোগাযোগ করব।'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল তানামুরা।

ডানদিকের এক শৈলশিরার দিকে চলল রানা, পাশে হান্টার। উপরে ঘন সবুজ জঙ্গল। রানা আন্দাজ করল, উত্তর দিকের স্প্রুসের জঙ্গলে ঢুকেছে দানব। ঝোপঝাড় কম বলে ওদিক দিয়ে যাওয়া সহজ। মাথার উপর ছায়া দেবে গাছ। ইলেকট্রনিক ও মানব লিসেনিং পোস্ট এড়িয়ে যাবে।

রানা স্থির করেছে, প্রথমে খুঁজে বের করবে বুনোপথ। এমন কী খরগোশও বার-বার একই পথে চলে। রওনা হয়ে শৈলশিরার উপরের জঙ্গলে পৌঁছল রানা। তেমন ঘন ঝোপঝাড় নেই। যার যার আস্তানা থেকে বেরিয়ে একই পথে খাবার ও পানির কাছে যায় ছোট প্রাণী। তাদের পিছু নেয় মাংসাশী জানোয়ার। কিছুক্ষণ পর মাটিতে ডেবে যাওয়া ছাপ পেল রানা। ওই ট্র্যাক চার দিন আগের। দৈর্ঘ্যে মাত্র আধ ইঞ্চি। এ পথে বোধহয় গেছে ছোট কোনও ভালুক।

মৃদু হাসল রানা।

ভালুক নয়, ওটা লেমিং।

নিঃশব্দে, হাঁটতে লাগল রানা। কিছুক্ষণ চলবার পর সরু ট্রেইল হয়ে উঠল চওড়া রাজপথের মত। এই ট্রেইলে চলে প্রচুর জন্তু-জানোয়ার। এল্‌ক্‌, ভালুক ও নেকড়ের পায়ের ছাপ পরিষ্কার দেখল রানা। ট্রেইলে চলতে চলতে বুঝল, মিলিটারি কম্পাউণ্ড এড়াতে গিয়ে বাঁক নিয়েছে পথ। যে যার পথে গেছে অসংখ্য জন্তু, কিন্তু কেউ দেখতে পাবে না ওই কম্পাউণ্ড থেকে। বেঁকে যাওয়া কাঁচাপথে আধ মাইল যাওয়ার পর, প্রথমবারের মত

অস্বাভাবিক জানোয়ারটার ছাপ পেল রানা।

থমকে দাঁড়িয়ে দেখল চারপাশের জঙ্গল। চলছে নানান গুঞ্জন, আশপাশে নেই বিপজ্জনক কোনও জানোয়ার। ওই যে, চল্লিশ ফুট দূরে সাদা ওক গাছের অ্যাকর্ন আরামসে চিবুচ্ছে লাল দুই স্কুইরেল। ট্রেইলের শেষে ধমকের সুরে সঙ্গীকে মিলনের জন্য ডাকছে মাদী কলার্ড পিকা। জঙ্গলে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে রানা। ভুরু কুঁচকে দেখল দানবের ছাপ।

খেপে গিয়ে ছুটছিল। পায়ের থাবা দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করেছে তুষার। সামনের ছাপ স্পষ্ট ও গভীর। আরও জোরে ছুটতে শুরু করেছিল গোড়ালি ব্যবহার করে। রানার আগের হিসাব ঠিকই আছে, জন্তুটার ওজন আন্দাজ আড়াই শ' থেকে তিন শ' পাউণ্ড, আকার বড় ভালুকের সমান। উচ্চতা ছয় ফুটেরও বেশি। ডান হাত ব্যবহার করে। বয়স বড়জোর ছয় বছর।

রেডিয়ো নিয়ে সুইচ অন করল রানা। 'মাসুদ রানা বলছি।'

জবাব দিল তানামুরা, 'হ্যাঁ, মিস্টার রানা?'

'আমি উত্তর-পুবের শৈলশিরায়। ফ্যাসিলিটি থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকের ঢাল ধরে এলে উপরে আমাকে পাবেন। আগেই জানিয়ে দেব কোথায় থামতে হবে।'

'ঠিক আছে, মিস্টার রানা'

বেল্টে রেডিয়ো গুঁজে ভাবল রানা, সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড জাপানি যোদ্ধা তানামুরার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না কেউ, কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসেরও অভাব নেই তার। কিন্তু ওই জানোয়ারকে শেষ করতে হলে চাই সবার একত্রিত প্রচেষ্টা।

আবারও ট্র্যাক করতে চাইল রানা, কিন্তু নতুন কোনও ছাপ না দেখে চলল উপরের ঢালের দিকে। দ্বিতীয় ছাপ পেল বিশ ফুট দূরে। তৃতীয় ও চতুর্থ চিহ্ন আরও বিশ ও চল্লিশ ফুট দূরে। তুষারে গভীর ভাবে বসে গেছে এসব ছাপ।

ট্র্যাক খুঁজতে খুঁজতে চলল। ভাবছে, ওটা আসলে কী?

শৈলশিরার চূড়ায় পৌঁছে টের পেল, সামনে প্রকাণ্ড সব গ্র্যানেট খণ্ড ব্যবহার করে সরে গেছে ওটা। কোথাও কোনও ছাপ নেই।

গলা শুকিয়ে গেছে, টের পেল রানা। উৎরাই বেয়ে নামতে গিয়ে বুঝল: ওই দানব ভাল করেই জানে, কী জন্য ধাওয়া করা হবে তাকে।

খুব সাবধানে পিছনে আসছে দলের অন্যরা, সহজ সুরে বলল রানা, 'ওটা আশপাশে নেই। চলে আসতে পারেন।'

স্প্রুসের কচি চারার ওদিক থেকে দেখা দিল আগুনে পোড়া এক মুখ, রাগ-হিংসা নিয়ে চেয়ে আছে রানার দিকে।

কেন যেন ওই একই দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখল রানা।

ঝামেলা যদি হয়, তো আগে মোকাবিলা করাই ভাল।

অনুভূতি শূন্য দৃষ্টিতে রানাকে দেখল সে, তারপর হঠাৎ করেই হাসল নীরবে। ঘুরে দাঁড়াল, হাতে বড় শটগান। নেমে আসতে লাগল শৈলশিরার চূড়া থেকে।

পরের মিনিটে গাছের সারি থেকে বেরিয়ে এল অন্যরা। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র। ট্যাকটিকাল ইন্সট্রাকশনের কারণে ছড়িয়ে পড়ে আসছে পাথরে ছাওয়া এলাকার উপর দিয়ে। কাভার দিচ্ছে একে অপরকে। মনে হলো না কেউ ভীত। সবার শেষে ঝোপ থেকে বেরোল জাপানি সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। সামনে প্রফেসর সিরাজউদ্দীন।

বৃদ্ধ ভাল ভাবেই হাঁটছেন, দেখল রানা। যদিও তাতে ভরসা পাওয়ার কোনও কারণ নেই। মাত্র শুরু হয়েছে ওদের দুর্গম-যাত্রা। অবশ্য, প্রথম দিনেই বুঝে নেয়া যাবে, কতটা সহ্য করতে পারবেন প্রফেসর। ওর ধারণা: প্রথম দু'একদিন টিকবেন তিনি,

কিন্তু তারপর বয়সের কারণে শুরু হবে সমস্যা। এখন মানা করলেও শুনবেন না, উড়িয়ে দেবেন সব কথা।

আসলে পাহাড়ে মাইলের পর মাইল পথ চললে দেখা যায়, এক সময় ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে চমৎকার শরীরের যুবক। প্রথম সমস্যা করবে পিঠ, তারপর উরু এবং শেষে পায়ের পাতা। তখন একই সঙ্গে বেঁকে বসবে গোটা শরীর। প্রতি সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে হলে শারীরিক সামর্থ্যের চেয়ে বেশি লাগবে মানসিক শক্তি।

রানা দেখেছে, পাহাড়ে দশ দিন চলে ভেঙে পড়েছে জিমনেশিয়ামে নিয়মিত ব্যায়াম করা চমৎকার দেহের যুবক। উঠে দাঁড়াতে পারেনি স্লিপিং ব্যাগ ছেড়ে। প্রথম কঠিন কাজ তখন বুট পরে উঠে দাঁড়ানো। ডক্টর সিরাজউদ্দীনের মানসিক শক্তির অভাব নেই, এখন দেখবার বিষয়, জেদ করে ক'দিন হাঁটবেন তিনি।

রানার সামনে এসে দাঁড়াল নিরেট দেহের জাপানি। সামান্য নড করল। তাতে প্রকাশ পেল সম্মান। কাঠ-বাদামের মত চোখে ওকে দেখছে তানামুরা। চোখ চলে গেল নীচের ঢালে। 'ওটা ওদিক দিয়ে নেমে গেছে?'

'হ্যাঁ,' ফ্রন্টিয়ার স্টাইলে মারলিন রাইফেলের ফিতা বুকে ঠিক করে নিল রানা। 'আগের মতই দক্ষিণে চলেছে। ট্র্যাক একদিন আগের।'

তানামুরার কাটানার হাতল ও নল-কাটা শটগান আগেও দেখেছে রানা। দু'কাঁধের পিছন থেকে বেরিয়ে আছে দুই বাঁট। হাতে এমপি-৫ সাবমেশিনগান। ব্যাণ্ডোলিয়ারে বাড়তি ম্যাগাযিন ও শটগানের শেল। উরুর পাশে বড় কমব্যাট ছোরা।

আগুনে পোড়া টড ওয়েইলারকে পাত্তা না দিয়ে দলের অন্যদেরকে দেখল রানা। কোথাও দেখা গেল না মেয়েটাকে।

এদের কাকে বিশ্বাস করবে, আর কাকে নয়, এখনও জানে না

রানা। অবশ্য, তানামুরাকে যোগ্য বলেই মনে হয়েছে ওর। ধীরে ধীরে সবার সম্পর্কে ধারণা তৈরি হলে তখন বুঝবে, বিপদে কার উপর ভরসা করা যাবে।

ট্রেইলে গোড়ালিতে ভর করে বসে দেখল রানা, জানোয়ারটার শেষ ছাপ। বুঝতে চাইল, ঠিক কোন্ পথে গেছে ওটা।

অন্ধকার ছিল তখন।

কয়েক মুহূর্ত পর বুঝল রানা, কোথায় গেছে ওটা।

দলনেতা উঠে দাঁড়াতেই তানামুরা জানতে চাইল, 'আমরা কি রওনা হব?' এরই মাঝে রানার ট্র্যাকিঙের স্টাইল বুঝতে শুরু করেছে।

'একটা কথা সবাইকে মনে রাখতে হবে,' তানামুরাকে বলল রানা। 'আমি থাকব সামনে।' মাথা দোলাল জাপানি। 'আপনারা আসবেন এক শ' গজ পেছনে। এতে ভুল হলে চলবে না।'

'আমাদের আপত্তি নেই,' বলল তানামুরা। 'তবে আমাদের একজন হয়তো সাহায্য করতে পারবে আপনাকে। হয়তো জানেন, আমাদের দলের প্রত্যেকের বিশেষ দক্ষতা আছে বলেই তাকে নেয়া হয়েছে দলে। এসব নানান যোগ্যতা অনুযায়ী আমাদের ব্যবহার করতে পারবেন মিশনের জন্যে।'

'একটু আগে কার কথা বলেছেন?' জানতে চাইল রানা।

দ্বিধা না করেই কর্তৃত্বের সঙ্গে ডাকল তানামুরা, 'জিনা উইলসন!'

ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা, শৈলশিরায় উঠে এসেছে মেয়েটা। কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছে গেল দলের কাছে। হাতে বিশাল স্নাইপার রাইফেল। চোখে-মুখে কোনও অনুভূতি ছাড়াই রানাকে দেখল।

দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি জিনা উইলসন, হালকা-পাতলা। চুল কালচে-সোনালি, পনি টেইল করা। চোখদুটো সাগর নীল। চাঁদের মত গোল মুখ, কিন্তু দেহে এক ছটাক বাড়তি মেদ নেই।

বুকে ঝুলছে ব্যাণ্ডোলিয়ার, তাতে আঙুলের চেয়ে লম্বা ধাতব জ্যাকেট পরা .৫০ ক্যালিবারের বুলেট।

তানামুরা বলতে শুরু করল, 'আমি মিস্টার রানাকে বলেছি...'

'আমাকে রানা বলে ডাকলেই হবে,' বলল রানা।

নড করল জাপানি। 'হাই।' জিনা উইলসনের দিকে চাইল। 'তাঁকে বলেছি, তুমিও ট্র্যাকিং জানো। হয়তো কাজে আসবে তাঁর।'

'কতটুকু জানো তুমি?' মেয়েটার কাছে জানতে চাইল রানা।

আত্মবিশ্বাসী তরুণী দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'জানি, আপনি মিস্টার...'

'রানা বললেই চলবে।'

'বেশ। জানি আপনি কে, আপনার সম্পর্কে কিছু কথা শুনেছি। আমি হয়তো আপনার মত অতটা দক্ষ ট্র্যাকার নই, কিন্তু অনেকের চেয়ে দক্ষ। পাঁচ বছর ব্যয় করেছি ট্র্যাকার ও পাথফাইণ্ডার প্রোগ্রামে। ছোটবেলা থেকেই শিকার করতাম। হয়তো খুব বেশি জানি না, কিন্তু কী করা উচিত, তা জানি। বোকার মত ভুল করি না। আর আপনার সঙ্গে ট্র্যাকিং করতে চাই শেখার লোভে।' লোভনীয় ঠোঁট মুড়িয়ে রানাকে দেখল জিনা।

তোমার সুন্দর ঠোঁট বা মুখ দেখার চেয়েও জানা জরুরি, তুমি আসলে কতটা শিখেছ, মনে মনে বলল রানা। জানতে চাইল, 'ভালুকের থাবায় কয়টা আঙুল থাকে?'

'পাঁচ।'

'নেকড়ের?'

'পাঁচ।'

'নেকড়ের ছাপ থেকে কয়োটির ছাপ আলাদা করবে কী করে?'

'নেকড়ের থাবার পিছনের প্যাড বড় হয়, আর ডিজিট ক্ল-এর ছাপ পড়ে না।'

'ভালুকের চলার সঙ্গে পাহাড়ি সিংহের তফাৎ কী?'

'ভালুক ভবঘুরে। নির্দিষ্ট পথ নেই, মনে করে এলাকা ওর বাবার। কিন্তু কুগার চলে বৃত্তাকার পথে। সেই ডায়ামিটার আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'বেশ। কিন্তু ওদের শিকার করতে চাইলে গুরুত্বপূর্ণ দিক কী?'

'আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, শৈলশিরায় থাকবে কুগার। একবার ট্র্যাক হারিয়ে গেলেও ওই শৈলশিরা খুঁজতে শুরু করলেই পাবেন পায়ের ছাপ। কিন্তু একবার যদি ভালুকের ছাপ হারিয়ে বসেন, বৃত্ত বড় করতে শুরু করে খুঁজে বের করতে হবে ছাপ।'

যথেষ্ট ভাল ট্র্যাকার এই মেয়ে, মনে মনে স্বীকার করল রানা। মুখে বলল, 'বলো তো, কোনও মানুষ ডানদিকে গেছে, না বামদিকে, তা বুঝবে কী করে?'

'অন্তত পঞ্চাশটা প্রেশার রিলিয় মার্ক আছে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল জিনা। 'কিন্তু বড় কথা, কেউ ডানদিকে গেলে সাধারণত বাম পায়ের ছাপ ডান পায়ের চেয়ে গভীর হবে। বামদিক বাদ দিয়ে ডানদিকে চলেছে সে। কাজেই ছাপ পড়বে গভীর ভাবে। একই রকম, বামদিকে যে গেল, তার ডান পায়ের ছাপ বেশি পড়বে অন্য পায়ের।'

'কিন্তু ট্র্যাক যদি থাকে কোনও শৈলশিরায়?'

'শৈলশিরার ঢাল যদি বামদিকে থাকে, আর কেউ ডানদিকে যায়, তো ডানদিকের পায়ের ছাপ পড়বে গভীর ভাবে। একই ভাবে উল্টো হবে বামে গেলে।'

যথেষ্ট সন্তুষ্ট রানা, কিন্তু তা প্রকাশ করল না। জানতে চাইল, 'ক্রসহেড করতে হলে?'

'আপনি ক্রসহেড করতে বললে, সামনে বেড়ে ক্রিসক্রস সাইন খুঁজব। আপনি যদি ডানদিকে যান, আমি যাব পুব ও পশ্চিমে। খুঁজব কোথাও চিহ্ন আছে কি না।'

'আর সাইড হেডিং?'

'সাইড হেডিং মানে, ট্র্যাকে সমান্তরাল ভাবে চলব আমরা, যাতে উল্টোদিকে সূর্যের আলোয় আবছা ছাপও দেখতে পাই। এটা করা হয় পাথুরে জমিতে, যেখানে ছাপ পড়ে না বললেই চলে। আসল কথা, নির্দিষ্ট অ্যাংগেলে সূর্যের আলো পড়তে হবে, যাতে পাওয়া যায় চিহ্ন।' ভারী রাইফেল সরাল জিনা। এত চট্‌ করে সরিয়ে নিয়েছে যে মনে মনে প্রশংসা করল রানা। 'অনেক প্র্যাকটিস করতে হয়েছে,' মৃদু হাসল জিনা। 'শিখেছি ছোটবেলায় বাবার কাছে।'

'তখন অত ওজনের রাইফেল দেননি তিনি তোমাকে,' মৃদু হাসল রানা। 'আগে কী ট্র্যাক করেছ?'

'ভালুক, কুগার, কয়োটি, নেকড়ে, এলক... প্রায় সব।'

'শেষ কয়েকটা শিকার?' জানতে চাইল রানা।

সরাসরি রানার চোখে চাইল মিষ্টি চেহারার মেয়েটা, চোখের পলক পড়ল না, 'শেষ কয়েকটা শিকার ছিল মানুষ-শিকার, মিস্টার রানা।'

রানা বুঝল, এত সহজ মেয়ে নয় জিনা উইলসন। জঙ্গলের বুনো জন্তুর মতই সতর্ক। ভাল করেই শিখেছে জঙ্গলের প্রাথমিক নিয়ম।

'বেশ, শেষ প্রশ্ন,' বলল রানা, 'বলো তো, খুব কাছে সাপ এল, কিন্তু দেখতে পাওনি– বুঝবে কী করে?'

'সাপ... সাপ...' আয়ত চোখে রানার দিকে চাইল জিনা।

অপেক্ষা করছে রানা।

দু'জনের সওয়াল শুনছে তানামুরা। চোখে আগ্রহ।

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল জিনা, 'মিস্টার রানা, ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি...'

রাইফেলের ফিতা ঠিক করে নিল রানা। 'তুমি আমার সঙ্গে

ট্র্যাক করতে পারো, জিনা।' তানামুরাকে বলল, 'অন্যদেরকে বলুন, আমি ট্র্যাক না দেখা পর্যন্ত চিহ্ন মাড়িয়ে নষ্ট করা চলবে না।'

নড করল জাপানি। 'তাই বলা হয়েছে। অবশ্য, খুব কাছেই থাকব আমরা।'

ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করে বলল রানা, 'জিনা, চলো, যাওয়া যাক।'

ওর পিছু নিল মেয়েটা। খুবই হুঁশিয়ার। ঢালু পথে রওনা হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সাপ খুব কাছে চলে এলে কী করে বুঝব?'

সামনের জঙ্গলে চোখ রাখল রানা। 'ওটাই বুঝিয়ে দেবে কোথায় আছে।'

ঢালু পথের মাঝে নেমে রীতিমত গরম লেগে উঠল সবার। ঝকমকে নীল আকাশে জ্বলছে সোনালি সূর্য। শিরার ভিতর অ্যাড্রিনালিনের ঢেউ টের পাচ্ছে রানা। সামনের এক পাথরে দেখেছে ওই জানোয়ারের পায়ের ছাপ।

মস্ত নেকড়েকে নিয়ে গিরিখাদের কাছে পৌঁছে গেছে। পিছু নিয়ে নিঃশব্দে আসছে জিনা উইলসন।

প্রফেসর সিরাজউদ্দীন, জিনা ও তানামুরা ছাড়া অন্যদের ধারণা, ওই জন্তুর পিছু নেয়ার ক্ষমতা আছে শুধু ট্রেইণ্ড মিলিটারি ট্র্যাকারদের। তাই বলে অবহেলা করছে রানাকে, তাও নয়। নীরবে আসছে শিকার করতে। এখন যদি মুখ খোলে কেউ, সেই আওয়াজ হবে জঙ্গলে বোমা পড়বার মত। সাবধান হয়ে উঠবে অন্তত এক শ'টা জন্তু।

চলতে হবে নিঃশব্দে, নইলে গহীন রহস্য জানাবে না অরণ্য।

দলের সবাই এক শ' গজ পিছনে, সামনে রানা ও জিনা।

ঢালু জমি সমতল হতেই হাত উঁচু করে জিনাকে থামতে

ইশারা করল রানা। ওর মতই কাদাটে জমিতে বসে পড়েছে মেয়েটা। বুঝতে চাইছে, কাদা যথেষ্ট শক্ত, না নরম। ওটার কমপোযিশন, ওয়াটার প্রেশ লেভেল– এমন অন্তত এক ডজন বিষয় মনে রাখতে হবে, নইলে ছাপ পেলেও কিছুই বুঝবে না।

জঙ্গল এখানে হালকা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন্মেছে গাছপালা। খুঁজতে শুরু করে পায়ের সমান ছোট এক ডোবা পেল রানা। কাদাটে পানিতে হাত নামিয়ে খুঁজল দানবের ছাপ।

তারই ট্র্যাক, সন্দেহ নেই।

বড়জোর একদিন আগের।

কিন্তু পানির কারণে নষ্ট হয়েছে চিহ্ন।

দানবটা কোথায় গেছে, বুঝবার উপায় নেই এখন।

নিঃশব্দে রানার পিছনে থেমেছে জিনা। ওর বুটের মৃদু আওয়াজ না পেলে রানা ভাবত, ওখানে কেউ নেই। ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটাকে বামদিকে যেতে ইশারা করল। নিজে চলল ডানদিকে। দু'জনের মাঝে বিশ ফুট ফারাক রেখে দীর্ঘ পাতাওয়ালা সবুজ ঘাসের অরণ্যে ঢুকল ওরা।

পাঁচ মিনিট পর উপরের জমিতে দ্বিতীয় ছাপ পেল রানা। কিন্তু গতরাতের ঝড়-বৃষ্টিতে উপরের ঢাল বেয়ে পানি নেমেছে বলে নষ্ট হয়েছে ওই চিহ্নও। ছাপের উপর কয়েকটা পাতা। আরেকটু হলে চোখেই পড়ত না। নজরে পড়ল কারণ, সামান্য শক্ত জমিতে রয়ে গেছে নখের দাগ।

জিনার দিকে ঘুরে চাইল রানা।

ওর থেমে যাওয়া লক্ষ করেছে মেয়েটা।

মুখ তুলে ওকে দেখছে বুঝতে পেরে একবার মাথা দোলাল রানা।

শত্রুকে দেখতে না পেয়ে এবং ঘ্রাণ নেই বলে রানার পিছনে থেমে গেছে হান্টার, বার-বার নাক কুঁচকেও পেল না কোনও

গন্ধ।

ঢালু পথে উপরে চলল রানা। দেখতে দেখতে চলেছে পুরনো সব ট্র্যাক। বিরক্ত হয়ে উঠছে নিজের উপর। এক সারি পায়ের ছাপ গেছে ওদিকে, ব্যবহার করা হয়েছে পায়ের সামনের দিক। উপরে উঠতে গিয়ে নখ দিয়ে খামচে ধরেছে মাটি। ছাপ মানুষের পায়ের মতই।

ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করে পরের ছাপ পেল রানা বিশ ফুট দূরে। ওটা বাম পায়ের।

একেক কদম ফেলেছে বিশ ফুট পেরিয়ে!

বিশ-পঁচিশ ফুট... তা কি সম্ভব?

পারবে কোনও জানোয়ার?

ঢালু এলাকায় পাঁচ ফুটের বেশি পেরোতে পারবে না কোনও বাঘ!

বাধ্য হয়ে থামল রানা। নতুন করে দেখল পিছনের ট্র্যাক।

মনে হলো, কোথাও ভুল হয়েছে। কিন্তু একটু পর মানল, কোনও ত্রুটি হয়নি ওর।

জানোয়ারটা কত শক্তিশালী তা টের পেয়ে চমকে গেছে রানা।

সান্ত্বনা দিল নিজেকে, বোধহয় হঠাৎ করেই খেপে গিয়েছিল ওটা, তখন ধমনীতে ছিল অতিরিক্ত অ্যাড্রিনালিন, নইলে এক কদমে পৌঁছুতে পারত না এত দূরে।

জিনা কাছাকাছি আসতেই আবারও সামনে বাড়ল রানা। ভাবছে: ওটা আসলে কী জন্তুর পায়ের ছাপ? কখনও দেখেনি ওই জন্তু। আর দেখতে চায়, তাও বোধহয় নয়!

এগারো

সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের ল্যাবোরেটরিতে ক্রিপটোযুলোজি ও প্যালিয়োনটোলজি বিশেষজ্ঞ নিনা সয়্যার ও টিপা মুই বসে আছে পাশাপাশি চেয়ারে। টেবিলে দেখছে প্লাস্টারের কাস্ট। দু'ঘণ্টা আগে ওই ছাপ দিয়ে গেছেন এক মিলিটারি অফিশিয়াল। ওটা প্রায় ষোলো ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের কাস্ট। আর গবেষণা করতে গিয়ে ধাঁধার ভিতর পড়ে গেছে নিনা ও টিপা।

ইন্সটিটিউটে ডক্টর সিরাজউদ্দীন না পৌঁছুনো পর্যন্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ল্যাবোরেটরি ডিরেক্টর নিনা সয়্যারকে।

আরও কিছুক্ষণ ওই ছাপ দেখে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'কেমব্রিজ থেকে ইকোসিস্টেমের ওপর ডক্টরেট করেছি, তার আগে মাস্টার্স করেছি প্যালিয়োনটোলজির ওপর। তারও আগে গ্র্যাজুয়েশন করেছি হিস্টোরিকাল জিয়োলজি ও ফসিলাইযেশনের মলিউক্যাল থিয়োরির ওপর। তারপর বেশ কয়েক বছর নামকরা কয়েকটা ইন্সটিটিউটে বর্তমানের সেরা ক'জন প্যালিয়োনটোলজিস্টের অধীনে গবেষণা করেছি।' মাথা নাড়ল সে। ছাপের দু'ইঞ্চি দূরে নিয়ে গেল মুখ। 'কিন্তু বলতে লজ্জা নেই, জীবনেও দেখিনি এই ধরনের কোনও পায়ের ছাপ।'

টিপা মুই টুঁ শব্দ করল না।

থমথম করছে মস্ত ল্যাবোরেটরি।

ফুঁ দিয়ে চোখ থেকে হলদেটে চুল সরাল নিনা। আবারও শুরু করল, 'টিপা, বাপের জন্মেও দেখিনি এই জিনিস। বুঝতেই তো পারছি না কী দিয়ে কাজ শুরু করব।' পা নাচাতে শুরু করল সে। 'দেখলে মনে হয় মানুষের পায়ের ছাপ। কিন্তু পাঁচ আঙুল মিলে যেন বড় একটা থাবা। থাবার শেষে ধারালো সব নখ। ধরে নিতে পারি, এটা কোনও প্রাণীর থাবা, মানুষের নয়।'

'না, মানুষের নয়,' বিড়বিড় করল টিপা, 'কিন্তু আবার কোনও জানোয়ারেরও নয়। কারণ দেখতে মানুষের পায়ের পাতার মত।'

'হুঁ।' টেবিলে টোকা দিতে শুরু করেছে নিনা সয়্যার। 'তা হলে এটা মানুষের না। আবার জানোয়ারেরও না।' শুকনো হাসল। 'তা হলে এটা কী?'

আবারও নীরবতা নামল ঘরে।

'ঠিক আছে, ডক্টর সিরাজউদ্দীন স্যারের মত করে ভাবা যাক,' বলল নিনা। 'তিনি বিশেষ কোনও ফসিল চিনতে না পারলে ক্যাটাগোরাইয করেন ওটার সংখ্যা, আকার, লোকেশন, বয়স বা আকার বুঝে। কোনও ক্যাটাগোরিতে ফেলে তারপর খুঁজে বের করেন ওটা কোন্ পরিবারের। ওখান থেকে খুঁজে বের করেন আসলে জন্তুটা কী। প্রতিটি প্রজাতির আত্মীয়ের ভেতর মিল থাকতেই হবে।'

'চেষ্টা করে দেখা যায়,' বলল টিপা মুই, 'প্রথমে ধরা যাক স্পিশিসঃ হোমো সেপিয়েন্স। বয়সঃ এক সপ্তাহ।'

চুপ করে আছে নিনা সয়্যার। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'এত কম বয়স ধরলে কোথাও যেতে পারবে না, টিপা।' পেন্সিল তুলে ছাপ দেখাল। 'ওটার পাঁচটা আঙুল আছে। নখও পাঁচটা। মস্ত বড়। ওই পা দেখে মনে হয়, ওটা হোমো সেপিয়েন্সের কাছাকাছি কিছুর। আবার না-ও হতে পারে। পাঁচটা আঙুল আছে এমন আর সব জন্তু কারা?'

ভাবতে হলো না টিপা মুই-এর, বলল, 'হোমো হ্যাবিলিস আর হোমো ইরেকটাস। এ ছাড়া বাঁদর শ্রেণী, বড় বিড়াল আর ভালুক– গ্রিজলি, কোডিয়াক, বাদামি আর কালো ভালুক... এ ছাড়া স্তন্যপায়ী বেশিরভাগ জন্তুর পাঁচ আঙুল। নেকড়ে, র‍্যাকুন, চিপমাঙ্ক, স্কুইরেল, শজারু...' খুব হতাশ হয়ে গেল কণ্ঠ, 'এ ছাড়া বিভার, মিঙ্ক, স্কাঙ্ক, ব্যাজার...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' একবার সহকারিণীকে দেখে নিল নিনা সয়্যার। 'বুঝতে পেরেছি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল ওরা।

একটু পর বলল নিনা সয়্যার, 'তা হলে দেখা যাক কী করতে পারি। আমরা জানি, ওটা আসলে কী হতে পারে না। একেবারে শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। ধরে নেব, ওটা অচেনা কোনও স্পিশিস।'

'আমাদের প্রফেসর তাই করেন।'

'হ্যাঁ। আমরা প্রথমেই এই ছাপের ফসফোরেসেন্ট স্ক্যান করব। দেখব প্লাস্টার থেকে ট্রেসিং পাওয়া যায় কি না। ধরে নেয়া যায়, ওটা কন্ট্যামিনেটেড, কাজেই ওই জন্তুর চুল বা রক্তের হিমোগ্লোবিন না পেলে ডিএনএ-র ট্রেস করতে পারব না। তবুও চেষ্টা করতে দোষ নেই। তালিকার ওপর থেকে নীচের দিকে যাব আমরা। আপাতত ক্লাসিফাই করার কথা ভাবতেও যাব না।'

'তার মানে প্রসিজার অনুযায়ী চলব,' বলল টিপা মুই।

'হ্যাঁ, একেবারে ডক্টরের প্রসিজার অনুসরণ করে। এটা যেহেতু খুব জরুরি, তাই অন্য সব কাজ আপাতত বন্ধ।' উঠে দাঁড়িয়ে রহস্যময় ছাপ দেখল নিনা সয়্যার, 'আমরা যদি কিছু পাই, তো সেটা পাব কারণ ডক্টর সিরাজউদ্দীনের কাছ থেকে কিছু শিখেছি।'

মাথা দোলাল টিপা মুই।

'টম জেরাল্ড!'

ওয়াশিংটনের ইউ.এস. মার্শাল অফিসে নিজ টেবিলে কপালের নীচে দু'হাত রেখে আরাম করে ঘুমাচ্ছিল ডেপুটি ইউ.এস. মার্শাল টম জেরাল্ড, আচমকা বিকট হুঙ্কার শুনে মেলল দুই রক্তিম চোখ। আর তখনই দেখল ওর ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়েছেন মার্শাল ফ্র্যাঙ্ক করলি। নিষ্ঠুর চেহারা দেখে অধীনস্থরা তাঁর নাম দিয়েছে গলা-ছেলা শকুন। হাতে এখন খবরের কাগজ। ওটা গোল পাকিয়ে হাতের ইশারা করলেন তিনি। 'জেগে ওঠো!'

ঘুম ভরা টম জেরাল্ড বিড়বিড় করল, 'যা, স্যা!'

হঠাৎ করেই ওর ডেস্কের চারপাশের অন্তত পনেরোটা ডেস্কে ব্যস্ত হয়ে উঠল অন্য কলিগরা। কেউ কেউ চায় নিয়ে চেয়ার ছেড়ে রওনা হয়ে গেল জরুরি কাজে। কিন্তু ঘরে পায়ের সামান্য আওয়াজ নেই।

'হাই, চিফ, এইমাত্র ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে...'

টমের নাকের কাছে গোল পাকানো খবর নাচালেন মার্শাল ফ্র্যাঙ্ক করলি। ভয়ঙ্কর চেহারা করে বললেন, 'ভাউচারের ব্যাখ্যা কই! গাড়ির পেট্রোলের খরচ সাত হাজার ডলার? এই শহর ছেড়ে একবারও কোথাও যাওনি! এবার বাঁচতে চাইলে তোমাকে ক্লাসিক চাপা মারতে হবে!'

'ট্র্যাভেল এক্সপেন্সেস, স্যর!'

'ট্র্যাভেল এক্সপেন্সেস?' মস্ত নাকটা ঝুলে গেল বসের। মনে হলো জীবনে শোনেননি যাত্রা-খরচ বলে কিছু আছে। 'ট্র্যাভেল এক্সপেন্সেস? বেআক্কেল! এর চেয়ে ঢের ঢুকপ দেয়ার মত টেক্কা চাই তোমার!' আঙুল তাক করে নিজ অফিস দেখালেন টমকে। 'এক্ষুণি ওখানে চাই তোমাকে।' কোনও জবাব আশা না করে হন হন করে হাঁটতে লাগলেন নিজ অফিসের দিকে।

ধীরেসুস্থে চেয়ার ছাড়ল টম জেরাল্ড। একবার ঠিক করে নিল টাই। চারপাশ থেকে উঠল মৃদু গুঞ্জন:

'গুড লাক, টম!'

'গলা-ছেলা শকুন মারলে চুপ করে থেকো!'

'সত্যিই মারবে বলে মনে হয় না!'

'কনুই দিয়ে পিঠ ফুটো করে দিলেও মুখ বুজে...

'চোপ! সব শালা বেঈমান!' বিড়বিড় করে মার্শাল ফ্র্যাঙ্ক করেলির অফিসের দিকে চলল টম। তাঁর ঘরে ঢুকে ভিড়িয়ে দিল দরজা। মুঠো করে ফেলেছে দুই হাত। গম্ভীর।

কঠোর চোখে ওকে দেখলেন মার্শাল করেলি। বার কয়েক মাথা নাড়লেন। ঠোঁটে ফুটে উঠল সরু হাসি। ওই জিনিস যখন তখন দেখা যায় না। টেবিলে ফেললেন গোল করা ভাউচার। চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে আরেকবার মাথা নেড়ে বললেন, 'তা হলে ট্র্যাভেল এক্সপেন্সেস? ...তারপর গত সপ্তাহে এনে জেলে ভরলে ওই কার্টেলকে, ঠিক? এমিলিও আলভারেজ এবার আর পালাতে পারল না।'

মাথা দোলাল টম জেরাল্ড। চোখে পড়ল, আরেকটা এনভয়েস হাতে তুলে নিয়েছেন করেলি। 'এখানে দেখা যাচ্ছে, ছয় সপ্তাহ ধরে তোমার ইনফর্মারদের অ্যালটমেন্টের পুরো টাকা দিয়েছ। ওই কেস নিয়ে কয় সপ্তাহ ধরে কাজ করছিলে?'

'ছয় মাস, স্যর।'

'তার মানে, গত মাসে ইনফর্মারদের টাকা খাইয়ে খুঁজে বের করেছ কার্টেলের আস্তানা?'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল টম, 'নিশ্চিত হওয়ার পর টাকা দিতেই হলো ওদেরকে।'

কর্কশ হাসলেন ফ্র্যাঙ্ক করেলি। 'বুঝতে পেরেছি।' দরজা দেখিয়ে দিলেন। 'বাইরে ওটা থিয়েটার, টম। আমিও ওখানে

কাজ করেছি। আমাদের ছেলেরা জানে, কী করেছ তুমি। কিন্তু আমি চাই না অন্যরাও তোমাকে অনুসরণ করুক। ...মস্ত ঝুঁকি নিয়ে পার পেয়েছ, কারণ শহরে তোমার কন্ট্যাক্ট ভাল। কিন্তু ওয়াচারদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতে জানে না অনেকে। ওই আর্ট আজকাল ভুলতে বসেছে সবাই। তুমি ভোলোনি বলে জিতে গেলে। কিন্তু অন্যদের উচিত হবে না চেষ্টা করা।' ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবলেন তিনি। 'কেউ না কেউ চেষ্টা করবে। খরচ করবে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা, কিন্তু বাড়ি ফিরবে খালি হাতে। ফলে আগুন দিয়ে পাছা জ্বেলে দেয়া হবে তার। আর খারাপ দিক হচ্ছে, ওই কাজ করতে হবে আমাকে। কোনওভাবেই তাকে রক্ষা করতে পারব না।'

নীরব হয়ে গেলেন করেলি।

চুপ করে আছে টম জেরাল্ড।

'তুমি বোধহয় জানো না, উঁচু পর্যায় থেকে ধমক দেয়া হয়েছে ওই এমিলিও আলভারেজের কেসে,' বললেন করেলি।

'ও তো প্রমাণসহ ধরা পড়েছে, তারপরেও আবার কী,' ভুরু কোঁচকাল টম জেরাল্ড।

'কারণ ওর ওপর চোখ রেখেছিল ডিইএ,' বললেন ফ্র্যাঙ্ক করেলি। 'ব্যাপারটা জুরিসডিকশনাল ডিসপিউট বলতে পারো।'

'আদালত অনেক আগেই অপরাধী বলে ওকে ঘোষণা দিয়েছে, বস।'

'আর তখনই আমাদের এফবিআই-এর চোখ পড়ল ওর ওপর,' বললেন করেলি, 'ঠোকাঠুকি লেগে গেছে ইন্টেলিজেন্স আর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাঝে। তোমার কাজ ছিল আমেরিকায় গোপনে কেউ হেরোইন পাচার করছে কি না, তা খুঁজে দেখা। কিন্তু ধরে ফেললে এমিলিও আলভারেজকে। যদি প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত রিপোর্ট দিতে, আগেই ওই কাজ থেকে তোমাকে সরিয়ে

নিতাম। এখন এফবিআই দাবি করছে, আলভারেজের আইনী দিক ঠিক ভাবে দেখা হয়নি। তুমি পেটের সব খবর বের করেছ। ওই ব্যাটা এখন বলছেঃ তুমি পড়ে শোনাওনি আইনে ওর কী অধিকার আছে।' চুপ হয়ে গেলেন করেলি, একটু পর বললেন, 'এফবিআই বলছে, ওরাই ওকে ধরত, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে এসে চিলের মত আলভারেজকে ছিনতাই করে উধাও হয়েছ তুমি। এ জন্য সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করছে ওরা।'

সংক্ষিপ্ত পায়চারি শুরু করেছে টম জেরাল্ড। একবার স্পর্শ করল কালচে নেমপ্লেট। ওখানে সোনারঙে লেখাঃ মার্শাল ফ্র্যাঙ্ক করেলি।

'বস্, আসলে নতুন করে আলভারেজকে আইনী প্রক্রিয়ায় আনতে হবে– তা কেন? প্রমাণিত অপরাধী সে। ফেডারাল কয়েকটা অপরাধে দোষী। যদি লোমপোক থেকে পালিয়ে না যেত, অন্তত আরও পঞ্চাশটা বছর থাকত জেলে। হয়তো শেষে পেত প্যারোল। তাই হবে এক সময়। আমি শুধু তাকে ফেরত দিয়ে আসব ওখানে। ...ব্যস্ততার কারণে বুঝতে পারিনি আইনী অধিকার পড়ে শোনাতে হবে ওকে। কিন্তু ওর সব আমেরিকান বন্ধুর নাম এখন আমাদের কাছে। ধরার সময় ওই আইনী অধিকার ওদেরকে আচ্ছা মত শুনিয়ে দেব। ওদের আত্মা কেঁপে যাবে আমরা পিছু নিলে, বস্।'

ভুরু কুঁচকে টমকে দেখলেন মার্শাল করেলি। 'কিন্তু তুমি যে আলভারেজকে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি রুম ঘুরিয়ে নিয়ে এলে, তার...'

কাঁধ ঝাঁকাল টম। 'গ্রেফতার এড়াতে চেয়েছে, বস, সহজ ব্যাপার।'

'আচ্ছা?' ভুরু আরও কুঁচকে গেল করেলির।

ভীষণ গম্ভীর চেহারা করল টম। বস্ শুনে ফেলেছেন,

বদমাসটাকে বেদম পিট্টি দিয়েছে ও!

'জেরাল্ড, এফবিআই-এর ঝামেলা আমি দেখব। জানিয়ে দেব ইনভেস্টিগেশনের বিষয়ে আর্টিকেল ৩১ দেখে নিতে। পছন্দ হবে না ওদের। কিন্তু সহ্য করবে পাছার জ্বলুনি। যদি আরও ঝামেলা করতে চায়, চুমু দিতে হবে আমার ফুটকি ভরা লালচে পাছায়।' সামনের কাগজ তুলে নিলেন তিনি। 'ঠিক আছে, তোমার জন্যে অন্য অ্যাসাইনমেন্ট আছে। দেরি না করে নামবে ওই কাজে।'

চুপ করে আছে টম জেরাল্ড।

'বিষয়টা হচ্ছে,' ফাইল খুললেন করেলি, 'আলাস্কায় মিলিটারি দুর্ঘটনা হয়েছে। ওখানে...'

'আর্মি?' বিস্ময় লুকাতে পারল না টম, 'ওদের তো নিজেদের মার্শাল আছে। আমাদেরকে দরকার কেন?'

'আগে শোনো,' ধৈর্যের সঙ্গে বললেন করেলি। অন্য ডেপুটি মার্শাল হলে সুযোগ দিতেন না, ধমক দিয়ে ছাড়িয়ে দিতেন ভূত। 'একটু বেশি ক্লাসিফায়েড কয়েকটা রিসার্চ স্টেশনে দেখা দিয়েছে নানান ঝামেলা। লাশ হয়ে গেছে একদল লোক। তাদের ভেতর বিজ্ঞানী আর সৈনিকরা ছিল। আমি চাই তুমি ওদিকে নজর দাও।'

'আমি কেন, বস? বা আমাদেরকে চাইছে কেন ওরা?'

জবাব দিলেন না ইউএস মার্শাল। চেয়ার ছেড়ে চলে গেলেন জানালার কাছে। বহু দূরে চোখ। ফ্যাসিলিটির শেষে বেল্টওয়েতে মন্থর গতিতে চলেছে জ্যামে পড়া গাড়ি।

'কারণ, কংগ্রেসে আমাদের বন্ধুরা অদ্ভুত কিছু তথ্য পেয়েছে। ওসব স্টেশন অফ্ দ্য বুক বায়োলজিকাল ওঅর রিসার্চের চর্চা করছিল। জুরিসডিকশন অনুযায়ী এসব দেখার কথা নয় আমাদের বা এফবিআই-এর। কিন্তু ক্যাপিটল হিল চাইছে আমরা ওদিকে নজর দিই।'

'আপনি চাইছেন আমি যেন ওই কাজ নিই?'

'হ্যাঁ।'

ফ্র্যাঙ্ক করেলি ওকে বিপদে ঠেলে দেবেন না, কিন্তু কেন যেন অস্বস্তি বোধ করল টম জেরাল্ড। জানতে চাইল, 'আমি আসলে কী তদন্ত করব, বস? কিছুই জানি না বায়োলজিকাল ওঅরফেয়ার সম্পর্কে। ঠাণ্ডার ভাইরাস আর ইবোলার তফাৎও বুঝব না। এক শ' বছর চেষ্টা করেও তো...'

'তোমার অ্যাসাইনমেন্ট ওয়াশিংটনে,' বললেন করেলি।

বিস্ময় চাপতে পারল না টম। 'ওয়াশিংটন?'

নিজের হাতের দিকে চেয়ে আছেন বস।

জানতে চাইল ও, 'আসলে কী হয়েছে, বস?'

চুপ করে কী যেন ভাবছেন গলা-ছেলা শকুন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'টম, সরকারের টাকা বেআইনীভাবে খরচ করে বায়োলজিকাল ওয়েপন্স তৈরি করা মানেই, গোপনে উচ্চপদস্থ লোক সরাসরি জড়িত এসবে। প্রেসিডেন্টের উনিশ শ' বাহাত্তর সালের ইউনাইটেড নেশন্স এগ্রিমেন্ট ভঙ্গ করছে তারা। হয়তো তৈরি হচ্ছে এমন কোনও ভাইরাস, যেটা শেষ করে দেবে গোটা পৃথিবীকে।' সামান্য বিরতি নিয়ে বললেন তিনি, 'তার ফল কী হতে পারে, তুমি ভাল করেই জানো, টম।'

শিরশির করে উঠল জেরাল্ডের মেরুদণ্ড। 'বুঝতে পেরেছি, স্যর। আপনি চাইছেন পেন্টাগন, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি বা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স বেআইনী কোনও অপারেশনে জড়িত কি না, তা যেন দেখি। প্রেসিডেনশিয়াল ডিরেকটিভের বাইরে কিছু দেখলে যোগাযোগ করব।'

মাথা দোলালেন করেলি।

কী যেন ভাবল টম, তারপর বলল, 'যা বুঝলাম, এ কাজ করতে চাইলে নিয়মের বাইরে যেতে হবে। অনেক বাইরে। আর

সেজন্য লাগবে প্রচুর ফাণ্ড। চাই নিজের লোকবল। নিজেই বাছাই করব তাদের। প্রয়োজনে যেতে হবে নানাদিকে। আমাকে বা আমার লোককে যেন কোনও ভাবেই বাধা না দেয়া হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। লাগবে নিজের চেক ভাউচার।' একটু পর বলল টম, 'এ ছাড়া, প্রতিটি ডিস্ট্রিক্টে হুঁশিয়ার করতে হবে ডেপুটি মার্শালদেরকে। যে-কোনও অনুরোধ এলে যেন অন্য কাজ রেখে সেদিকে নজর দেয়। আর, স্যর, এ ধরনের অধিকার আমাকে দিলে, লাগবে তার লিখিত প্রমাণ।'

টম থেমে যাওয়ার পর ঘরে নামল নীরবতা।

একটু পর বললেন কেরিল, 'তুমি কখনও আমাকে ডুবিয়ে দাওনি, জেরাল্ড। কিন্তু অনুমতি দেয়ার আগে আরেকবার দেখা করব চিফের সঙ্গে।'

'তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই, স্যর,' হাসল টম। 'বড় কথা বেঁচে থাকা।' বেরিয়ে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে ঘুরল। কিন্তু পিছন থেকে এল ডাক।

'এক মিনিট, টম।'

ঘুরে চাইল টম জেরাল্ড।

'জিজ্ঞেস করলে না, কেন তোমাকে দেব এই অ্যাসাইনমেন্ট?' প্রিয় স্যাঙাতের চোখে চোখ রাখলেন কেরিল। 'কারণটা সহজ: পুলিশ হওয়ার মত বহু লোক আছে এই ডিপার্টমেন্টে, কিন্তু সত্যিকারের ক্রিমিনাল হওয়ার মত যোগ্যতা রয়েছে শুধু তোমার।'

বারো

হঠাৎ চোখের কোণে নড়াচড়া দেখে ক্ষিপ্র প্যান্থারের মত ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, ধক্ করে উঠেছে হৃৎপিণ্ড।

চট্ করে গাঢ় ছায়ায় সরে গেছে কী যেন!

দেখতে প্রায় মানুষের মতই, যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছিল ওদেরকে।

এক সেকেণ্ড আগে ছিল, পরক্ষণে নেই!

আধ মাইল দূরের শৈলশিরার উপরের জঙ্গলে অভাব নেই ঝোপঝাড়, বড় গাছ ও ছায়ার। বোধহয় ভুল করেনি রানার চোখ, বিদ্যুদ্বেগে উধাও হয়েছে কেউ।

রানা টের পেল, পিছনে এসে হাঁটুতে দু'হাত রেখে দাঁড়িয়েছে ক্লান্ত জিনা। কিছুই বোধহয় খেয়াল করেনি।

ওকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইল না বলেই চুপ থাকল রানা।

'ওটা আসলে কী?' বাতাসে জলকণা মাত্রাতিরিক্ত, দরদর করে ঘামছে জিনা।

আরও কয়েক মুহূর্ত ওদিকে চেয়ে রইল রানা, তারপর আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'জানি না। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও। বেশি করে পানি খাও।'

রানা ঘন ঝোপের ভিতর দিয়ে রওনা হতেই প্রকাণ্ড রাইফেল তুলে পিছু নিল জিনা।

ভুল দেখেনি, পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা।

ওটা সিধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণী ওভাবে

দাঁড়ায় না। অথচ ওটা মানুষ হতে পারে না। স্টিলের কবজা থেকে ছিঁড়ে ফেলেছিল ধাতব দরজা। উপড়ে নিয়েছিল মানুষের ঘাড় থেকে মাথা। নিজের বিস্ময় নিজের কাছেই রাখল রানা।

সামান্য টলতে টলতে পৌঁছে গেছেন ডক্টর সিরাজউদ্দীন। সঙ্গে তানামুরা এবং অন্যরা। নিজেকে সামলে রাখতে চাইছেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী।

রানার পথচলার গতি দেখে চমকে গেছে তানামুরা।

প্রায় বিকেল এখন, একবারেরও জন্যও থামেনি রানা।

আসলে নিজেকে একবারও অতিক্রান্ত মনে হয়নি ওর। আর্মিতে থাকতে কমাণ্ডো ট্রেনিঙের সময় ভাল মত শিখে নিয়েছে, কীভাবে জঙ্গলে বা পাহাড়ে টিকে থাকতে হবে। বুনো জন্তুর মতই নীরবে পেরোতে পারবে মাইলের পর মাইল। দিনের পর দিন ঘুম ছাড়াও চলবে ওর। দরকার পড়লে প্রতিদিন হাঁটবে এক শ' মাইল পথ। কিন্তু অন্যদের কাছ থেকে ওই কষ্ট-সহিষ্ণুতা আশা করছে না রানা। হাঁটতে হাঁটতে ঠিক করল, দরকার পড়লে কমাবে চলার গতি।

হাঁটতে হাঁটতে একটু ঝুঁকে গেছে তানামুরা, দেখে মনে হচ্ছে মাটিতে খুঁজছে ট্র্যাক।

মৃদু হাসল রানা, ধীরে ধীরে ট্র্যাক করা শিখছে জাপানি যোদ্ধা। আবারও দূরের ওই শৈলশিরার দিকে চাইল।

'সামনে কোথাও আছে, তাই না?' জানতে চাইল তানামুরা।

'মনে হয়,' বলল রানা। জরুরি তথ্য গোপন করবে না, ঠিক করেছে। কিন্তু পুরো নিশ্চিত না হয়ে মন্তব্যও করবে না। ওর কথা ভুল হলে তার ফলাফল মারাত্মক হতে পারে। মস্ত বিপদে পড়তে পারে দলের সবাই।

'হাই, এটা ভাল যে সামনে পাব তাকে,' বড় করে দম নিল তানামুরা। মাটিতে রাইফেলের বাঁট ঠেকিয়ে ভর দিয়েছে নলের

ডগায়।

লোকটার কালো চোখে চোখ পড়ল রানার।

জাপানি যোদ্ধা জানে না, রহস্যময় এই অপারেশনের মূল উদ্দেশ্য কী, বা কী চায় সিআইএ বা আর্মি; সে শুধু জানে: দায়িত্ব নিয়েছে, কাজেই শেষ করবে কর্তব্য। বিরতি নেবে না, দরকার পড়লে মরবে বিনা দ্বিধায়।

রানা ভাবল, এরা জানে না রিসার্চ স্টেশনে দানবের নখ পেয়েছে ও। সবার উপর থেকে ঘুরে এল ওর চোখ। অন্তরে বুঝল, ডক্টর সিরাজউদ্দীন ছাড়া অন্তত একজনকে বিশ্বাস করতে পারবে।

সে তানামুরা।

ধুপ্ করে তুষারে বসল হতক্লান্ত টড ওয়েইলার, মাথা তুলে দূরের শৈলশিরার উপর দেখল রানাকে। নড়ছে না বাঙালি লোকটা। নিচু স্বরে কী যেন বলছে জিনা উইলসন আর কং তানামুরাকে। রানার পায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওর সেই মস্ত নেকড়ে, বাদুড় যেমন আকাশে কান খাড়া করে, সেভাবে তাক করেছে কান।

একপাশে বসে পড়েছেন বৃদ্ধ প্রফেসর। মুখ থেকে ঝেড়ে ফেলছেন বিন্দু-বিন্দু ঘাম।

দলের আরেকজন বাড রলিন্স টড ওয়েইলারের পাশে বসে পড়ল এম-২০৩ হাতে। অস্ত্রটা তাক করেছে বজ্রপাতে পড়া এক গাছের দিকে। বাড রলিন্স ছোটখাটো আকৃতির লোক, কিন্তু ছয় বছর স্পেশাল ফোর্সে কাজ করে হয়ে উঠেছে সেতারের টেনে বাঁধা তারের মত।

ঘাড়ের পিছন থেকে ঘাম ঝাড়ল টড। 'ওই লোক ক্লান্ত হতে শেখেনি,' বিড়বিড় করে বলল। রানাকে একবার দেখে নিল। 'ডেল্টা ফোর্সের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত

একটানা এত মাইল হাঁটিনি। সেটা ছিল সারাদিনে পঞ্চাশ মাইল পেরিয়ে যাওয়া।' মাথা নাড়ল সে। 'ওই লোক আগামী এক সপ্তাহ এভাবে হাঁটালে এক সময় আমার উচ্চতা নেমে আসবে এক ইঞ্চিতে।'

হাসল বাড রলিন্স। শৈলশিরায় দেখল রানা ও হান্টারকে। 'আসলেই। আর তার ওই কুকুরটাও দেখার মত।'

'ওটা কুকুর না, গাধা। নেকড়ে।'

'জানি ওটা কী।' কাঁধ ঝাঁকাল বাড। 'জীবনে এত বড় নেকড়ে দেখিনি। ভীষণ হিংসুটে। বাধ্য না হলে ওটার ধারে-কাছে যাব না। কে জানে, সুযোগ পেলে কী করে বসবে!'

সূর্য এড়াতে পোড়া মুখ সরাল টড। 'আগামী তিন ঘণ্টার ভেতর ক্যাম্প করতে হবে। নইলে রোদ পাব না। পাহাড়ে চট্ করে হারিয়ে যায় দিনের আলো। আগেও এসব জায়গায় এসেছি।'

'তাই?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল বাড। 'কবে এসেছিলে?'

'দশ সালের দিকে,' পাশে থুতু ফেলল ওয়েইলার। 'নর্থ রিজে রেকন ইউনিটে ছিলাম। কেন আনা হয়েছিল, জানি না। বোধহয় খুঁজে বের করতে চেয়েছিল একটা গুহা। বরফে কমপ্লিট জমে গিয়েছিল পাছাটা, কিছুই পাইনি আমরা।'

'আবারও সুযোগ পেয়েছ পাছা ঠাণ্ডা করার,' শুকনো স্বরে বলল বাড রলিন্স। উঠে রওনা হয়ে গেছে। রানা শৈলশিরা থেকে নেমে চলেছে নীচের উপত্যকার দিকে। 'তবে আমার মনে হয়, এবারও খামোকা এসেছ। একটা গুলিও করতে পারবে না কারও দিকে।'

ঘোঁৎ করে উঠল টড ওয়েইলার। 'তুমি একটা গাধা, বাড। আসল খবর শোনোইনি!' টিলা দেখাল সে। 'তুমি না স্পেশাল ফোর্সের লোক ছিলে? তাও বুঝলে না? সামনের ওই লোক

আসলে পৃথিবীর সেরা ট্র্যাকার। ওই শালার তুলনা হয় না। আর কঠিন কিছুর পিছু নিয়েছে ও।' উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধে শটগান ঝুলিয়ে নিল ওয়েইলার। 'আর্মিতে ওর সমান একটা ট্র্যাকারও নেই। ওরা কেউ একদিনে পঞ্চাশ মাইল ট্র্যাক করতে পারবে না। কিছুই এড়াচ্ছে না মাসুদ রানার চোখ।' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'ওটা যা-ই হোক, ঠিকই কোণঠাসা হবে এর কাছে।'

বাডকে আরেকবার দেখে নিয়ে হাঁটতে লাগল টড। নির্বিকার সুরে বলল, 'তার আগে গুলি রেখো অস্ত্রের চেম্বারে।'

জিনার পাশে গভীর মনোযোগ দিয়ে মাটি দেখছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর খুব নিচু স্বরে বলল, প্রায় শোনাই গেল না কণ্ঠ।

জিনা বুঝল, ঝর্নার কুলুকুলু আওয়াজকে ব্যবহার করে চারপাশের অন্য আওয়াজের সঙ্গে কথা মিশিয়ে দিচ্ছে রানা।

'সকালে খুশি মনে রওনা হয়েছে ওরা,' ফিসফিস করে বলেছে রানা। 'কিন্তু দিন শেষে হয়ে উঠেছে একদল বাফেলোর মত।' বিরতি নিয়ে বলল, 'এমনই হয়। আরামে থাকলে অসতর্ক হয়ে ওঠে সবাই। ধরো, নিরানব্বুইবার ঝর্না পেরিয়েও সাপ দেখলে না। আর এক শ'বারের বার ধরেই নিলে, কোনও বিপদ হবে না। কিন্তু শেষবারে থাকল সাপ। ওটা যখন হামলা করল, রক্ষা করবে কে তোমাকে? মানুষের অভ্যেস এমনই হয়। বেমক্কা মারা পড়ে।'

একবার ঘুরে পিছনের সবাইকে দেখল জিনা।

তাদের দিক থেকে কোনও আওয়াজ পেল না।

ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা, কুলকুল আওয়াজে বইছে ঝর্না। জিনার মনে হলো, নীরবে আসছে পিছনের ওরা। তৈরি করেছে লম্বা লাইন। সামনের জন থেকে দশ ফুট পিছনে দ্বিতীয়জন।

মাসুদ রানা কী কারণে সতর্ক, বুঝল না জিনা। পাশাপাশি চলেছে ওরা।

নীরবে সামনের জমি দেখছে রানা।

ঝর্নার শক্ত পাড়ে একটা পায়ের ছাপ। আর নেই। যেন ওখানে এসেই দুনিয়া থেকে উধাও হয়েছে জানোয়ারটা।

মাথা সামান্য নাড়ল রানা। চাপা স্বরে বলল, 'হান্টার।'

কোনও শব্দ না করে দ্রুতপায়ে সামনে বাড়ল মস্ত নেকড়ে। নিচু করে নিয়েছে মাথা।

ওটার হিংস্রভাব দেখে অজান্তেই শক্ত হাতে রাইফেল ধরল জিনা। নেকড়ের কালো চোখে রাগের কোনও চিহ্ন নেই।

ট্র্যাক দেখাল রানা। বাংলায় বলল, 'সার্চ, হান্টার।'

ঝর্নার বাঁকে হারিয়ে গেল নেকড়ে।

সামনে ও দু'পাশে কালচে ঘন অরণ্য।

রানার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে জিনা।

গম্ভীর চোখে জানোয়ারটার পায়ের ছাপ দেখছে রানা। ওকে দেখাচ্ছে জঙ্গলের কোনও বাদামি দেবতার মত।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল জিনা, তারপর জানতে চাইল, 'আপনি আসলে কী কারণে এত চিন্তিত?'

কিছুক্ষণ পর বলল রানা, 'একটা ব্যাপার স্পষ্ট নয়।'

'সেটা কী?'

'খেয়াল করো ট্র্যাকের প্রেশার রিলিজ,' সামনের ডানদিক দেখল রানা। 'ওটা ডানদিকে গেছে। কিন্তু আসলে ওদিকে কোনও চিহ্ন নেই। আছে শুধু ওই চিহ্ন।'

ওদের ডানদিকে শৈলশিরা। খাড়া উঠে গেছে এক শ' পঞ্চাশ ফুট উপরে। ওদিকে কোনও পথ নেই। কোনও ছাপও নেই জানোয়ারটার। কাজেই অযথা কারণও নেই, শৈলশিরায় উঠেছে।

ফিসফিস করে বলল জিনা, 'রানা, খেয়াল করেছেন, সারাদিন ঝর্না থেকে সরেনি ওটা?'

'সেটাই ভাবিয়ে তুলছে আমাকে,' বলল রানা।

'এ থেকে কী বুঝব?'

'ওটার মত বড় আকারের জন্তু দিনের আলোয় ঝর্নার পাশ দিয়ে চলবে না,' বলল রানা। ঝর্নার স্রোতের আওয়াজকে ব্যবহার করে আড়াল করছে নিজের কণ্ঠ।

ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হলো না জিনার। কলধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছে রানা নিজ কণ্ঠ। কাজটা করছে এতই নিখুঁত ভাবে, অবাক হতে হয়। প্রকৃতির আর সব আওয়াজে হারিয়ে যাচ্ছে গলার আওয়াজ। যেন নিজেও জঙ্গলেরই একটা অংশ রানা।

'বড় প্রাণী ভোরে ঝর্না থেকে মিটিয়ে নেবে তৃষ্ণা,' বলল বিসিআই এজেন্ট। 'আবার রাতেও। ঘড়ির কাঁটার মত চলে এসব। দিনে ভুলেও ঝর্নার আশপাশে ভিড়বে না। শিকার করবে সারাদিন ধরে।'

'কিন্তু ওই জন্তু একবারও কিছু খায়নি,' রানার মত করেই গলা নিচু করল জিনা। কণ্ঠ মিশিয়ে দিয়েছে ঝর্নার আওয়াজের সঙ্গে। 'খুব দ্রুত চলেছে ওটা।'

'হুঁ,' সায় দিল রানা, 'সে কারণেও অবাক হয়েছি। বড় প্রাণী এসব করবে না। বড়জোর তিন বা পাঁচ মাইল সরবে প্রতি ঘণ্টায়। কিন্তু এই জানোয়ার মাইলের পর মাইল চলেছে কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে। এর কোনও ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই।'

রানার কানের কাছে মুখ নিল জিনা। 'রানা, আমি বোধহয় এর কারণ বুঝেছি। যে কারণে সারাদিন ঝর্নার পাশে ছুটছে ওটা।'

'ঠিক মানুষের মত?' বলল রানা।

'হ্যাঁ। মানুষের মতই।' মাথা দোলাল জিনা। 'মনে হয় না হঠাৎ পাল্টে নেবে অভ্যেস। ওটা এমন কোনও জানোয়ার, যেটা আসলে মানুষ নয়, কিন্তু প্রায় তেমনই। আগের মতই ছুটবে

ঝর্নার কিনারা ধরে।'

শৈলশিরার দিকে চাইল রানা। ওর চোখ ইঞ্চি ইঞ্চি করে তল্লাশী করছে শৈলশিরা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'না, অন্য কিছু করবে সে!'

শৈলশিরার দিকে চেয়ে আছে।

'কী সেটা?' বলল জিনা। 'এক শ' গজ সরে ক্রস-ট্রেইল করব? আমি সতর্ক থাকব, নষ্ট করব না কোনও ট্র্যাক।'

চুপ করে আছে রানা।

অপেক্ষা করল জিনা।

কিছুক্ষণ পর এবড়োখেবড়ো শৈলশিরা দেখে নিয়ে বলল রানা, 'আপাতত তা-ই করো। চারপাশ দেখবে, তবে ওই এক শ' গজের বাইরে চলে যেয়ো না।'

'ঠিক আছে,' এক পাথর থেকে আরেক পাথরে পা রেখে সরে যেতে লাগল জিনা। চলেছে ঝর্নার ভাটির দিকে।

কিছুক্ষণ পর শৈলশিরা দেখা শেষ হলো রানার। ওপরে আছে চাপড়া পাথর ও ছোট সব গুহা। চাইলে বিশ মিনিটে চূড়ায় উঠে যেতে পারবে দক্ষ পর্বতারোহী।

সামনে বেড়ে পাথরের একটা স্ল্যাবে উঠল রানা, খুঁজে নিল অসমান্তরাল এবড়োখেবড়ো পথ। বার-বার পা রেখে দেখে নিচ্ছে ওজন নিতে পারবে কি না নীচের পাথর।

উঠছে নিঃশব্দে। জঙ্গল বা পাহাড়ে নীরবে চলতে চাইলে প্রথমে ব্যবহার করতে হবে গোড়ালি, তারপর সাবধানে রাখতে হবে পায়ের পাতা। প্রতিবার হতে হবে সাবধান, নইলে তৈরি হবে আওয়াজ। এড়িয়ে যেতে হবে কোনও পাথর, শুকনো ডাল বা পাতা।

বেয়ে উঠতে শুরু করে উপরের ধূসর ধুলো লক্ষ করছে রানা। বিশ মিনিট পর ওর সতর্ক চোখে ধরা পড়ল, পাথরে গভীর

পায়ের ছাপ।

ঘুরে নীচের ঝর্না দেখল রানা। মাথা নাড়ল আনমনে। চমকে গেছে জানোয়ারটার লাফিয়ে উঠবার ক্ষমতা দেখে। অন্তত তিরিশ ফুট উঠেছে ওটা। বাঘের সাধ্যি নেই এক লাফে এই দূরত্ব পেরোয়।

ভুল ধারণা করেনি রানা। উপরের পাথরে আরও ছাপ আছে। ওগুলো প্রমাণ করছে জন্তুটার প্রচণ্ড শক্তি। অসংখ্য চিহ্ন দেখল রানা। বেশিরভাগ ট্র্যাকার ওসব বুঝবেই না। ও ঠিকই বুঝে গেল, কেন কোনও ছাপ নেই ঝর্নার আশপাশে।

খাড়া টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করে চূড়ায় গিয়ে থামল রানা। নীচে চেয়ে দেখল। দলের শুরুতে কং তানামুরা, এখনও অনেকটা দূরে।

হাতের ইশারা করে তাদের গতি বাড়াতে বলল রানা।

ঝর্নার আরেক দিকে পৌঁছে গেছে জিনা।

হাত নেড়ে ওকে আসতে বলল রানা। শৈলশিরার গোড়ায় সবাই জড় হওয়ার পর নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল উপরে উঠতে।

তেরো

পাহাড়ের চূড়ায় সাদা নরকঙ্কালের করোটির মত ঝুলছে গোল, ফ্যাকাসে চাঁদ। ওই ম্লান আলোয় রক্তিম চোখে হাত-পা দেখল সে। তাকে দেখাচ্ছে প্রাচীন আমলের আদিম মানুষের মত। এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে চলেছে যেন ভয়ানক এক প্রেতাত্মা।

আজকের মত ঘুম শেষ তার। নতুন করে পাল্টে গেছে আবারও, নেই সেই আগের মানুষ। এখন ঢের শক্তিশালী, সত্যিকারের কঠিন পাথরের মত হয়ে উঠেছে কাঁধ-বুক-পেট-উরু-হাত-পায়ের মাংসপেশি। আঙুলের ডগা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে করাতের মত ধারালো, কুচকুচে কালো নখ। সবই এখন তার পুরুষালী, এবং ম্যাগনাম সাইয।

হ্যাঁ, সবাইকে খতম করবে রাতে!

জানা ছিল, রিসার্চ স্টেশনগুলোয় হামলা করেছে বলে পিছু নেবে তারা। শেষ করতে চাইবে ওকে।

সেজন্য মরতে হবে উল্টে তাদেরকেই।

কিন্তু এখন না।

এমন জায়গায় কোণঠাসা করবে, যেখানে সাহায্য পাওয়া যাবে না হেলিকপ্টারের। রাস্তা থাকবে না পালাবার।

বড়জোর আর একদিন, বা দু'দিন, তারপর খতম করবে তাদেরকে!

আজ ভোর থেকে চোখে চোখে রেখেছে।

বিশেষ করে ওই মোকাসিন পরা লোকটা!

সঙ্গে আবার নেকড়ে রাখে! ইহ্!

তবে ওদের পদক্ষেপ খুব নিশ্চিত।

মানুষের মনে ভয় বলতে যা থাকে, তেমন কিছু ওর নিজের বুকে নেই। কিন্তু বুঝতে পারছে, একটা সময় ওই লোক আর নেকড়েটাকে এড়াতে পারবে না।

নিজে বিপদে পড়ার আগেই খতম করতে হবে লোকটাকে।

অন্যরা কিছুই না।

আরাম করে একটা একটা করে শেষ করবে। দিন-রাত তাড়া করে পাগল করে দেবে। বড়জোর পালাতে পারবে দু'একজন। সেসব পরের কথা, আগে খতম করতে হবে রেডিয়ো হাতে

লোকটাকে। যাতে যোগাযোগ করতে না পারে কারও সঙ্গে।

রাগে দাঁত খিঁচিয়ে ঘড়-ঘড় গর্জন ছাড়ল সে।

বাঁচতে দেয়া যাবে না ওই মোকাসিনকে।

হ্যাঁ, খুবই বিপজ্জনক! আসল শয়তান।

পাল্টা হামলা করতে পারে।

আদিম আমলে ওই লোকের মত কেউ কেউ ছিল, ব্যথা দিত তারা।

ওই লোকও হঠাৎ হামলা করবে। যে কাউকে মেরে ফেলবে।

অন্যরা সবাই সাধারণ শিকার।

সংখ্যায় তারা বেশি, কিন্তু ওর আছে আত্মবিশ্বাস, গতি আর শক্তি। বুদ্ধিও বেশি। পাত্তা দেবে না কোনও ব্যথা। সহ্য করবে বৃষ্টির মত ছিটিয়ে পড়া বুলেট আর বিস্ফোরণের আপত্তিকর কষ্ট।

নতুন এই দেহ ভাল করে বুঝতে পারছে না সে। কিন্তু এটুকু বুঝে গেছে, হঠাৎ কয়েক দিনে খুব শক্ত হয়ে গেছে দেহ। ওকে আর শেষ করতে পারবে না আধুনিক অস্ত্র। এখন শুধু দরকার বিশেষ ওই সিরাম। ওটা পেলেই হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ দেবতা, ওকে আর খুন করতে পারবে না কেউ।

এখন আর এই পৃথিবীতে ওর মত রাগ কারও নেই। কিন্তু সেজন্য কষ্ট বা দুঃখও নেই। আসলে বেঁচে থাকা আর খুন করা জরুরি।

তা-ই যথেষ্ট।

আর চাই ওই সিরাম।

যখন চোখের সামনে মরবে অন্যরা, তারপরও বাঁচবে সে হাজার বছর ধরে।

গভীর অরণ্যের কিনারায় ঘন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ে আছে শৈলশিরার নীচের ক্যাম্পের দিকে। ওখানে মিটমিট করে আগুন জ্বলছে।

খল-খল করে হাসল সে।
হ্যাঁ, জ্বালো, জ্বেলে রাখো আগুন।
আগেও তা-ই করত মানুষ।
আর তখনও তাদেরকে কচুকাটা করতাম এই দুই হাতে।
আবারও সময় আসবে।
অনেকে যোগ দেবে ওর দলে।
তখন ফুর্তি করে পাইকারি হারে মানুষ খুন করবে ওরা।

চোদ্দ

ক্যাম্পফায়ারের কমলা আগুনের আলো যেখানে পৌঁছাচ্ছে না, সেখানে থোক-থোক কালো অন্ধকার। চারপাশে ভুতুড়ে থমথমে নীরবতা।

হঠাৎ শটগানে দুটো বারো গেজ কার্তুজ পুরে আবারও ওগুলো ইজেক্ট করল টড ওয়েইলার। ওই শটগান তার হাতের বাড়তি অংশ যেন। আবারও ঝট্ করে শটগানে ভরে নিল কার্তুজ। দেহের চারপাশে রেখেছে কয়েকটা বন্দুক। কোমরে ঝুলছে নল-কাটা দোনলা শটগান। কোমরের আরেক দিকে বড় ক্যালিবারের রিভলভার। দলের অন্যদের চেয়ে বেশি সশস্ত্র সে। আকারেও অনেক বড়। সহজেই বহন করছে ভারী সব অস্ত্র ও গোলাগুলির ওজন।

পিঠে এম-১৬ টাইপের নল-কাটা শটগান, ওই অস্ত্রে ব্যবহার করবে ম্যাগাযিন ভরা বারো গেজ কার্তুজ। ঠিক এভাবেই .২২৩

কার্তুজের ম্যাগাযিন পাল্টে নেয় সৈনিকরা। এক কাঁধে ঝুলছে ব্যাণ্ডোলিয়ার ভরা শেল। অন্য কাঁধের বেল্টে অটোমেটিক শটগানের অসংখ্য ম্যাগাযিন।

রাতের মত শুয়ে পড়বার জন্য তৈরি হচ্ছে রানা, এমন সময় উঠে দাঁড়িয়ে ওর সামনে হাজির হলো টড ওয়েইলার। হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, 'এত কাঠি আর পাতা কীসের জন্যে? ভাবছ, ওগুলো তোমাকে রক্ষা করবে শীত থেকে?'

'সাধারণত তা-ই করে,' বলল রানা।

পেরিয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত। তারপর মুখ খুলল ওয়েইলার, 'জানো, রানা, তুমি আসলেই দক্ষ।' মনে হলো এ নিয়ে ভাবছে সে। 'সত্যিই দক্ষ। বোধহয় আমার দেখা সেরা ট্র্যাকার তুমি। কিন্তু তোমার মত লোক আমি পছন্দ করি না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আসলে তাতে কিছু যায় আসে?'

'আমার যায় আসে।'

নিখুঁতভাবে একটা বাকল ঠিক জায়গায় রাখল রানা। তারপর বলল, 'ব্যাপারটা এভাবে নাও, ওয়েইলার, ওরা যা বলছে, তুমি যদি সত্যি তেমন দক্ষ হও, বেশিক্ষণ সহ্য করতে হবে না আমাকে।'

আবারও নামল নীরবতা।

একটু পর ঘোঁৎ করে উঠল টড ওয়েইলার, 'ইরাক যুদ্ধে বা আফগানিস্তানে তোমার মত লোক দেখেছি। এক ট্র্যাকার। রহস্যময়। সে-ও ভারতীয়-আমেরিকান নাগরিক ছিল।'

'আমি ভারতীয় বা আমেরিকান নাগরিক নই। বাংলাদেশি।'

পাত্তা দিল না ওয়েইলার, 'প্রতি রাতে আত্মা ডেকে কথা বলত। সব আসলে বোগাস। সবাই পছন্দ করত ওকে। কিন্তু একদিন ওর আত্মা আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে ফেলল বেকায়দা এক অ্যাম্বুশে। গরুর মাংসের মত কিমা হয়ে গেল আমার সঙ্গীরা।

নিজেও মরল ওই শালা।'

'শুনে খারাপ লাগল, ওয়েইলার,' বাঁকা একটা বাকল ঠিক জায়গায় রাখল রানা। 'কিন্তু তোমার ভাবতে হবে না, আমি কারও আত্মা ডেকে এনে বোগাস কথা বলব না। নিশ্চিন্ত থাকো।'

চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল টড ওয়েইলার, তারপর নিচু স্বরে বিড়বিড় করে কী সব বলে চলে গেল তাঁবুর দিকে।

সার্জেন্টের পোড়া মুখ দেখে অভ্যস্ত রানা। ওই মুখের একপাশ সব সময়ের জন্য লালচে ও মসৃণ, কুঁচকে থাকে ভুরুর নীচে মৃত চোখ। অন্য চোখে সবার প্রতি হিংসা ও আক্রোশ। যেন হামলে পড়বে যে-কোনও সময়ে। লোকটার সঙ্গে একটু আগের কথা নিয়ে ভাবছে রানা। হঠাৎ টের পেল, অন্য কেউ আসছে ওর দিকে। ইচ্ছা করেই ঘুরে চাইল না। চিনে ফেলেছে পরিচিত নরম পদক্ষেপ।

রানা খেয়াল করেছে, এই গহীন এলাকায় আসবার পর থেকে ক্রমেই আরও অনুভূতি-সম্পন্ন হয়ে উঠছে। চট্ করে ধরে ফেলছে অস্পষ্ট সব ট্র্যাক। সেজন্য কোনও ম্যাগনিফায়িং গ্লাস লাগছে না। অন্যরা যখন বিনকিউলার ব্যবহার করে বুঝতে চাইছে দূরের ওই পাহাড় কেমন, তখন বিনা কষ্টে বহু দূর থেকে দেখছে গভীর সব খাদ, গুহা বা উপত্যকা। বুঝে গেছে, ওর ওস্তাদ ওই উতে ইণ্ডিয়ান চিফের কথাই ঠিক। তিনি বলেছিলেন, 'তুমি যত মন দেবে, রানা, দেখবে আরও অনেক অনেক বেশি। এটা তোমার অদ্ভুত গুণ। সবার থাকে না।'

আরও সতর্ক হয়ে উঠছে রানা।

এই গুণ থাকে অনেকের, আবার কারও একেবারেই থাকে না।

যেমন চোখের বাড়তি কাজ নেই ঘন জঙ্গলে, তাই কাজে আসবে না দৃষ্টি-ক্ষমতা। কিন্তু মস্ত অরণ্যে দূর-দৃষ্টি সত্যিই রক্ষা

করবে।

পিছনে আলতো পায়ের শব্দ পেয়ে রানা বুঝে গেছে, ওর দিকে আসছে জিনা উইলসন।

'এটা কী জিনিস?' নিচু স্বরে জানতে চাইল মেয়েটা।

'পাতার কুটির,' ঘুরে চাইল না রানা, 'এক উতে ইণ্ডিয়ান চিফ শিখিয়েছেন।'

'খুব ছোট মনে হচ্ছে।'

'একার জন্যে। তবে কাজ ঠিকই করবে।'

'কীভাবে কাজ করে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'পাতা আর ডাল দিয়ে তৈরি করতে হবে ছোট কুটির। বাইরে থাকবে কিছু বাকল। ওগুলো ঠেকাবে বৃষ্টি বা তুষার। আবার ভেতর দিক গরম রাখবে পাতা। বদ্ধ কুটিরে উষ্ণ থাকবে তুমি। তোমারই দেহের তাপ শুষে তোমাকে রক্ষা করবে পাতা। এদিকে জলকণা ভেতরে ঢুকতে দেবে না বাকল। প্রায় যে-কোনও পরিবেশে একইরকম কাজ করে।'

রাইফেল হাতে হাঁটু গেড়ে বসল জিনা। মনোযোগ দিয়ে দেখল রানার তৈরি কুটির। 'কিন্তু এটা তো মাত্র তিন দিক দিয়ে ঘেরা, আজ রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়বে।'

আঙুল তুলে আগুনের দিক দেখিয়ে দিল রানা। 'কয়েকটা পাথর গরম করে সেসব রাখব দরজার কাছে। রাতে আর ভাবতে হবে না।'

'এজন্যেই কোনও ইকুইপমেন্ট ছাড়াই ঘুরছেন?' নতুন আগ্রহ নিয়ে রানাকে দেখল জিনা। 'তার মানে প্রকৃতি থেকে যা পাবেন, তা দিয়েই চালিয়ে নেবেন আপদে বিপদে?' মিষ্টি হাসল। রানা কখনও দেখেনি ওর হাসি। এবারও দেখা হলো না। পিঠ দিয়ে রেখেছে জিনার দিকে।

কিন্তু ওই মিষ্টি হাসির আওয়াজ ছুঁয়ে গেল ওর মন।

'আপনি তা হলে এই যুগের টারজান?' আবারও হাসল জিনা।

মৃদু হাসল রানা। 'তুমি বললে আপত্তি তুলব না।'

রানার পাশে বসল জিনা। চুপ করে দেখছে কীভাবে তৈরি করে রানা কুটির। 'উতে ইণ্ডিয়ান চিফ বোধহয় ভাল ছাত্র পেয়ে খুশি হয়েছিলেন,' বলল একটু পর। 'জঙ্গলে আওয়ার কভার্ট ট্রেনিং নিয়েছি, ওরা মেয়ে যোদ্ধাদের সম্মান করে না, তা ছাড়া...' চুপ হয়ে গেল জিনা।

'কিন্তুটা কীসের?' জানতে চাইল রানা।

'সরকার চায় মেয়েরা পুতুলের মত থাকুক, লড়াই যেন না করে,' তিক্ত সুরে বলল জিনা।

'কিন্তু তুমি মানবে না ওদের কথা,' বলল রানা। 'তা খারাপ নয়।'

'আপনি তা-ই মনে করেন?' জানতে চাইল জিনা।

'নিশ্চয়ই,' বলল রানা। 'পুরুষ লড়তে পারলে মেয়েরা পারবে না কেন?'

দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরল জিনা। 'আর আমি ভেবেছিলাম আপনার মত লোক কখনও সম্মান দেবে না মহিলাদেরকে।'

নিজ কাজে ব্যস্ত রানা, মুখ তুলে চাইল না। 'এমন ভাবলে কেন?'

'জানি না,' স্বীকার করল জিনা। একটু পর বলল, 'ওরা ব্রিফিঙে বলেছে, আপনি পৃথিবীর সেরা কমাণ্ডো। জঙ্গল-পাহাড় বা সাগরে কেউ টিকে থাকলে, সেই লোক আপনি। মিটিং শেষে তখন ইন্টারনেট ঘাঁটলাম। মস্ত সব ব্যবসা আছে আপনার। রানা এজেন্সি বা শিপিং জাহাজের বহরের কথা বাদই দিই, আর্কিয়োলজিকাল আবিষ্কারও আপনার অবিশ্বাস্য। বাঙালি প্রফেসর সিরাজউদ্দীনের হয়ে খুঁজে বের করেছেন এমন সব রোগ

সারানোর গাছ, যেসব আপনাকে করে দিতে পারত হাজার কোটি টাকার মালিক। কিন্তু সেসব আবিষ্কার বিনা পয়সায় দিয়ে দিয়েছেন দরিদ্র মানুষের কল্যাণে। এরপর আর বেশি পড়তে যাইনি।' চুপ করে রানাকে দেখল জিনা। 'রানা, ওরা আমাদেরকে সবই বলেছে, কিন্তু কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। কেন ওই জন্তু এমন খেপে গেল? আর ওটা কী?' আরেকবার রানাকে দেখল জিনা। 'আপনি কি জানেন, ওটা কী আর কেন হামলা করছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বিশেষ কারণ না-ও থাকতে পারে। তবে তুমি ঠিকই ধরেছ। আমাদের বলা হয়নি, কেন ওটা হামলা করছে। কিন্তু আন্দাজ করতে পারি।'

'আন্দাজ করতে পারেন? তা কী?'

নীরব থাকল রানা। নিশ্চিত না হয়ে কোনও মন্তব্য করবে না।

ওর দিকে ঝুঁকে গেল জিনা। 'নিজের কথা ভাবুন, রানা। আমাদের কথা বাদ দিন। এই যে সামান্য এক ছোরা বা রাইফেল... এসবের মাধ্যমে টিকে থাকবেন ভাবছেন। হয়তো পারবেনও, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের লাগবে প্রতিটি সার্ভাইভাল ইকুইপমেন্ট।'

'যেমন তাঁবু?' জানতে চাইল রানা।

মাত্র আধ ঘণ্টায় তৈরি পাতা-বাকল ও ডালের কুটির দেখল জিনা। ওর মনে হলো, প্রচণ্ড ঝড়েও আস্ত থাকবে ওটা। ভিতরে কেউ শুয়ে থাকলে তাকে কষ্ট পেতে হবে না শীতে।

'বা ধরো যেসব খাবার বয়ে নিয়ে চলেছ,' বলল রানা। এক মুহূর্ত পর আঙুল তুলে দেখাল, 'দেখেছ ওই গাছ?'

'হ্যাঁ, দেখলাম।'

'ওটা সাদা ওক। অ্যাকর্ন দিয়ে ভরা। এমন কী মাটিতে পড়ে

আছে ওই ফল। খেলে পাবে দশ আউন্সের স্টেকের সমান প্রোটিন। খুব তেতো নয়, কাঁচা খাওয়া যায়। এবার ওদিকে দেখো...' আরেক দিক দেখাল রানা। 'ওগুলো পারস্লেন। বালবের মত শিকড় তুলে সেদ্ধ করলে ওগুলো হয়ে উঠবে সাধারণ আলুর মত। পাবে ভিটামিন বা মিনেরাল।' কাজের মাঝে কথা বলছে রানা, চোখ তুলে দেখছে না। 'চারপাশে ট্যামার‍্যাক গাছ। এক অংশ কেটে নাও, যে-কোনও ভেজিটেবলের মতই কাজ করবে। স্বাদ বরং বেশি। শক্ত দড়ির মত ব্যবহার করতে পারবে শেকড়। একটু দূরে দেখবে উইন্টারগ্রিন। ওটাও একটা উপকারী...

'হ্যাঁ, চিনি ওটা।'

মৃদু হাসল রানা কাজের মাঝে।

'প্রয়োজনে ওটার পাতা ব্যবহার করতে পারবে চা পাতার মত। ডাক্তার দেখাতে শহরে যেতে হবে না, জ্বর কমবে ওতেই। তা ছাড়া, আছে প্রচুর ভিটামিন। আর ওই গাছ থেকে চাইলে তেলও পাবে খাবারের জন্যে।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এভাবে বলা যায় অন্তত আরও এক শ' গাছের কথা। আসলে আমাদের চারপাশে গিজগিজ করছে মস্ত সব দোকান, ফার্মেসি। কোথাও কোনও অভাব নেই। প্রয়োজনীয় সবই পাওয়া যায়, কেবল তুলে নেয়ার অপেক্ষা। যদি পোশাক লাগে, যখন শহরে আছ কিনে নেবে দোকান থেকে, কিন্তু এখানে? যে-কোনও ট্রেইলে পেতে রাখো ফাঁদ। প্রতিদিন এক শ'র বেশি ট্রেইল পেরিয়ে আসি আমরা। চাইলেই ববক্যাট থেকে শুরু করে বিভার পর্যন্ত যা খুশি ধরে চামড়া ছিলে নিলেই পেয়ে যাবে পোশাক। প্রোটিনের অভাব হবে না। খালি হাতেই ধরতে পারবে অনেক জন্তু-জানোয়ার। খিদের কষ্ট থাকবে না। প্রতিটা ঝর্নায় রয়েছে লাখে লাখে মাছ। ধরব বলে আজই তৈরি করেছি ফাঁদ। আগামীকাল ভোরে তোমরা

নাস্তা তৈরি করতে বসবে। আমি রাঁধব কয়েকটা পাহাড়ি ট্রাউট। সময় কম থাকলে আঁশ ছাড়িয়ে কাঁচাই খেয়ে নেব। তাতে নষ্ট হবে না প্রোটিন। ...জিনা, আসলে বেশিরভাগ মানুষ ভিন্ন এলাকায় গিয়ে নিজের ইচ্ছে মত চলতে চায়। তা না পারলে রেগে যায়। কিন্তু যে-কোনও এলাকা থেকে সুবিধা নেয়া উচিত।'

চুপ করে শুনছিল জিনা। রানা থেমে যাওয়ায় ওর মনে হলো, অদ্ভুত কোনও মন্ত্র শুনেছে মানুষটার কাছ থেকে।

কাজ শেষে উঠে কুটিরের চারপাশ ঘুরে দেখল রানা। মাথা দোলাল আস্তে করে। ওর আবাস যথেষ্ট শক্তপোক্ত, কষ্ট পেতে হবে না শীতে।

ঝুঁকে কাঠি দিয়ে আগুন থেকে বড় তিনটে পাথর বের করল রানা, রাখল দরজার খুব কাছে। ঢেকে দিল সামান্য ধুলো দিয়ে।

জিনার মনে হলো না এসব কাজ করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়েছে রানা। যেন চিরকাল ধরেই এসব করছে। চোখে-মুখে কোনও বিরক্তির ছাপ নেই। বোঝা যায়, অভাব নেই শক্তি বা ধৈর্যের। যেন মেনে চলেছে অচেনা কোনও নিয়ম।

'আপনি আসলে টারজান, তাই না?' বলল জিনা। কালচে-সোনালি মাথা নাড়ল। 'বোধহয় বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন জঙ্গলেই। আগে কখনও এমন কাউকে দেখিনি– এক এক পরিবেশে একেক রকম।' চুপ হয়ে গেল ও। একটু পর বলল, 'কী যেন আছে আপনার ভেতর, যেটা আমি ধরতে পারিনি।'

মৃদু হেসে ফেলল রানা। 'তাই? কী সেই গভীর রহস্য?'

'জানি না,' বিনা দ্বিধায় স্বীকার করল জিনা। 'কিন্তু মনে হচ্ছে, কিছু লুকিয়ে রেখেছেন আমার কাছ থেকে। আপনাকে যত দেখছি, বিস্মিত হচ্ছি। যেমন, সাধারণ যে-কোনও শব্দে অনেক বেশি মনোযোগ দেন। যেন শোনেন জঙ্গলের কথা। আপনার ওই নেকড়ের মতই। বা কোনও বাঘের মত। কিন্তু আমরা সাধারণ

কেউ এসব বুঝি না। তাতে ভয় পাওয়া উচিত কি না, তাও বুঝি না; আবার খুশি হই, আপনি আমাদের দলে রয়েছেন বলে।'

চুপ করে থাকল রানা। বলবার কিছুই নেই।

কুয়াশা নেই, চাঁদ জ্বলা গভীর রাত। নিজের তাঁবুতে শুয়ে নীরবে রানার কুটিরের দিকে চেয়ে আছে জিনা উইলসন। ওই কুটিরের পাশেই শুয়েছে কালো, মস্ত নেকড়ে। মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু জিনা জানে, আসলে জেগে আছে। কুটিরে ঘুমাচ্ছে মাসুদ রানা। জিনা খেয়াল করেছে, খুব কম নড়ছে মানুষটা। কেন যেন ওর মনে হলো, সামান্য কোনও আওয়াজ পেলেই অন্য যে-কারও আগেই জেগে উঠবে রানা।

অন্তরের গভীরে কেমন মানুষ ওই মাসুদ রানা?–ভাবতে চাইল জিনা। শিক্ষিত ও ভদ্র– আবার কেন যেন হিংস্র। ভাল করেই চেনে এসব জঙ্গল। হয়তো খুব সহজ তার জীবন। ব্যস্ত, আধুনিক সভ্যতা থেকে লুকিয়ে ফিরছে অরণ্যের এই বুনো জীবনে। কিন্তু তেমনও তো হওয়ার কথা নয়। জীবনে এই প্রথমবারের মত কোনও পুরুষের প্রতি এমন অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করছে জিনা। নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে, কিন্তু তা বোধহয় সম্ভব হয়নি। রানা বুঝে গেছে, ওর নীরব আগ্রহ।

মাসুদ রানা।

ওর ডোশিয়ে পড়েছে জিনা।

ওটা মস্ত এক ইতিহাসের মত।

ভাগ্যিস ফেসবুক ব্যবহার করে না, নইলে কোটি-কোটি মেয়ে দিন-রাত বিরক্ত করে ছাড়ত রানাকে।

কী রহস্যময় একাকী মানুষ!

পাতার ছোট্ট কুটিরের দিকে চেয়ে রইল জিনা, পাশে রাখল রাইফেল। ভাবছে, কী ভীষণ অদ্ভুত আকর্ষণ পুরুষটার! যেমন

কঠোর, তেমনই নিখুঁত আচরণ। যেন জীবন্ত কোনও কিংবদন্তী।

এ দলের সবার মানসিক জোরের চেয়েও বেশি মানসিক ক্ষমতা রাখে শুধু একা মাসুদ রানা!

কুঁজো হয়ে দানবীয় দুই হাত বার কয়েক কচলে নিল সে। নিঃশব্দে চেয়ে আছে ক্যাম্পের দিকে। করোটি আকৃতির চাঁদের ফ্যাকাসে আলোয় দেখছে চারপাশ। থমথম করছে সব। নড়ছে না কিছুই। ওই দলের আগে রেডিয়ো হাতে ট্র্যাক করে যে, তাকে দেখতে পেয়েছে সে। কিন্তু তার পাশেই শুয়ে আছে বিশাল ওই কালো নেকড়ে।

খারাপ! খুব খারাপ!

মনে হচ্ছে ঘুমের ভিতরেও হুঁশিয়ার ওই নেকড়ে। টান-টান হয়ে আছে শরীর। দুই কান খাড়া, আগুন থেকে সরিয়ে রেখেছে কালো মুখ। কে জানে, হয়তো চেয়ে আছে অন্ধকারে গাছগুলোর দিকেই। অপেক্ষা করছে বিপদের জন্য। মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর উপর। গতকাল যে গ্রিজলি ভালুকটাকে শেষ করেছে সে, ঠিক ওটার মতই বিপজ্জনক ওই নেকড়ে।

গতদিন ভালুকের সঙ্গে মরণপণ লড়াইয়ের সময় যেসব ক্ষত হয়েছিল দেহে, এরই ভিতর সেরে গেছে সব। আছে শুধু সামান্য সরু কয়েকটা লালচে দাগ। কী করে যেন কমে গেছে মানুষের মত স্বাভাবিক বুদ্ধি, এ মুহূর্তে কোনও ভাবেই মনে পড়ল না নিজের নাম।

তাতেই বা কী?

হাইব্রিড ডিএনএ-র কারণে দেহে বেড়ে গেছে রক্তের চলাচল, ইমিউন সিস্টেম কী করে যেন ঝড়ের গতিতে কোষ সিনথেসাইয করছে, মাত্র একদিনে সুস্থ করে তুলছে ওকে।

রাতের আঁধার আকাশের পটভূমিতে চুপ করে দেখছে

ক্যাম্প। না, আজ ওখানে হামলা না করে অপেক্ষা করবে। আগামীকাল ওদেরকে টেনে নেবে গহীন অরণ্যে, আসতে দেবে খুব কাছে। ভাবতে দেবে, কোণঠাসা করে ফেলেছে ওকে। আর তারপর নিজেই কোণঠাসা করবে সব ক'টাকে। যখন শুরু করবে প্রথম হামলা, গোটা চারেক লোক খুন করেই সরে যাবে।

না নেকড়ে, না সৈনিক– কারও তরফ থেকে আহত হওয়ার ভয় তার নেই। কিন্তু ভয় ওই রেডিয়োসহ লোকটাকে। কেন যেন তাকে ভয় লাগছে, এর কারণ বুঝতে পারছে না।

প্রাণপণ লড়াই করবে অন্য লোকগুলো। তাই করে সৈনিকরা।

কিন্তু ওর প্রচণ্ড শক্তি বা হিংস্র আক্রমণের সামনে মরে সবাই। এবারও তাই হবে। সবাইকে খুন করবে সে।

হ্যাঁ, খতম করে দেবে প্রত্যেককে।

ঘড়-ঘড় শব্দে সন্তুষ্ট নিচু গর্জন ছাড়ল সে, ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হারিয়ে গেল নিকষ কালো জঙ্গলে।

পনেরো

মনে হলো বহু দূর থেকে এল জিনা উইলসনের কণ্ঠ: 'আপনি নতুন কিছু দেখতে পেলেন?'

পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে ট্র্যাক দেখছে রানা, একটুও নড়ল না। শৈলশিরার মাটি নরম, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে নানান ধরনের ছাপ। অধৈর্য হয়ে পা ঘষ্টে এদিক-ওদিক সরেছে

জানোয়ারটা। বোধহয় তৃষ্ণা পেয়েছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে নীচের ক্যাম্পে চোখ রাখল রানা। আঁচ করল, গতরাতে এখানে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ওদেরকে দেখেছে ওটা।

'রানা?' সামনে বাড়ল জিনা। 'কী দেখছেন?'

'গভীর রাতে ওটা এখানে ছিল।'

'কতক্ষণ ছিল?'

'আন্দাজ চার ঘণ্টা,' ভুরু কুঁচকে গেল রানার, 'ভোরের আগে।'

সামনে বেড়ে রানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল জিনা। ওর অর্ধেক মুখ আড়াল করল কালচে-সোনালি চুল। গভীর মনোযোগে দেখল ট্র্যাক। পেরিয়ে গেল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে দেখল ঠিক কোথায় ছিল জন্তুটা। নিচু স্বরে বলল, 'ওটা কী ধরনের জন্তু, রানা?' কণ্ঠে প্রকাশ পেল চাপা ভয়। 'যদি মানুষ না হয়ে থাকে, তো ওটা কী?'

জায়গা ছেড়ে নড়ল না রানা।

অদক্ষ ট্র্যাকার বলবে, এখানে ছিল জানোয়ারটা। দক্ষরা বুঝবে, ওটা ছিল দৃঢ়-চিত্তের, কিন্তু কোনও কারণে হামলা না করে পিছিয়ে গেছে। আরও কিছু বিষয় খেয়াল করেছে রানা। কিন্তু সেগুলো কাউকে বলবার মত নয়। আসলে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিচ্ছে তা। মুখ ফুটে রানা কিছু বললে আর সবাই বলবে, খামোকা আন্দাজে গুল মারছে ও।

অন্তর থেকে জানে রানা, ঠিক কখন অধৈর্য হয়ে পা সরিয়ে নিয়েছে ওটা। বা কখন শৈলশিরার কিনারায় গিয়ে দেখেছে ক্যাম্প। একটা কথা রানা বুঝে গেছে, গতরাতে ক্যাম্পে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি গভীর মনোযোগে ওকে দেখেছে ওটা।

হঠাৎ রানা শুনল, গভীর পাতাল থেকে যেন বেরোল বজ্রপাতের

মত চাপা আওয়াজ, কিন্তু ওই গর্জন এসেছে ওর ঠিক পিছন থেকে। গুড়-গুড় শব্দে থরথর করে কাঁপল চারপাশ। ছিটকে সামনে বেড়েছে কালো, বুনো এক ঢেউ, ভয়ঙ্কর হিংস্র।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে দানবটার পিছু নিয়েছে ওরা।

আর বেশি দূরে নেই ওটা।

চট্ করে ঘুরে চাইল রানা।

হান্টারের তীক্ষ্ণ শ্বদন্তের ডগা পেরিয়ে গেছে নীচের চোয়াল, কালো আগুনের মত জ্বলছে দুই চোখ।

'কী রে, হান্টার?'

প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে এক পা বাড়ল নেকড়ে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভয়ঙ্কর চেহারা করেছে। গলার গভীর থেকে উঠল চারপাশ কাঁপিয়ে দেয়া ঘড়-ঘড় গর্জন। রাগে থরথর করে কাঁপছে। একবার ওকে দেখে নিয়ে আবারও সামনে চোখ রাখল রানা।

খুব কাছেই ট্র্যাক দেখছে জিনা।

বেশ পিছনে সাপোর্ট টিম।

সামনে এক ঝাড় সাদা পপলার ও চিরসবুজ গাছের প্রায় অভেদ্য জঙ্গল, যেন কালচে দেয়াল।

রানা নিশ্চিত, ওই পথেই দক্ষিণে চলেছে জানোয়ারটা। নতুন সব ট্র্যাক বলছে, মনে কোনও দ্বিধা নেই ওটার। শুধু তা-ই নয়, জরুরি কোনও উদ্দেশ্য আছে।

রাইফেল হাতে কুঁজো হয়ে সামনে বাড়ল রানা। আকাশে জ্বলজ্বল করছে সোনালি সূর্য, কিন্তু জঙ্গলে ওই আলোর বদলে রাজত্ব করছে কালো আঁধার। দক্ষিণ আমেরিকার ঘন জঙ্গলের কথা মনে পড়ল ওর। ওখানে এমন সব জায়গা আছে, যেখানে প্রকাণ্ড গাছের কারণে শত শত বছরেও মাটি স্পর্শ করেনি সূর্যের সোনালি রোদ।

শক্তিশালী পাথরের মত পেশি নিয়ে কাঁধ-গলা ফুলিয়ে রানার

পাশে পাশে চলেছে নেকড়ে। এখন ছাড়ছে না চাপা গর্জন। সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে দু'চোয়াল। দেখা গেল ক্ষুরধার দাঁত। ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রু দেখলেই। দেরি হবে না খুন করতে।

পিছনে আসছে জিনা, যে-কোনও অ্যাম্বুশের জন্যে তৈরি।

চাপা স্বরে বলল রানা, 'আপাতত পিছন দিক দেখতে হবে না, জিনা।' চোখ রেখেছে সামনের অন্ধকারে। 'এখানে অ্যাম্বুশ করবে না ওটা। ছুটতে শুরু করে দূরে চলেছে। এমন কী চারপাশেও তাকিয়ে দেখছে না।'

'তা হলে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন কেন?' অবাক চোখে রানাকে দেখল জিনা।

'কারণ, সাধারণত এমন করে না ওটা।'

'কেন করে না?'

এক জায়গায় গভীর ভাবে ডেবে গেছে পা, খাটো খাদের মত। ওটা থেকে বুঝল রানা, হঠাৎ করেই চমকে ডানদিকে ঘুরেছে জানোয়ারটা।

ঝুঁকে তর্জনী দিয়ে চিহ্নটা স্পর্শ করল রানা।

জঙ্গলে জন্মেছে কোটি ফার্ন ও সবজিগাছ। সূর্যের অভাবে পচে গেছে কোনও কোনওটা। মারা পড়েছে বুড়ো পাইন গাছ। প্রাচীন, ঘন সব জঙ্গলে থাকে এ গন্ধ, এখানেও তা-ই। বুনো জন্তুর গায়ের কুবাসের উপর দিয়ে এল আরেকটা গন্ধ।

'এখানে থাক্, হান্টার,' নিচু স্বরে নির্দেশ দিল রানা।

হাঁটতে শুরু করেও হঠাৎ থমকে গেল কালো নেকড়ে। কুচকুচে কালো চোখ রেখেছে সামনের জঙ্গলে। পাল্টে গেল দাঁড়াবার ভঙ্গি, যে-কোনও সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর উপর।

ঘুরে জিনার দিকে চাইল রানা। 'হান্টারের সঙ্গে এখানেই থাকবে। অন্যদের বলবে অপেক্ষা করতে।'

লড়াইয়ের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি জিনা, শক্ত হাতে ধরেছে

ব্যারেট। 'আর আপনি কী করবেন?'

রওনা হয়ে গেছে রানা, সামনে বাঁক নিল ডানদিকে। মস্ত দুই ফার্নের দিকে চলেছে। ওদিকে ঘন ঝোপ। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'কিছু মারা পড়েছে। জানতে চাই ওটা কী।'

মুখ থেকে কালচে-সোনালি চুল সরিয়ে জিনা দেখল, অবাক করা জাদুর মত উধাও হয়েছে মাসুদ রানা।

জিনার ইশারা না মেনে নীরবে সামনে বাড়ল কং তানামুরা, কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার পাশে থামল।

ভুরু কুঁচকে ঘন ঝোপঝাড় দেখছে জাপানি যোদ্ধা। সরু দুই কালো চোখে সতর্কতা। চাপা, শীতল কণ্ঠে বলল, 'কী হয়েছে, জিনা?'

মৃদু মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'জানি না।'

চট্ করে কালো নেকড়েকে দেখে নিতে চাইল তানামুরা। কিন্তু হঠাৎ করেই তিন সেকেণ্ড আগে অদৃশ্য হয়েছে ওটা। এই ছিল, এখন নেই। চারপাশ দেখল তানামুরা। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। থমথম করছে চারপাশ। দেখবার মত কিছু নেই। নিচু স্বরে বলল সে, 'ওই নেকড়ে... কী করে যেন... ভূতের মত হারিয়ে যায়।'

'সত্যি ভূতের মত,' সায় দিল জিনা। অন্ধকার ও অদৃশ্য মৃত্যুর আবছা ভয় মনে। চারপাশে ঘন ফার্নের ঝোপঝাড়। যেন কালচে-সবুজ দেয়াল।

মুখ নিচু করে কী যেন ভাবছে তানামুরা। ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা। সাপোর্ট টিমকে দেখল সে। পাল্টা আক্রমণ করতে তৈরি সবাই।

'যাওয়ার সময় কিছু বলেছেন মিস্টার রানা?' প্রায় ফিসফিস করে বলল তানামুরা।

'কোথাও গেলে আগে থেকে কিছুই বলেন না,' বলল জিনা। মনে মনে বলল, সৌভাগ্যবতী যে-মেয়ে রানাকে বিয়ে করবে, তাকে মেনে নিতে হবে, মানুষটা কখন কী করবে, কেউ বুঝতে পারবে না।

চুপ করে কী যেন ভাবছে তানামুরা। পেরিয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর বলল, 'খুব সতর্ক আর কঠিন মানুষ। কী যেন চালায় তাঁকে, কিন্তু নিজে নড়ে না ওটা।' একটু পর বলল, 'তোমার কী মনে হয়, উনি কতক্ষণ পর আসবেন? এদিকে ফুরিয়ে এল সূর্যের আলো। এবার ক্যাম্প করতে হবে।'

মাথা নাড়ল জিনা। 'কখন ফিরবেন কেউ বলতে পারবে না। কখনও দেখেছি, চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেছেন পুরো এক ঘণ্টা। কী যেন বুঝতে চেয়েছেন। তারপর আবারও রওনা হয়েছেন ঝড়ের গতিতে। বোধহয় তখন তাল মেলাতে পারবে না ওঁর সঙ্গে ওই নেকড়েও।'

'তা-ই আসলে,' সায় দিল তানামুরা।

'চারপাশ দেখে ফিরবেন,' বলল জিনা। 'একটা কথা বুঝে গেছি, কোনও ভুল করেন না। আমাকে বলেছেন, ভুল হলে ডাবল ব্যাক করলে যে সময় ব্যয় হবে, তার চেয়ে আগেই চারপাশ বুঝে চলাই ভাল।'

'ওই নেকড়ে মিস্টার রানাকে সাহায্য করে।'

'হ্যাঁ।' একটু দূরে খস্-খস্ শব্দ পেয়ে ওদিকে রাইফেলের নল ঘোরাল জিনা। ওর ধারণা: গাছ থেকে খসে পড়ছে শুকনো ডাল। 'সত্যিই হান্টার সাহায্য করে। অথবা, হান্টারকে সাহায্য করেন রানা। ঘটনা যা-ই হোক, একে অপরের হয়ে কাজ করে।'

'আমারও তা-ই ধারণা,' বলল তানামুরা। 'তোমার কী মনে হয়, কখন ওই জানোয়ারটাকে রেঞ্জে পাব?'

মৃদু শোনাল জিনার কণ্ঠ, 'যত তাড়াতাড়ি আশা করবেন,

তারও আগেই। তবে তা আমাদের জন্যে ভাল হবে কি না, তা অন্য প্রসঙ্গ।'

ক্ষত-বিক্ষত, ছিড়েখুঁড়ে দেয়া মস্ত বাদামি-কালো ভালুকের লাশ দেখছে রানা। ওটার বুকের সাদা পাঁজর কালচে রক্তে ভরা। অন্ধকারময় আবছা আলোয় কেমন ভুতুড়ে দেখাচ্ছে সব।

চুপ করে আছে রানা, চমকে গেছে মস্ত গ্রিজলির আকার দেখে। ওজন হবে প্রায় পাঁচ শ' কেজি। ধারালো, কালো নখ নিয়ে ঘুমিয়ে আছে চিরকালের জন্য। শেষবারের মত গর্জন ছাড়তে চেয়েছিল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে। কিন্তু মারাত্মক আঘাত বুকে লাগতেই হঠাৎ অস্বচ্ছ হয়ে গেছে দু'চোখ। তখনই এসেছে অকস্মাৎ মৃত্যু।

সাবধানে চারপাশ ঘুরে দেখল রানা। পেল অনেক চিহ্ন। প্রকাণ্ড ভালুককে শেষ করে দেয়ার পর দেরি না করে এই জায়গা ছেড়ে চলে গেছে দানবটা। একবারও ফেরেনি। বাঘ হলে মাংস খেতে আবারও ফিরত। আশপাশে গ্রিজলির অসংখ্য চিহ্ন। কিছু ঝোপের পাতা খেয়েছে ওটা। ছিড়ে নিতে গিয়ে মাটিতে ফেলেছে কয়েক ধরনের জাম। আরও কিছুক্ষণ চারপাশ দেখে নিয়ে রানা নিশ্চিত হলো, সত্যিই ও ছাড়া এখানে কেউ নেই। আবারও ফিরল ভালুকের লাশ পরীক্ষা করতে।

নানান চিহ্ন থেকে বুঝল, এখানে ভয়ঙ্কর লড়াই হয়েছে। দীর্ঘ নয়, কিন্তু লড়াইটা ছিল প্রাণপণ। সর্বশক্তি নিয়ে হামলা করেছে দুই জন্তু পরস্পরের উপর। রানার হঠাৎ মনে পড়ল, সাইবেরিয়ান ওই দুই বাঘের কথা। লড়তে শুরু করে মারা পড়েছিল দুটোই। মাঝে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যস্ত ছিল ও। তখন হাড়ে হাড়ে বুঝেছে, যত আক্রমণাত্মক হবে শত্রু, লড়াই হবে তত সংক্ষিপ্ত।

সাধারণত নিজ আকারের ভালুক দেখলে মারপিট এড়িয়ে যায়

গ্রিজলি। বেশিরভাগ সময় আত্মরক্ষা করে। কিন্তু এই ভালুকের নখ ভরে আছে থকথকে কালো রক্তে। এ থেকে রানা বুঝল, গ্রিজলির শত্রু ভাল ভাবেই আহত। তাতে খানিকটা স্বস্তিও পেল। মনে মনে বলল, 'ওটাকে খুন করা যাবে না, এমন নয়।'

অদ্ভুত নীরবতা চারপাশে। ছোরা বের করে ভালুকের ক্ষত নেড়ে দেখল রানা। আর তখনই শুনল, পাখির ডানা নড়বার মত আওয়াজ। খুব কাছেই হয়েছে ওটা।

প্রায় নীরবে আসছে কেউ।

ওই ক্ষীণ পদধ্বনি চেনে রানা। ঝোপঝাড় থেকে আসছে শব্দ, চুপ করে সেদিকে চাইল। খুব নিচু স্বরে বলল, 'আমি এখানে, হান্টার।'

সবজেটে ফার্নের ঝোপ থেকে বেরোল দুটো চকচকে কালো চোখ। অত্যন্ত হুঁশিয়ার কালো নেকড়ে। রক্তের বদ গন্ধে বুঝে গেছে, এখন আর এখানে লড়াই করতে হবে না।

নতুন করে মৃত গ্রিজলির লাশে মনোযোগ দিল রানা। উপড়ে নেয়া হয়েছে ওটার হৃৎপিণ্ড। ভালুকের উপর ভয়ঙ্কর খেপে গিয়েছিল দানবটা। গ্রিজলির মোটা গর্দান দেখল রানা। তারপর করোটি। ওখানে তিন ইঞ্চি ডেবে গেছে পুরু হাড়। আঙুল দিয়ে গভীর ওই গর্ত স্পর্শ করল রানা। ঘন লোম কোনও কাজে আসেনি ভালুকের।

পাউডারের মত গুঁড়ো হয়েছে করোটির হাড়ের একাংশ। মানুষের মুঠোর চেয়ে ছোট এক টুকরো হাড় ডেবে গিয়ে ছেঁচে দিয়েছে মগজ। হতবাক হয়ে আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা।

জঙ্গলে মৃত্যু নতুন কিছু নয়, এটা জীবনের জরুরি অংশ। দরকার পড়লে খাবার সংগ্রহের জন্য খুন করবে রানা, তাতে কোনও আবেগ থাকবে না। কিন্তু এই ভালুককে খুন করা হয়েছে কোনও কারণ ছাড়াই। চাইলে সরে যেতে পারত দানব, কিন্তু তা

করেনি। খুন করবে বলেই হামলা করেছে।

খিদে পেলে গাছের পাতা, বাকল, কোনও জন্তু, মাছ, বা পচা মাংসও খুব আগ্রহ নিয়ে খায় গ্রিজলি। বাধ্য হয়েই পেটের দায়ে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ায়। বাধা দেয় না কেউ। গ্রিজলি আসলে মস্ত গার্বেজ ক্যানের মত। বাধ্য না হলে বড় আকারের কোনও জন্তুকে আক্রমণ করে না। যে-কোনও ছোট জন্তু মেরে, ওগুলো খেয়ে সন্তুষ্ট থাকে। মাংসের অভাব হয় না তাদের।

বাউয়ি নাইফ বের করে গ্রিজলির পেট চিরল রানা। ভুস্ করে বেরোল বাজে গন্ধের গ্যাস। বিরক্ত হয়ে নাক আরেকদিকে সরিয়ে নিল ও। কয়েক সেকেণ্ড পর পেট থেকে বের করল একগাদা জাম ও প্রায় সেদ্ধ ছয়টি মাছ। গত চব্বিশ ঘণ্টায় এগুলো পেটে পুরেছিল ভালুক।

এটা খুবই স্বাভাবিক।

ভীষণ কষ্টকর হিম শীতের আগেই বার-বার পেট পুরে খেতে হবে ভালুককে, নইলে সম্ভব হবে না হাইবারনেশন। আরও দুটো মাস পেট-পূজা করত গ্রিজলি, তারপর ঘুমিয়ে পড়ত। প্রতিদিন জেগে একটু হেঁটে গরম করে নিত গা। দু'চার দিন পর পর পরিষ্কার করত নিজের দেহের রোম। অথবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা উদাস হয়ে দেখত সাদা তুষার। অপেক্ষা করত, কবে আসবে বসন্তের সবুজ ডাক। এ সময়ে বাঁচার জন্য ওর দেহ খরচ করত জমা করা চর্বি।

দানবের মত প্রকাণ্ড গ্রিজলি কীভাবে খতম হয়েছে, ভাল করেই বুঝতে পেরেছে রানা। আর সে কারণেই বুকে সাহস থাকলেও, অজান্তে বার কয়েক ঢোক গিলল। শিরশির করে দাঁড়িয়ে গেল ঘাড়ের খাটো রোম। এই ভালুককে যে খুন করেছে, তার শক্তির কোনও তুলনা নেই। মস্ত সব বাঘ-সিংহ কিছুই না তার কাছে। মানুষ তুচ্ছ, সাধারণ খাবার।

ভালুকের মৃতদেহ থেকে চোখ তুলে দূর জঙ্গলে চাইল রানা। বুঝতে পারছে, এখন আশপাশে নেই ওই দানব। কুঁচকে উঠেছে ভুরু। অন্তরে বুঝল রানা, সামনে তুমুল লড়াই, কোনও ভাবেই এড়াতে পারবে না তা।

পাশে এসে থেমেছে হান্টার।

ওটার পিঠ রানার প্রায় কোমর ছুঁই-ছুঁই করছে।

'চল্, ফেরত যাই,' হান্টারের ঘাড়ের রোম নেড়ে নিল রানা। 'আমাদের বন্ধুদের জন্যে দুঃসংবাদ আছে।'

তানামুরাকে হতবাক বলে মনে হলো না। সহজ ভাবেই নিয়েছে ভালুকের মৃতদেহ। কিন্তু শক্ত হাতে ধরেছে এমপি-৫। চোখে প্রতিজ্ঞা। হাল ছাড়বে না। শেষ করবে ওই ভয়ঙ্কর দানবকে।

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা: 'স্বাভাবিক আর সব ভালুকের মতই ঝোপ থেকে বেরিয়ে বিস্মিত হয়েছিল গ্রিজলি। হয়তো আক্রমণে না গিয়ে চেষ্টা করেছিল আত্মরক্ষা করতে। কিন্তু জমি এখানে সমতল। আর গ্রিজলির চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগতি ওই জানোয়ার। মুখোমুখি হয়ে যেতে কেউ কাউকে ছাড় দিতে চায়নি। তাতেই শুরু হয়েছে তুমুল লড়াই। জানোয়ারটাকে রক্তাক্ত করেছে গ্রিজলি। একে অপরকে আহত করেছে। গাছের গুঁড়িতে ওই জন্তুর রক্ত দেখেছি। হামলার এক পর্যায়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে পড়ে গেছে মাটিতে। ওপরে ছিল জন্তুটা। তখনই দু'হাতে আঙুর টিপে ফাটিয়ে দেয়ার মত চুরমার করেছে গ্রিজলির করোটি। তারপর ছিঁড়ে খেয়ে নিয়েছে হৃৎপিণ্ড।'

ওর কথা শেষ হওয়ার পর নামল নীরবতা।

অবাক চোখে রানাকে দেখল তানামুরা। 'হৃৎপিণ্ড?'

'ফুর্তির জন্যে,' বলল রানা। 'যেহেতু জিতে গেছে।'

দলের সবাই চেয়ে আছে ওর দিকে।

ভালুকের পাশে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করলেন ডক্টর সিরাজউদ্দীন, 'অবাক কাণ্ড! সত্যি বিস্ময়কর!'

'কেন বিস্ময়কর, প্রফেসর?' জানতে চাইল রানা।

'কারণ, বাছা,' ভালুকের পাশে বসে পড়লেন ডক্টর। 'এসব ক্ষত খেয়াল করেছ? কাঁধে কিছু চিহ্ন আছে, যেখানে কঠিন হাতে ধরেছিল দানবটা, কিন্তু ক্ষত তৈরি করেনি। আর এর মানে...' চুপ হয়ে গেলেন প্রফেসর।

'খুলে বলুন,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল টড ওয়েইলার। 'নাকি আপনি ভাবছেন, এসব না জানালেও চলবে আমাদের? কী-ই বা হবে, বড়জোর খুন হব আমরা!'

তার দিকে মনোযোগ নেই প্রফেসরের, বিড়বিড় করে বললেন, 'অন্তত দশ হাজার বছর আগে যারা হারিয়ে গেছে, তাদের কেউ কি রয়ে গেছে পৃথিবীতে? স্মিলডন হারিয়ে যাওয়ার পর এমন কোনও জন্তু আর দেখা যায়নি!' হাত তুলে কয়েকটা ক্ষতচিহ্ন দেখালেন। 'এই যে পিছন থেকে শক্ত করে ধরেছিল ভালুকের কাঁধ, মুচড়ে দিয়েছিল ঘাড়। পরক্ষণে হাত ওপরে তুলে চুরমার করেছে করোটি। ওই শক্তির তুলনা দেয়ার মত কিছু এখন আর পৃথিবীতে নেই। স্মিলডন হলে দাঁত দিয়ে শিকারকে খুন করত। কিন্তু এই দানব হাতুড়ির মত ব্যবহার করেছে নিজের দু'হাত।' অবিশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'দাঁত বা নখ প্রায় ব্যবহার না করেই শেষ করেছে গ্রিজলিকে, কারণ ওটার শক্তি অকল্পনীয়। এই রহস্য যে কাউকে চমকে দেবে। প্রচণ্ড রাগ ওটার। বর্তমানের কোনও বাঘের মত নয়। কোনও মিল নেই আচরণে। হয়তো এমন কোনও অস্ত্র ব্যবহার করেছে, যেটা সম্পর্কে আধুনিক মানুষ কিছুই জানে না।'

'তা হলে তো বোধহয় ওটাকে ডেকে এনে মেডেল দেয়া উচিত,' টিটকারির সুরে বলল টড ওয়েইলার।

কঠোর চোখে তাকে দেখল রানা। নিচু স্বরে ধমক দিল, 'মুখ সামলে, ওয়েইলার!' অন্য দিকে ঘুরে চাইল লোকটা। প্রফেসরকে বলল রানা, 'এ থেকে কী ধারণা করছেন, ডক্টর?'

'ওটা স্মিলডনের মতই ভয়ঙ্কর হিংস্র,' বললেন সিরাজউদ্দীন। 'কিন্তু প্রাচীন আমলের ওই বাঘের মত নয়, এই জন্তু হাঁটে মানুষের মত। কখনও কখনও চিন্তা করে আমাদের মতই। আর এ কারণেই অন্য কথা ভাবছি।'

'তা কী?' জানতে চাইল তানামুরা।

'ওই জন্তু কোনও ধরনের মিউটেশন,' সোজা কথা বললেন প্রফেসর, 'মানুষ আর কোনও জন্তুর মাঝের জেনেটিক মিউটেশন। তা কী করে হলো, তা আমার জানা নেই। কিন্তু এ ছাড়া কোনও থিয়োরি দাঁড় করানো যায় না।'

দলের সবাইকে দেখল রানা।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ানের কাছে শুনেছে: এরা যার যার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষ। কিন্তু এই এলাকায় এসে ও টের পেয়েছে, কেউ কেউ জঙ্গল বা পাহাড়ে মোটেও উপযুক্ত নয়।

এই কথা ঠিক, কয়েকজন যোগ্য। যেমন টড ওয়েইলার। মানিয়ে নিয়েছে ঝোপঝাড় ও জঙ্গলে। আচরণ থেকে টের পাওয়া যায়, অত্যন্ত হিংস্র লোক ও দক্ষ যোদ্ধা। ভরসা করা যায় তার ওপর। কোনও গুরুতর পরিবেশে নেতার কাছে অভিযোগ তুলবে না।

টড ওয়েইলারের মতই দক্ষ বাড রলিন্স নালিশ করবে না কখনও। কেন যেন রানার মনে হয়েছে, বিশ্বাস করা যায় তাকে সবার সঙ্গে হালকা সব কৌতুক করছে, মুষড়ে পড়েনি, ভুলিয়ে রাখতে পেরেছে নিজের মনকে। কিছুই গোপন করছে না।

আবার সবাইকে যে চিনতে পেরেছে রানা, তাও নয়।

ওর দলে রয়েছে এক ব্রিটিশ সৈনিক, নাম প্রেস্টন ওয়েস্ট।

জিনার কাছে শুনেছে রানা, এই লোক আগে ছিল ব্রিটিশ স্পেশাল এয়ার সার্ভিস বা এসএএস-এ। ওই বাহিনীর লোক পৃথিবীর অন্যতম সেরা লড়াকু বলে পরিচিত। যে কারণেই হোক, সে ওকে এড়িয়ে চলেছে। হালকা-পাতলা দেহ। কিন্তু পেশি তারের মত পাকানো। মনে হয় না কখনও ক্লান্ত হয়। এর কারণ, অত্যন্ত কঠোর ট্রেনিং পেয়েছে। ত্রিকোণ চেহারা, সরু দুই সবুজ চোখের দৃষ্টি তীরের মত ধারালো। জিনার কাছে রানা আরও শুনেছে, প্রেস্টন আটটা ভাষা জানে। ট্যাকটিকাল অ্যানালিসিসে এক্সপার্ট। কোনও বিপদ হওয়ার আগেই আত্মরক্ষা-মূলক ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করবে। শিক্ষিত অফিসারদেরকে ব্রিটিশ ন্যাশনাল ওঅর কলেজে পড়াশোনা করে পাশ করতে হয়। ওই একই পরীক্ষা দিতে হয়েছে রানাকে আর্মি কলেজে, এবং পরে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে।

জিনার কাছে জিজ্ঞেস করল রানা, 'এই মিশনে কী কারণে প্রেস্টনকে নেয়া হয়েছে?'

'ট্যাকটিকাল অ্যানালিসিস লাগবে, তাই,' দূরের জঙ্গলের দিকে চেয়ে বলল জিনা। 'পেন্টাগন জানে না এরপর কী হবে পরিস্থিতি। সত্যি বলতে, অবাক হয়েছি আমি। আমাদের নিয়ে এই দল তৈরি না করে ডেল্টা বা সিল টিম পাঠাতে পারত। আমরা কখনও পরস্পরের সঙ্গে কোনও মিশনে যাইনি। বিপদে কে কী করবে, কারও জানা নেই। যেন নিশ্চিত করা হয়েছে. আমরা ব্যর্থ হই।'

কথা শুনতে শুনতে পিছনে পায়ের আওয়াজ পেয়েছে রানা

'সবার অস্ত্র অটোমেটিক ফায়ারে রাখো,' নির্দেশ দিল তানামুরা, 'কিন্তু জন্তুটাকে ভাল ভাবে দেখতে না পেলে গুলি করবে না কেউ।'

এগিয়ে এল রানার প্রায় অচেনা একজন। নাম আর্থার জয়েস। বাদামি চুল, বাদামি চোখ, চিকন মানুষ, কিন্তু দীর্ঘ বাহু ও পেশিবহুল কাঁধে প্রচুর শক্তি। উচ্চারণ আইরিশদের মত। হাতে এম-১৬ রাইফেল। কাঁধে ক্লাইমিং রোপ, কোমরে ক্র্যাম্পন, চোক, বেল্টে ক্যারাবিনার ও পিটন। গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে, 'আমি মিস্টার রানার কাছে একটা কথা জানতে চাই।'

'বলো,' বলল রানা।

'মিস্টার রানা, ওই জন্তুকে ট্র্যাক করতে আপনাকে দেখেছি। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। যোগ্যতাও আপনার অনেক। কিন্তু যেটা জানতে চাইছি: আপনি আসলে ওটা সম্পর্কে কী ভাবছেন। ওরা বলছে, আপনি জানেন ওটা কীভাবে চলে। আর ওটার মত ভাবতে পারেন।' এক মুহূর্ত পর বলল, 'আমার মনে হয় না, ওটার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে কিছু জেনে নেয়ার সময় থাকবে। ভুল হলে মরতে হবে আমাদেরকে। তাই মনে হচ্ছে, আপনার কাছ থেকে যতটা পারা যায় আগেই জেনে নেয়া ভাল।'

কাত হয়ে দাঁড়িয়ে রানা ও জয়েসকে দেখছে তানামুরা। মনে হলো খুশি হয়েছে সে।

রানা ভাবতে শুরু করেছে, কতটা বলবে, আর কতটা বলবে না। চট্ করে বুঝে গেল, দানবের নখের কথা বলা উচিত হবে না। টের পেল, যথেষ্ট জ্ঞান ওর নেই ওই জন্তুর বিষয়ে। তবুও কিছু বলতে হবে। কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ খুলল রানা, 'যা জানি, তা বলছি। অনেক কিছুই আমার জানা নেই। তবে এটা বুঝতে পারছি, ওটা জন্তুর মত চলছে না। ভালুকের মত কোনও সার্কিট তৈরি করছে না। বাঘের মত করে নিজ এলাকা দখলে রাখছে না। সুযোগ পেলেই খুন করছে। আমার ধারণা: ওটা আমাদেরকে অ্যাম্বুশ করবে। তা করবে কোনও কার্নিশ বা গাছ থেকে।

হামলার সময় কয়েকজনকে খুন করে পালিয়ে যাবে। আমাদের কাউকে ধাওয়া করে ধরতে চাইবে না। আমরা কাছে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আমাদের উচিত সব সময় চারপাশে চোখ রাখা। তাতে ভুল হলে কেউ বাঁচব না। আমাদের চেনা কিছু নয় ওটা। প্রচণ্ড গতি ও শক্তি ওটার। কাছাকাছি এলেই দেরি না করে গুলি করতে হবে। আশা করি অন্যরাও দেরি করবে না। কেউ যদি দ্বিধা করি, পরে আফসোস করার সময় পাব না।'

কালো মাথা বার কয়েক দোলাল তানামুরা। 'আপনার কী মনে হয়, মিস্টার রানা, কখন ওটার সঙ্গে দেখা হবে আমাদের?'

সামান্য দ্বিধা করল রানা, হাতে রাইফেল তুলে নিয়ে বলল, 'ওটা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেই হামলা করবে।'

ষোলো

মৃত গ্রিজলিকে দেখবার পর প্রথম সুযোগে নিরাপদ কোনও ক্যাম্প তৈরি করতে চেয়েছে ওরা। সেজন্য নেমে এসেছে শৈলশিরা থেকে। রানা সময় পায়নি যে ম্যাপ, কম্পাস বা জিপিএস দেখবে। আপাতত ওর বামদিকে হাঁটছে জিনা। ডানে হাণ্টার। বার-বার মাথা তুলে চারপাশ দেখে নিচ্ছে ওটা। শুঁকছে মাটি। খেপে উঠল হঠাৎ করেই।

জঙ্গলের মাঝে থামল রানা, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না।

একটু পর রাত নামবে।

এরই ভিতর বহু দূর দিগন্তে দেখা দিয়েছে দুর্বল আলোর রুপালি চাঁদ।

গ্রিজলির লাশ পাওয়ার পর বুঝতে চেয়েছে রানা, কীভাবে হামলা করছে দানবটা, কীভাবে বিধ্বস্ত করছে একের পর এক রিসার্চ ফ্যাসিলিটি। ভালুকের নখের চেয়েও ধারালো ওই জন্তুর নখ। যেন বাঁকা করাত বা কোনও ছোরা।

রানা আন্দাজ করতে পারেনি, ওই জন্তু আঁচড় কাটবে, দেহে ফুটো করবে না কি আঁকড়ে ধরবে নখ ব্যবহার করে।

আগে কখনও এ জিনিস দেখেনি ও। ওটা যেন সব কাজের কাজী। প্রাগৈতিহাসিক কারকারোডন মেগালোডনের কথা মনে পড়ল ওর। ওই হাঙরের দাঁতের মতই এই জিনিস। টিকে থাকবে হাজার বছর ধরে।

হান্টারকে পাশে রেখে নিরাপদে ক্যাম্প করবার মত কোনও জায়গা খুঁজতে শুরু করেছে রানা। ওর পাশে চলে এল তানামুরা। 'আপনি বোধহয় ওই জন্তুর মত কিছু কখনও দেখেননি, মিস্টার রানা?'

'না,' বিনা দ্বিধায় স্বীকার করল রানা, 'ওটা খুব সতর্ক। প্রয়োজনে এক পাথর থেকে সরে যাচ্ছে অন্য পাথরে। কারণ ছাড়া পাল্টে নিচ্ছে না দিক। ভালুক যেমন ঘুরতে থাকে নিজ খুশিতে বা বাঘ নিজ এলাকা দখলে রাখে, তেমন কিছুই করছে না। আরও বিস্ময়কর, মোটেও শিকার করছে না। সামনে কোনও জন্তু পেলেই খুন করে প্রচুর মাংস খেয়ে আবারও রওনা হচ্ছে মানুষের মত।' হাঁটতে হাঁটতে তানামুরাকে দেখল রানা। 'সাধারণত বাঁচার জন্যে খুন করে সব জন্তু। কিন্তু এটা তা করছে না, মানুষের মতই কোনও পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে।'

চিন্তিত মনে হলো তানামুরাকে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আরও কিছু বলবেন, মিস্টার রানা? আমাদের সব জেনে নেয়া ভাল।

যেমন ধরুন, ওই গ্রিজলির সঙ্গে ওটার লড়াইয়ে নতুন করে কিছু খেয়াল করেছেন?'

'ট্র্যাকের ব্যাপারে মোটামুটি সবই বলেছি, আর ভালুকের সঙ্গে জন্তুটার লড়াইয়ের বিষয়ে নতুন করে তেমন কিছু বলার নেই। শুধু বলব, ওই যুদ্ধ ছিল তীব্র এবং আকস্মিক। ওই জন্তু সামান্যতম দ্বিধা করেনি হামলা করতে। অত্যন্ত নিষ্ঠুর। আমার মনে হয়েছে, কখনও কখনও ওটা মানুষের মত চিন্তাও করেছে।'

রানার কথায় হতাশ দেখাল তানামুরাকে।

'সাধারণত, কোনও জন্তু মাটিতে তাকে ফেলে দেবে ভাবলে লড়াই করে না গ্রিজলি,' বলল রানা। 'তবুও বাধ্য হয়ে লড়তে হলে, পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে ব্যবহার করে সামনের দুই পা। কিন্তু আগে কখনও এমন জন্তু দেখিনি, যে মাটিতে ফেলে খুন করতে পেরেছে গ্রিজলিকে।'

'বুঝলাম।' রাইফেল ও কাটানার ফিতা ঠিক করল তানামুরা। চোখ সরু করে চাইল দূরের শৈলশিলার দিকে। ডুবন্ত সূর্যের লালচে আবির ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে। 'রাত নামার আগে সামনের শৈলশিরায় পৌঁছুতে পারব না, তাই মনে হচ্ছে, দেরি না করে ক্যাম্প করাই...'

হঠাৎ বিকট গর্জন ভেসে এল দূরের শৈলশিরা থেকে। দেখা গেল, প্রায় মানুষের মতই কী যেন। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছে ওদের প্রতি। পরক্ষণে ঝট্ করে হারিয়ে গেল নীচের বোল্ডারের আড়ালে।

ভীষণ চমকে গেছে রানা, ধক্-ধক্ করছে হৃৎপিণ্ড। যেন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে চোখ। কিন্তু তা নয়, ভাল ভাবেই দেখেছে ওই জন্তুটাকে। অন্যরা সবুজ গাছপালার ভিতর ওটাকে দেখবার এক মুহূর্ত আগেই চট্ করে ওখানে চোখ পড়েছিল ওর। 'সত্যি তা হলে...' বিড়বিড় করল রানা।

সবার গলা ছাপিয়ে বলে উঠল ওয়েইলার, 'সর্বনাশ! ওটা কী? উঠে এসেছে স্রেফ নরক থেকে!'

অন্যদের আগেই কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে নিয়েছে রানা। বুঝে গেছে, আপাতত দ্বিতীয়বার দেখা দেবে না ওটা।

ওই দানব হুঙ্কার বা গর্জনের মাধ্যমে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে: এবার শুরু হলো লড়াই!

সবার আত্মা কাঁপিয়ে দিয়ে আত্মতৃপ্তি পেয়েছে জন্তুটা, বুঝিয়ে দিয়েছে: তোমাদের চেয়ে অনেক ক্ষমতাশালী আমি এই জঙ্গল আর পাহাড়ে।

অন্তরে বুঝে গেল রানা, হামলা হবে আজ রাতেই।

নিরাপদ জায়গা না পেলে, পাহাড়ি এই এলাকায় ওই গ্রিজলি ভালুকের মতই ওদেরকে ছিঁড়ে ফেলবে জন্তুটা।

'মুভ!' চাপা কণ্ঠে নির্দেশ দিল রানা। 'মুভ! এখান থেকে সরে গিয়ে কোথাও ক্যাম্প করতে হবে!'

সহজ পথ খুঁজতে শুরু করে নীচের ঝর্নার দিকে চলল রানা। তিন শ' গজ যাওয়ার পর পেয়ে গেল প্রায় সমতল এক জায়গা। তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে জঙ্গলের দেয়াল। পুরো নিরাপদ নয়, কিন্তু এখানে না থেমে উপায়ও নেই। ঘনিয়ে আসছে আঁধার।

'একটু পর রাত নামবে, কাজেই থামছি আমরা,' নিচু দিগন্তে ভুতুড়ে, ঝাপসা থালার মত চাঁদ দেখল রানা।

'ওই জানোয়ারের বাচ্চা মরুক!' বলল বাড রলিন্স। জঙ্গল থেকে জোগাড় করছে শুকনো কাঠ, ছুঁড়ে ফেলছে ফাঁকা জায়গায়। 'এমন দাউ-দাউ আগুন জ্বালব, দিনের আলো বানিয়ে দেব।'

পাঁচ মিনিট পর ক্যাম্পে জ্বলে উঠল আগুন। আরও কাঠ জোগান দিল অন্যরা। জঙ্গল থেকে ফিরল বাড রলিন্স, শক্ত হাতে ধরেছে রাইফেল। অন্য হাতে এক বোঝা ডাল। একটু পর সারা

রাত জ্বলবার মত কাঠ জোগাড় হয়ে গেল।

রানার সঙ্গে আলাপ সেরে জরুরি কিছু নির্দেশ দিল তানামুরা।

ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই।

পরের বিশ মিনিটে ক্যাম্পের চারপাশে পেতে রাখা হলো ইনসেনডিয়ারি বোমা, মোশন ডিটেক্টর, অসিপিটাল লেসার ও র‍্যাণ্ডম ইন্ট্রুডার স্ক্যানার।

কাজ তদারকি শেষ করে বৃদ্ধ প্রফেসরের পাশে এসে বসল রানা। খেয়াল করল, ভারী, কাঁপা-কাঁপা শ্বাস ফেলছেন তিনি। চট্ করে তাঁর বাম হাতের কবজির ধমনি চেপে পালস দেখল। সমতল ক্যাম্পের মাঝে রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে জিনা, বার-বার দেখছে চারপাশ।

রানার ধারণা: আবছা আলোয় দানবটা হামলা করলে দশ ফুট আসার আগেই তার বুকে গুলি করতে পারবে জিনা। ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে আবারও প্রফেসরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ঠিক আছেন তো, ডক্টর?'

কাঁপা শ্বাস ফেলে রানার হাতে আলতো চাপড় দিলেন প্রফেসর। 'আমি ঠিক আছি, বাছা। সব প্রস্তুতি নিয়ে নাও। হাতে বেশি সময় পাবে না। কালকে নাস্তা লাগবে, তা নিয়ে ভেবো।'

'এখন মাছের ফাঁদ পাতার সময় নেই, তা ছাড়া একবেলা না খেলে কিছু হয় না।' সবার উপর থেকে ঘুরে এল রানার চোখ। নির্দেশ দিল, 'প্রথমে প্রেস্টনকে নিয়ে পাহারা দেবে, বাড! কারও জানা নেই ওটা কী করবে, কিন্তু ঠিকই বুঝবে আমরা আছি এখানে। এখন থেকে পাহারা দেয়ার সময় একা না থেকে জুটি তৈরি করে গার্ড দেব আমরা। অন্যরা তখন আগুনের পাশে ঘুমিয়ে নেবে। সবার পাশে থাকবে কক্ করা অস্ত্র।'

সড়াৎ আওয়াজে এমপি-৫-এর দীর্ঘ ম্যাগাযিন বের করল তানামুরা। ওটা পরীক্ষা করে আবারও ভরে নিল অস্ত্রে। জ্বলন্ত

চোখে জঙ্গল দেখে নিয়ে বলল, 'দুর্গের মত রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে সব সিকিউরিটি ডিভাইস থাকা সত্ত্বেও ওটাকে ঠেকাতে পারেনি গার্ডরা। হয়তো সফল হব না আমরাও। কিন্তু আশা করি, সবাই বৃষ্টির মত গুলি ছুঁড়লে সরাসরি হামলা করতে পারবে না।'

'এই খোলা জায়গায় বাড়তি সুযোগ পাব,' বলল প্রেস্টন। 'এ সুবিধা ওসব কম্পাউণ্ডে ছিল না। আমরা ওটাকে আসতে দেখব। আর প্রথম হামলার সময় অনায়াসেই ওটাকে টার্গেট করতে পারব। অবশ্য, প্রথম দু'চারটা গুলির পর ফুরিয়ে যাবে এই সুবিধা। তখন নতুন কোনও কৌশল ধরবে ওটা।' চারপাশ দেখল প্রেস্টন। 'আমাদের উচিত প্রথম সুযোগেই ওটাকে শেষ করে দেয়া। নইলে গভীর রাতে কোনও ফন্দি বের করে ফের হামলা করবে।'

রানা টের পেল, হাঁটু স্পর্শ করল কেউ। ঘুরে না চেয়েও বুঝে গেল, পাশে হান্টার। ওটার ঘাড়ের রোম নেড়ে দিল ও। কিন্তু পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে রইল হান্টার। চারপাশ এক চক্কর কেটে এসেছে। এখন নিরাপদে রাখতে চাইছে বন্ধুকে।

রানা বুঝল, রাতে আর কোথাও যাবে না নেকড়ে।

সতেরো

'নিনা?' উত্তেজিত স্বরে ল্যাবোরেটরি ডিরেক্টরকে ডাকল টিপা মুই।

রিভলভিং চেয়ারে ঘুরে নিনা সয়্যার দেখল, অবাক চোখে

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ডিসপ্লে স্ক্রিন দেখছে নেপালি তরুণী। সাইটোসিন ও থাইমিনে মলিকিউলের জন্য ম্যাগনিফিকেশন পাওয়ার সেট করেছে চারভাগের তিনভাগ। নীল আলো দপ্-দপ্ করে জ্বলছে স্ক্রিনে। আধডজন ডায়াল নেড়ে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল টিপা মুই।

চেয়ার ছেড়ে ক্লিপবোর্ড হাতে ওর সামনে এসে থামল নিনা সয়্যার। 'কী হয়েছে, টিপা?'

'খেয়াল করুন,' পিছিয়ে বসল টিপা। 'ভুল না হয়ে থাকলে ওই ছাপে কোনও রেসিডিউ আছে। ইনডিজেনাস।'

ক্লিপবোর্ড নামিয়ে স্ক্রিন দেখল নিনা সয়্যার। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, জরুরি কিছু ধরেছে মাইক্রোস্কোপিক আকর্ষ। ইলেকট্রিক ব্যাকগ্রাউণ্ড নীল-ধূসর। নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল সে, 'ওটা কী?'

'সম্ভবত হিমোগ্লোবিন,' বলল টিপা, 'আয়ার্ন অ্যাটম আর কিছু প্রোটিন।'

'প্রোটিন?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'তোমার কেন মনে হচ্ছে এটা নিহতদের কারও রক্ত নয়?'

'তার কারণ আছে,' টিপা আবারও অ্যাডজাস্ট করল স্ক্রিন। দেখা গেল পর্দায়, একদল ইলেকট্রন ও প্রোটন। ডায়াল করে ফোকাস বাড়াতে আরও পরিষ্কার দেখা গেল ওগুলোকে।

নিনার মনে পড়ল, মস্ত এক বিজ্ঞানী বলেছিলেন: বিজ্ঞানের অন্য সব কিছুর মতই ঠিকভাবে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ চালানোও মস্ত শিল্প।'

কয়েক সেকেণ্ড পর আলাদা করে দেয়া হলো কয়েকটা অ্যাটম। ম্যাগনিফিকেশন বাড়াল টিপা এবং মাত্র পনেরো মিনিট পর নিনা দেখল, ডিএনএ-র চার্ট তৈরি করছে মেয়েটা।

অবাক চোখে ওদিকে চেয়ে রইল নিনা। কয়েক সেকেণ্ড পর

বলল, 'টিপা, মনে তো হচ্ছে ওটা মানুষের!'

'আমারও তা-ই ধারণা,' বলল টিপা। আবারও অ্যাডজাস্ট করল স্কোপ। 'আমি ইলেক্ট্রোফোরেসিস শুরু করলেই খেয়াল করবেন। এই সেগমেন্ট ম্যাগনেটাইয করব। যদি পযিটিভ বা নেগেটিভ ইলেকট্রনের কারণে মানুষের ডিএনএ-র মত পেঁচিয়ে না যায়, বুঝব...' কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল টিপা।

মাত্র কয়েক মিনিট পর পরিষ্কার বোঝা গেল তফাৎ।

'কিছুই তো ঘটছে না,' বলল নিনা সয়্যার।

'ঠিক। কিছুই ঘটছে না। অথচ ঘটবার কথা।'

অবাক চোখে ওই ডিএনএ দেখল ওরা দু'জন।

খুব সাবধানে ওখানে সামান্য পরিমাণে ফসফোরেসেন্ট ডাই ফেলল টিপা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আমি খুঁজে বের করতে চেয়েছি, ইলেক্ট্রোফোরেসিস-এর ব্যাপারে এই সেগমেন্ট অত প্রতিরোধী কেন। তখনই পেলাম হাইব্রিড সেগমেন্ট। ওই এনযাইম বার-বার ক্লোন করছে নিজেকে। এবং এতই দ্রুত, যেন ওগুলো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া। ধ্বংস করে দিচ্ছে অন্য সব। আসলে এই ডিএনএ-র যোগ্যতার একমাত্র খামতি হচ্ছে: সংখ্যায় এত নয় যে বার-বার মলিকিউলার পলিমারেস তৈরি করবে।'

স্ক্রিনের কাছে নাক নিয়ে গেছে নিনা সয়্যার। 'এ থেকে কী বুঝব, টিপা? আমার তো মাথা ঘুরছে!'

'বুঝবেন, এই জিনিস আসলে এখনও অসম্পূর্ণ, নইলে ক্লোন করা যেত। লাখে লাখে কোষ তৈরি হতো।'

চুপ করে বসে রইল নিনা, ভাবছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ধরে নিলাম তুমিই ঠিক। কিন্তু কাউকে কিছু বলার আগে প্রিলিমিনারি চেক করতে হবে। স্যানিটেশন প্রসিজার ঠিক ছিল তো? কন্ট্যামিনেটেড নয় তো এই জিনিস?'

'এখানে এসে নষ্ট হয়নি, তা বলতে পারি।'

'তুমি কি এ জিনিসের প্রিন্ট বের করতে পারবে?'

'হাসতে হাসতে। কিন্তু নষ্ট হতে পারে কয়েকটা স্যাম্পল। মেনে নিতে হবে এই ক্ষতিটা।'

'তা জানি,' ধীর কণ্ঠে বলল নিনা। 'তারপরেও প্রিন্ট বের করার মত অনেক থাকবে। আর এটা ছাড়া কোনও উপায়ও নেই আমাদের। তুমি যখন স্পেক্ট্রোগ্রাফে ওটা নামাবে, পড়ে দেখতে ডেকো আমাকে। বুঝতে পারছি, এরপর ছুটতে হবে ল্যাংলিতে।'

'ল্যাংলি?' ভুরু কুঁচকাল টিপা। 'ওখানে কেন?'

'কারণ এসবের শুরু ওরা করেছে,' বলল নিনা। 'আমাকে ফোন নাম্বার দিয়ে রেখেছে। সব জানতে চাইবে ওই ডক্টর।'

আবারও মাইক্রোস্কোপের দিকে ঘুরে গেল টিপা। 'ঠিক আছে। এক ঘণ্টা পর পেয়ে যাবেন আপনার রিপোর্ট।'

'আচ্ছা,' প্রায় ফিসফিস করল নিনা সয়্যার। আরেকবার দেখল স্ক্রিন। কুঁচকে গেল ভুরু। 'তা হলে এই সেই রহস্যমানব। জানি না কেন, কিন্তু খুব ভয় লাগছে আমার।'

আঠারো

সমতল জায়গার মাঝে কোলে স্নাইপিং রাইফেল হাতে খুব সতর্ক জিনা উইলসন। দূর থেকে প্রচণ্ড শক্তিশালী অস্ত্রটা দেখল রানা। ওটার একেকটা বুলেট দৈর্ঘ্যে পুরো ছয় ইঞ্চি। ওই মেয়ে কীভাবে সহ্য করবে রাইফেলের রিকয়েল, তা অন্য প্রসঙ্গ। পুরো দু'হাজার গজ দূরের টার্গেটে নিখুঁতভাবে লাগবে বুলেট। গুণ রাইফেল বা

বুলেটের তাও বলা যাবে না। কে কীভাবে গুলি করল, তার উপর নির্ভর করবে লক্ষ্যভেদ হলো কি না। মনে পড়ল রানার, জরুরি প্রয়োজনে স্নাইপিং শিখেছিল। এই মিশনে ওর কাজ অন্য, ট্র্যাক করা এবং নেতৃত্ব দেয়া। অবশ্য, প্রয়োজনে জিনার কাছ থেকে ব্যারেট রাইফেল নিয়ে চেষ্টা করবে লক্ষ্যভেদ করতে।

পাশাপাশি ট্র্যাকিং করতে গিয়ে জিনার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মেছে ওর। মাথা-মোটা মেয়ে নয়। ধৈর্যেরও শেষ নেই। ভাল করেই বোঝে নিজ দায়িত্ব। যদিও কখনও কখনও বাধ্য হয়ে ওর ধারণার বিপরীতে মতামত দিতে হয়েছে রানাকে। আর সেসব সময়ে অনর্থক তর্ক না করে ভুলটা বুঝে নতুন কিছু শিখে নিয়েছে জিনা। এরই মাঝে সঙ্গীকে লক্ষ করে পাল্টে নিয়েছে নিজের বহু আচরণ। রানার ধারণা: কিছু দিন শেখালে আমেরিকান আর্মির কথিত দক্ষ ট্র্যাকারদের চেয়ে ঢের বড় ট্র্যাকার হবে জিনা। পিছনে ফেলে আসা ওসব বিধ্বস্ত, রক্তাক্ত রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে দানবটার কাছে সহজেই হার মেনে নিয়েছে লোকগুলো, তার মূল কারণ: কাজ না করলেও সরকারী চাকরি থাকবে তাদের।

অন্য চিন্তা এল রানার মনে: ওই জানোয়ার বা দানব হয়তো হারিয়ে দেবে ওকে। আগেও কয়েকবার বোকা বানিয়ে দিয়েছে ববক্যাট। কোনও চিহ্ন না রেখেই উধাও হয়েছে। কিন্তু ওই প্রকাণ্ড জন্তুর মত কিছু কখনও ওর চোখ এড়াতে পারেনি।

পায়ে ভারী প্যাডওয়ালা হালকা ববক্যাটের তুলনায় কুগার, বাঘ বা সিংহকে ট্র্যাক করা অনেক সহজ। কিন্তু এবার যার পিছু নিয়েছে, সে পায়ের ছাপ রাখছে না বললেই চলে। ব্যবহার করছে সবচেয়ে কঠিন সব জমি। বলতে গেলে, বুঝতেই দিচ্ছে না কখন বা কোথায় হামলা করবে।

আবারও জিনার দিকে চাইল রানা।

চট্ করে কালচে-সোনালি চুল পনি টেইল বেঁধে আবারও

কাঁধে রাইফেল তুলে নিল মেয়েটা। চাইল ওদের সীমানার দিকে। আবারও নিষ্কম্প হাত। তখনই চট্ করে ঘুরে একবার রানাকে দেখল জিনা। চোখের পলক পড়ল না। শুকনো মুখে হাসি নেই।

ভুরু কুঁচকে বৃদ্ধ প্রফেসরকে দেখল রানা। শুয়ে পড়বার আগে তাঁকে দিয়েছে আজ সকালে ভেজে রাখা বড় একটা ট্রাউট মাছ। যথেষ্ট এনার্জি লাগবে বয়স্ক মানুষটার। সেজন্যেই আরও দিয়েছে গরুর জার্কি আর চর্বি ভরা পেমিক্যান। শেষের জিনিসটা এই পরিবেশে বহু দিন ঠিক থাকে। এ কাজ হাতে নেয়ার পর ভুল করেনি সঙ্গে আনতে।

রানার ধারণা, পেট পুরে খাওয়ার পর আগের চেয়ে সুস্থ বোধ করছেন সিরাজউদ্দীন। যদিও মুখ ফ্যাকাসে। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। কিন্তু তা অস্বাভাবিক নয়। একদিনে অনেক পথ হাঁটতে হয়েছে তাঁকে।

পাশেই তাঁবুতে শুয়ে আছেন প্রফেসর।

'আরেকটু পানি দেব?' জানতে চাইল রানা, 'এসব উঁচু এলাকায় চট্ করে ধরে বসে ডিহাইড্রেশন।'

'তাই শুনেছি,' মৃদু হাসলেন তিনি। পাশ থেকে ক্যান্টিন তুলে দুই ঢোক পানি খেয়ে নামিয়ে রাখলেন। 'আজকের দিনটা মনে থাকবে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমার কি মনে হয়, রানা, আজ রাতে হামলা করবে ওটা?'

'এখনও জানি না,' মাথা নাড়ল রানা।

'তোমার অন্তর কী বলে, বাছা?'

সমতল এলাকার সীমানা দেখল রানা।

অস্ত্র হাতে সবাই তৈরি।

'হয়তো হামলা করবে। আসলে বোঝা খুব কঠিন কী করবে। আমার চেনা কোনও জন্তুর সঙ্গে মিল নেই। তবে...

ঠিক তখনই কানের কাছে বজ্রপাতের আওয়াজের মত 'বুম!'

করে উঠল বাড রলিন্সের শটগান।

জঙ্গলের দক্ষিণ দিকের গাছের সারি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে বীভৎস চেহারার প্রকাণ্ড এক কালো দানব, যেন স্বয়ং যম। এক সেকেণ্ড পর একইসঙ্গে গর্জে উঠল ছয়জনের অস্ত্র। সামনে ছিটকাল কমলা আগুনের হলকা। গুলি শুরু করে চট্ করে দলের মাঝে তাকাল রানা। সবশেষে ফায়ার করল জিনা। গগনভেদী আওয়াজ তুলল ব্যারেট রাইফেল। ওটার মুখ থেকে বেরোল পাঁচ ফুটি লকলকে লাল শিখা। যে ভয়ানক কনকাশন হলো, তাতে মনে হলো অন্য সব অস্ত্র শিশু।

গুলি করতে করতে দানবটাকে দেখল রানা। দৌড়ে এসে হামলা করতে গিয়ে ব্যারেটের বুলেটের আঘাতে হোঁচট খেয়ে থেমে গেছে ওটা। এক হাতে চেপে ধরেছে ঘাড়। আবারও গুলি করল জিনা। দ্বিতীয় বুলেট লাগল দানবের বুকে। ছিটকে গিয়ে পড়ল পিছনের ঝোপে। তার আগেই শরীরে লেগেছে অন্তত পঞ্চাশটা গুলি।

ঝোপে পড়েই বিকট এক আহত গর্জন ছাড়ল ওটা। আরেক লাফে উঠে দাঁড়াল। বুকে বিঁধল আরও গোটা পঞ্চাশেক গুলি। একহাতে বুক, আরেক হাতে ঘাড় ধরে ঘুরে দাঁড়াল দানব, টলতে টলতে গিয়ে ঢুকল জঙ্গলে। আরও কয়েক সেকেণ্ড ওদিকে গুলি পাঠাল সবাই। তারপর গলা উঁচু করে নির্দেশ দিল রানা: 'সিয ফায়ার!'

কিন্তু ওই আদেশ ওকে দিতে হলো আরও কয়েকবার, তারপর থামল আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন।

হঠাৎ চারপাশ হয়ে গেল থমথমে।

সবার অস্ত্রের নলের মুখ থেকে চুইয়ে বেরোনো ধূসর ধোঁয়া ভাসছে কটুগন্ধী বাতাসে। রাইফেল বা বন্দুকের বুলেট ও কার্তুজের অসংখ্য পিতলের খোসা পড়ে আছে মাটিতে। এখনও

দূরের পাহাড় থেকে ধাক্কা খেয়ে ফিরছে দুর্বল প্রতিধ্বনি।

অন্যদের আগেই গুলি বন্ধ করেছে রানা। মারলিন রাইফেল থেকে বের করল খালি বুলেটের ছয়টা খোসা।

একইসঙ্গে পিছিয়ে এল ওরা সবাই।

খালি ম্যাগাযিন ফেলে রিলোড করতে শুরু করেছে অস্ত্র। কার্তুজ দিয়ে ভরে নেয়া হবে শটগানের চেম্বার।

'হায়, যিশু!' জঙ্গলের যেদিক থেকে এসেছিল দানব, ওদিকের গাছগুলো দেখল বাড রলিন্স। ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে অজস্র পাতা। 'আপনারা দেখেছেন ওটা কত বিশাল?' নিজের লঞ্চারে গ্রেনেড ভরে নিল সে। কাঁধে তুলে নিল অস্ত্র। ভীষণ নার্ভাস।

'অস্ত্র রিলোড করে পেরিমিটারে চোখ রাখো সবাই,' নির্দেশ দিল তানামুরা। নিজের খালি ম্যাগাযিন ফেলে নতুন ক্লিপ আটকে কাঁধে অস্ত্র তুলল।

রানার মনে হলো, সবার মাঝে সবচেয়ে শান্ত জিনা উইলসন। ম্যাগাযিন খুলে ভেস্ট থেকে নতুন ম্যাগাযিন নিয়ে রাইফেলে ভরল। হাত চলছে যন্ত্রের মত। একটা বুলেট দিল চেম্বারে। আবারও হয়ে উঠল সতর্ক। ওর চোখ যেন বরফের মত শীতল। স্টকে সংযুক্ত বাইপড ব্যবহার করে মাটিতে নিজের পাশে নামিয়ে রাখল রাইফেল।

ওই হামলা এবং পাল্টা হামলা ছিল মাত্র পনেরো সেকেণ্ডের। কিন্তু ওদের মনে হয়েছে পেরিয়ে গেছে কয়েক যুগ।

ব্যারেটের বুলেটের আঘাতে ঝোপে গিয়ে পড়েছিল দানবটা। কিন্তু আবারও উঠে এসেছে। তখন মনে হচ্ছিল, আহত হয়েছে ওটা। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। ওই রাইফেলের মাযল ফ্ল্যাশ আর তার পরের আঁধারে রক্ত দেখবার কথা নয় কারও।

রানা অবশ্য বুঝতে পেরেছে, দানবটা তেড়ে এলেও তাকে ঠেকিয়ে দিয়েছে শুধু জিনার রাইফেল। অন্যদের গুলিকে মোটেও

পাত্তা দেয়নি ওটা।

এখনও আগুনের দিকে পিছিয়ে আসছে তানামুরা। গুলির আওয়াজে ঝনঝন করছে সবার কান। গলা উঁচু করে বলল সে, 'যে কারণেই হোক, ছোট ক্যালিবারের অস্ত্রের বুলেট ওটাকে আহত করছে না! অবশ্য, গায়ে লাগলে ব্যথা পাচ্ছে! তাই মনে হচ্ছে, সবাই যদি একসঙ্গে গুলি করি, আবারও পিছিয়ে যাবে!'

অত নিশ্চিত নয় রানা। ভাল করেই বুঝেছে, দানবের ওই হামলাকে ঠেকিয়ে দিয়েছে একমাত্র জিনার ব্যারেট রাইফেল। মেয়েটা যদি লক্ষ্যভেদ করতে না পারে, জ্যাম হয় ওর রাইফেল, বা ঝাঁপিয়ে পড়ে জিনাকে মেরেই ফেলে দানবটা, সেক্ষেত্রে কোনও ভাবেই তাকে আহত করতে পারবে না ওরা, বা ঠেকাতেও পারবে না। আসলে সাধারণ গুলি দিয়ে আহত করা যাবে না ওটাকে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড চাই তার, যেমন করেছে রিসার্চ স্টেশনে, দেরি করেনি সবাইকে খুন করতে। রানা বুঝতে পেরেছে: না, অন্য কোনও কৌশল চাই ওদের। নইলে এই সমতল এলাকায় সারা রাত টিকবে না ওরা।

দেরি হয়ে যাওয়ায় এখন আর সাহায্য চাইতে পারবে না আর্মির কাছে। পাহাড়ি এলাকায় রাতে নামবে না হেলিকপ্টার। আর নামলেও খুঁজে বের করতে পারবে না ওদেরকে। রানার মন বলছে, ওই দানব যে মুহূর্তে বুঝবে বড় কোনও ক্ষতি হয়নি তার, আবারও হামলা করবে। তাকে অবাক করেছে ব্যারেট রাইফেল, জীবনে প্রথমবার টের পেয়েছে, মানুষের কোনও অস্ত্র ব্যথা দিতে পারে।

হালকা বুলেট ওটাকে ঠেকাবে না। কোনও কোনও জন্তুর স্কেলিটাল ডেনসিটি বা চামড়ার কমপোযিশন এমনই হয়। সাধারণ বুলেট আহত করে না। যেমন গ্রিজলি ভালুকের করোটি অনায়াসেই ঠেকিয়ে দেয় ৩০.০৬ ক্যালিবারের রাইফেলের গুলি।

অথচ ওই অস্ত্র ছোটখাটো কামান বললেও ভুল হবে না। বা ৩০.৩০ ক্যালিবারের অস্ত্রের চেয়ে হালকা বুলেট ভেদই করবে না গণ্ডারের চামড়া। এখানেও তা-ই হয়েছে। প্রকৃতি এমন ক্ষমতা দিয়েছে ওই দানবকে, বেশিরভাগ রাইফেলের বুলেটে কিছুই হবে না তার চামড়া বা হাড়ের। ওই দানবকে ব্যথা দিতে চাইলে লাগবে আলট্রা-পাওয়ার্ড ব্যারেট বা ওটার মত কোনও স্নাইপিং রাইফেল।

অন্যদের উপর থেকে চোখ সরিয়ে প্রফেসরের দিকে চাইল রানা। ভেবেছিল অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে অসুস্থ হবেন তিনি। কিন্তু তা নয়, খুব শান্ত ভঙ্গিতে গাছগুলোর মাঝে তৈরি গর্ত দেখছেন। ঝোপঝাড় ভেঙে পালিয়ে গেছে দানবটা। নীরবে মুখ নেড়ে কী যেন বললেন বাঙালি প্রফেসর। তাঁর প্রথম কথা এল প্রায় ফিসফিস করে, 'আমরা এখানে টিকব না, রানা!' যেন নিজেকেই বললেন, 'ওটা চমকে গেছে বলে পিছিয়ে গেছে। কিন্তু আবারও আসবে। তখন বোকার মত হামলা না করে কোনও না কোনও কৌশল করবে। ভাল হতো ওটার মনোযোগ অন্য দিকে সরিয়ে দিতে পারলে। ...কিন্তু কী আছে আমাদের কাছে? আগুন ভয় পায় না, তো আর কী থাকতে পারে, যেটা দেখিয়ে সরিয়ে দেয়া যায়? কপ্টার এসে আমাদেরকে তুলে নেবে, সেজন্য অনেক সময় লাগবে।'

প্রফেসরকে দেখল রানা। সরু হয়ে গেল ওর চোখ। 'দেখছি, কী সরিয়ে রাখবে ওটাকে।' উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল ও। থামল তানামুরার সামনে। 'আমি জানি ওটাকে কীভাবে রাতে ঠেকাতে পারব। আমার কোনও ভুল হলে ধরিয়ে দেবেন।'

'বলুন?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড।

'চমকে দেয়ার সুযোগ ভাল করেই ব্যবহার করে ওটা,' বলল রানা। 'কিন্তু এখানে জঙ্গল থেকে ওটাকে আসতে দেখব আমরা।

তার মানে, আবারও গুলি করে তাড়িয়ে দিতে পারব।'

মাথা দোলাল তানামুরা।

'কিন্তু সারা রাত জ্বলবে না আগুন,' বলল রানা, 'তখন আঁধারে কিছুই দেখব না। আগেও ক্রেমোর আর ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করেছে আর্মি, ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এবার ওটার প্রতি পদক্ষেপে ওসব রাখব আমরা। এ ছাড়া, ব্যবহার করব নানান ধরনের ফাঁদ। ওগুলোতে আটকালে চিৎকার করে জঙ্গল মাথায় তুলবে, জেনে যাব ওটা কোথায়। আমরা গুলি শুরু করব। তবে, সব সেট করতে হবে মাত্র বিশ মিনিটের ভেতর।'

মাথা দোলাল তানামুরা। 'তাই করব আমরা।'

'বাড আর ওয়েস্ট জানে কী করতে হবে।'

চট্ করে জঙ্গল দেখে নিল তানামুরা। 'আপনার কথা মত ব্যবস্থা করতে হবে, নইলে মরব কেউ না কেউ।'

জঙ্গলে ক্ষিপ্র চিতার মত সাবলীল রানা। কোন্ প্রাণী কী করছে, সহজেই টের পায়। কে খুব কাছে, কে আছে দূরে, কোন্ ডাল খসে পড়ল আর কোন্ ডালটা ভেঙেছে জন্তু– এসব ভাল করেই বুঝবে। জঙ্গলে ঢুকে কাজ শুরু করে অবাক হলো রানা। মনে হলো, বোধহয় কেটে যাচ্ছে ওর অসুখের প্রভাব। তাই যদি হয়, এই কাজ সেরে সোজা যোগ দেবে বিসিআই-এ।

অন্যদের নিয়ে খুব সাবধানে কাজে নামল রানা। ব্যবহার করল বাউয়ি নাইফ। নানানদিকে রাখল কাটা ডাল ও সেসব ঘিরে রাখা তারকাঁটা।

ভারী সব গুঁড়ি জোগাড় করল বাড রলিন্স ও প্রেস্টন ওয়েস্ট।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ওদের সীমানা ঘিরে তৈরি হয়ে গেল নানান রকম ফাঁদ।

ঘর্মাক্ত শরীরে ক্যাম্পে ফিরল ওরা।

আগুনের পাশে বসল রানা। গরম করতে চাইল বরফ-ঠাণ্ডা, রক্তাক্ত আঙুল। অতিরিক্ত কাজ করতে গিয়ে সামান্য আহত। কিন্তু এখন এসব দেখবার সময় নেই। ঝর্নার পানিতে ধুয়ে নিল হাত। মাছের জন্যে পেতে রাখল কয়েকটা ফাঁদ। তেমন নিখুঁত হলো না। তবে আজ রাতটা কাটিয়ে যদি বেঁচে থাকে, ঠিকই পাবে খাবার। ও বুঝে গেছে, তাজা খাবার দিতে হবে প্রফেসরকে, নইলে আরও দুর্বল হয়ে পড়বেন মানুষটা। একবার ওর মনে হলো, খুব ভাল করতেন তিনি এই অভিযানে যোগ না দিলে।

'আপনার কাজ শেষ হলো, কমাণ্ডার রানা?' জানতে চাইল তানামুরা।

মাথা দোলাল রানা। 'আপাতত।'

'ভাল। এবার বুঝব ফাঁদের কোন্ দিক থেকে আসছে। হয়তো খুন করতে পারব না, কিন্তু সবাই মিলে হয়তো গুলি করে তাড়িয়ে দিতে পারব।'

'হয়তো,' বলল রানা, 'খুব খেপলে কিছুই পাত্তা না দিয়ে হামলা করবে।'

চুপ হয়ে গেল তানামুরা।

আজই হয়তো ওদের জীবনের শেষ রাত।

জাপানির পিঠের কাটানা দেখে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আপত্তি না থাকলে বলবেন, কেন সঙ্গে করে তলোয়ার রাখেন?'

মৃদু হাসল তানামুরা। 'জানেন, আপনিই ওটার ব্যাপারে প্রথম মানুষ, যিনি কিছু জানতে চাইলেন।'

'বিরক্ত করতে চাইনি,' বলল রানা।

অন্তর থেকে হাসল তানামুরা। সাবধানে খাপ থেকে বের করল তলোয়ার। ওটার ফলা পুরো চল্লিশ ইঞ্চি। দুনিয়ার সেরা ইস্পাতে তৈরি। দেখাল রানাকে। ঝকঝকে ক্ষুরের মত ফলা।

অপূর্ব সুন্দর। যে কারিগর তৈরি করেছে, তুলনা নেই তার। আজকাল আর দেখা যায় না এত নিখুঁত জিনিস।

'এই তলোয়ার আমার বাবার,' বলল তানামুরা, 'তার আগে ছিল আমার দাদার। চিনাদের সঙ্গে লড়াইয়ে মারা যান তিনি। তার আগে ছিল তাঁর বাবার। তার আগে তাঁর বাবার ছিল। তিনিও যুদ্ধে মারা যান। এই তলোয়ারের বয়স চার শ' বছর।' তিক্ত হাসল। 'আপনি জানতে চেয়েছেন, এটা কেন আমার সঙ্গে... কারণ, আমি জন্ম নিয়েছি লড়াকু পরিবারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এটাকে ব্যবহার করিনি যুদ্ধে। কখনও হয়তো কাজে আসবে। তবে এই তলোয়ারের কাছ থেকে কিছুই আশা করি না আমি।'

তানামুরার চোখে চাইল রানা। 'কিছুই আশা করেন না?'

'না, কিছুই না। জীবন থেকে কিছুই পাওয়ার নেই আমার। আবার কামনা করি মৃত্যু, তাও নয়। আমি শুধু চাই, যেন বীরের মত লড়াই করে মরতে পারি। জীবন বা মৃত্যু আসলে একই নদী। প্রতি মুহূর্তে বইছে, কখনও স্থির হবে না তার পানি। পৃথিবীর সবই এমন। তলোয়ার হাতে লড়াই করে মরতে পারলে সন্তুষ্ট থাকব। আপনি বোধহয় বুঝবেন না কী বলতে চেয়েছি।'

জাপানির চোখে চোখ রাখল রানা, কিছুই বলল না।

বাহুতে তলোয়ারের ফলা স্পর্শ করল তানামুরা। রক্তের সরু একটা লাল রেখা তৈরি হলো হাতে। পরক্ষণে সড়াৎ আওয়াজে তলোয়ার রেখে দিল খাপে। 'কমাণ্ডার, রক্ত না ঝরালে কখনও বের করা উচিত নয় তলোয়ার।'

'হয়তো তা-ই,' বলল রানা।

আর তখনই জোরালো 'টোয়াং!' আওয়াজ এল জঙ্গল থেকে।

ওদিকের কোনও ফাঁদে পা দিয়েছে দানব!

ঘুরে চাইল সবাই।

দেরি না করে ওদিকের ঝোপ লক্ষ্য করে গুলি শুরু করল ওরা। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড পর গুলি বন্ধ করতে নির্দেশ দিল রানা। কেউ জানে না, ওটা এখনও ওদিকে আছে কি না। গুলিবর্ষণে কালা হয়ে গেছে ওরা।

নিজের পুরো মনোযোগ একত্র করল রানা। দানবের পায়ের আওয়াজের জন্য কান পেতে অপেক্ষা করছে, তা নয়। জঙ্গল জানাবে অনেক শব্দ। তিন সেকেণ্ড পর বলল রানা, 'দক্ষিণ দিকে সরছে ওটা। আগেরবার ওদিক থেকেই এসেছিল।'

'তা হলে হাতে অস্ত্র তুলে নাও সবাই,' হাঁক ছাড়ল তানামুরা।

আবারও দেখা দিল জানোয়ারটা, সিমিয়ান মাংসপেশির কারণে একটু ভাঁজ হয়েছে ভারী পা। অবিশ্বাস্য পুরু দুই প্রকাণ্ড কাঁধ দেখে মনে হলো ঠেলে ফেলে দিতে পারবে আস্ত হাতি। বেরিয়ে এসেছে এবড়োখেবড়ো বড় সাদা দাঁত। বোঝা গেল ওই জিনিস দিয়ে ছিঁড়তে চায় শত্রুকে। এক সেকেণ্ড ভাবল রানা, কেমন ভয় পেয়েছিল সিকিয়োর কম্পাউণ্ডে সৈনিক বা বিজ্ঞানীরা! পালাতে শুরু করেছিল সবাই!

এক সেকেণ্ড পেরোবার আগেই গুলি করল রানা।

৪৫.৭০ ক্যালিবারের গুলি সরাসরি লাগল দানবের বুকে।

বিকট গর্জন ছাড়ল ওটা।

পরক্ষণে এম-৭৯ গ্রেনেড ছুঁড়ল বাড রলিন্স। কিন্তু মিস করল, একপাশের গাছে লেগে ছিটকে উঠল কাঁচা কাঠের চলটা।

চমকে গেছে ওটা। থরথর করে কেঁপে উঠেছে কনকাশনে। ভয় পেয়ে আবারও ঘুরে গিয়ে ঢুকল জঙ্গলে।

নতুন করে রিলোড করছে সবাই।

রানা দেখল, ওর কাছে আছে মাত্র বিশটা বুলেট। পাউচে আরও দশটা। আগে ভাবতে পারেনি, ওটাকে মারতে পারবে না, বা হামলা ঠেকাতে গেলে খরচ করতে হবে অতিরিক্ত গুলি। চট্

করে জিনার দিকে চাইল রানা। বুকের ব্যাণ্ডোলিয়ার থেকে নতুন করে রিলোড করছে সে .৫০ ক্যালিবারের গুলি।

নিঝুম এই রাত হয়ে উঠেছে ভীষণ আতঙ্কের।

হুঁশিয়ার থাকল ওরা।

বার-বার জঙ্গলের মাঝে শুনল নানান ফাঁদ ও ইলেকট্রনিক ধ্বনি। কখনও ফাঁদে পা রাখল ওটা। প্রতিবার অন্ধের মত জঙ্গলে এম-৭৯ গ্রেনেড ছুঁড়ল বাড রলিন্স। আগুন জ্বলে উঠল নানান গাছে।

আর এসব করতে গিয়ে ভোরে দেখা গেল, ভেঙে পড়েছে চারপাশের বেশিরভাগ গাছ। যে জঙ্গল দেখে এখানে থেমেছিল ওরা, তা আর নেই। পরিষ্কার দেখা গেল এক শ' গজ দূরের সব।

বাড রলিন্সকে নিয়ে সাবধানে জঙ্গলে ঢুকল রানা। ঘুরে দেখল ওদের সীমানা। দানবটা আহত হয়ে থাকলেও তেমন কোনও আলামত দেখা গেল না। তছনছ হয়ে গেছে এদিকের বেশিরভাগ গাছ। ফিরে এসে তানামুরাকে বলল রানা, 'এবার ক্যাম্প ভেঙে রওনা হতে হবে।'

ওর দিকে চাইল বাড রলিন্স। 'কমাণ্ডার, খারাপ খবর আছে।'

'তা কী?' জানতে চাইল রানা।

বড় করে দম নিল রলিন্স, 'ফুরিয়ে এসেছে সবার অ্যামো। আবার এলে ঠেকাতে পারব না। যা আছে, তাতে চলবে বড়জোর এক ঘণ্টা। এখন আর্মির কাছে সাহায্য না চাইলে...'

মাথা নাড়ল তানামুরা, মুখ কালো। 'রেডিয়ো কাজ করছে না। ওটা মেরামত করতে চাইছে ওয়েস্ট।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। চট্ করে ওর মোবাইল স্যাটালাইট ফোন বের করল। না, কোনও সিগনাল নেই।

ওর দেখাদেখি যার যার ফোন বের করে পরীক্ষা করল

সবাই। কারও সেটে সিগনাল নেই।

'আমাকে বলা হয়েছিল, আমাদের ফোন বা রেডিয়োর সিগনাল সব সময় চালু থাকবে, সেদিকটা দেখবে আর্মি,' বলল তানামুরা।

দুশ্চিন্তা চেপে ধরল রানাকে। 'তার মানে কাছের কোনও শহর বা রিসর্ট সেন্টারের যোগাযোগ করতে পারব না।'

মাটিতে বিছিয়ে ম্যাপ দেখছে বাড রলিন্স।

তিরিশ মিনিট পর পাথুরে কর্নার পাশে রেখে রওনা হয়ে গেল ওরা। বুটের মধ্যে কষ্ট দিচ্ছে রক্তাক্ত পায়ের জ্বলন্ত কড়া ও পানিভরা ফোস্কা। কিন্তু থামবার উপায় নেই। সবচেয়ে কাছের জনপদ চল্লিশ মাইল দূরে। কিন্তু পাহাড়ি পথ, পেরোতে হবে কমপক্ষে এক শ' মাইল।

সবার চোখে-মুখে ক্লান্তি দেখছে রানা। কিন্তু কিছুই করতে পারবে না। ভাল করেই জানে, বাড়তি কোনও ওজন না নিলে দিনে পেরিয়ে যেতে পারবে এক শ' মাইল হেঁটে। কিন্তু সবাইকে রেখে চলে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। এমনিতেই আজ ওরা পেরোতে পারবে না এই এলাকা। রাতে যে-কোনও সময়ে হামলা করবে ওই জন্তু। সবাইকে নিয়ে কীভাবে এই বিপদ থেকে বাঁচবে, তা নিয়ে রীতিমত ভাবছে রানা।

বিকেলে সবার পা রক্তাক্ত করে দেয়া খাড়া এক এলাকা পেরোতে গিয়ে চারপাশে চোখ রাখল রানা।

পেয়েও গেল লুকানোর মত জায়গা।

'তানামুরা,' ডাকল রানা।

রাগী চোখে ওকে দেখল জাপানি যোদ্ধা, 'কী বলবেন, কমান্ডার?'

'আমরা দশ মাইলও পেরোতে পারিনি। আর হাঁটতে পারবেন না প্রফেসর। কপ্টার ডেকে আনব, তাও সম্ভব নয় নষ্ট রেডিয়োর

কারণে। কাজেই রাতে কোথাও আশ্রয় নিতে হবে।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল তানামুরা, বুঝতে পারছে, একটা কথাও মিথ্যা বলেনি বাঙালি লোকটা।

ট্র্যাকিঙের কাজে ব্যস্ত ছিল রানা, দলের সবার দায়িত্বে ছিল তানামুরা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সবাইকে নিরাপদে রাখার যোগ্যতা তার নেই। আসলে কারোরই নেই। মাটির দিকে চাইল তানামুরা। মাথা দোলাল আস্তে করে।

'রাতে থাকার মত ব্যবস্থা হবে,' বলল রানা। আঙুল তুলে দেখাল ছোট এক গুহা। ওটা পাহাড়ের একটু উপরে। 'মুখটা সরু, কিন্তু ভেতরে সবাই এঁটে গেলে অপেক্ষা করব। সবার কাছে যা গুলি আছে, তাতে একটা রাত ঠেকিয়ে রাখতে পারব ওটাকে। বাড রলিন্স বলেছে, ওর কাছে এখনও দুটো গ্রেনেড আছে। ওয়েইলারের আছে কিছু বুলেট। আর জিনা চমকে দিতে পারবে ওটাকে।' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা, 'এ ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

তানামুরা বলল, 'হ্যাট। আসলেই আর কিছু করার নেই।'

জড়সড় হয়ে এঁটে গেল ওরা ছোট্ট গুহায়। সামান্য কিছু খাবার গরম করে খেয়ে নিল। ঠিক হলো, একে একে পাহারা দেবে ওরা ব্যারেট রাইফেল হাতে। নিজের খাবার শেষ করে ওটা বুঝে নিল জিনা। ওই ছোট কামানটাই এখন ওদের একমাত্র ভরসা।

একটু পর আকাশ জুড়ে নামল কুচকুচে কালো আঁধার।

গুহার পিছনে মোটা দড়ি দিয়ে হান্টারকে বেঁধে রাখল রানা। গত রাতের পর দানবটাকে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে নেকড়ে। অথচ এখন বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে চলবে না।

বেশিক্ষণ লাগল না, নীরব পরিবেশে পায়ের আওয়াজ শুনল ওরা।

থপ্-থপ্!

ওদের দিকে আসছে কেউ ভারী পায়ে।

'অবিশ্বাস্য যে অনুসরণ করছে ওটা,' নিচু স্বরে বলল রানা।

জমাট কালো কিছু এসে থেমে গেল গুহার পঞ্চাশ ফুট দূরে।

চুপচাপ ধৈর্য ধরল রানা। উতে ইণ্ডিয়ান চিফ শিখিয়েছে কীভাবে অপেক্ষা করতে হবে। কালো ওই অংশের দিকে চেয়ে রইল রানা। ওর মনে হলো পেরিয়ে গেল দশ যুগ। তারপর এক ইঞ্চি নড়ে উঠল কালো ওই জমাট আঁধার, তারপর এগোতে লাগল।

আঁধারে ওই দূরত্বে গুলি লাগাতে পারবে রানা। নিচু স্বরে জিনাকে বলল, 'তোমার ব্যারেট দাও।'

জিনার হাত থেকে রাইফেল নিয়ে ছায়ার ঠিক মাঝে তাক করল রানা। আটকে ফেলেছে দম। বুক ভরা বাতাস ধীরে ছাড়তে শুরু করে খুব ধীরে স্পর্শ করল ট্রিগার।

বদ্ধ, ছোট্ট গুহায় বজ্রপাতের মত বিকট আওয়াজ তুলল রাইফেল। একই সময়ে আহত হয়ে বাইরে গর্জে উঠল কী যেন। ঘড়-ঘড় আওয়াজ ছেড়ে তেড়ে এল গুহা-মুখের দিকে। আর তখনই গুলি শুরু করল সবাই। দেরি না করে রাইফেল ফিরিয়ে নিয়েছে জিনা। তাতে ব্যয় হয়েছে কয়েক সেকেণ্ড। নইলে হয়তো এত কম রেঞ্জে দানবটাকে ফেলে দিতে পারত রানা।

আঁধারে মিস করল জিনা। অন্য রাইফেলের গুলি লাগছে ঠিক, কিন্তু রানা বুঝে গেছে, এখন যে-কোনও সময়ে গুহায় ঢুকে পড়বে দানব।

হাত থেকে মারলিন রাইফেল ছেড়ে দিল রানা, ঘুরেই মেঝে থেকে বাড রলিন্সের রাকস্যাক তুলে তাঁবু থেকে ছিঁড়ে নিল সাদা মশারী। চিৎকার করে বলল, 'সিয ফায়ার!'

এক লাফে গুহা-মুখে পৌঁছে গেল। দু'পাশের এবড়োখেবড়ো

পাথরে জড়িয়ে দিল নেটিং। এর মাত্র তিন সেকেণ্ড পর ভীষণ গনগনে রাগ নিয়ে হাজির হলো দানব। রক্তিম চোখ থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে একরাশ ঘৃণা। থেমে গেল রানার ঠিক তিন ফুট সামনে। উঁচু করে দোলাতে শুরু করেছে প্রকাণ্ড দুই কালচে-ধূসর হাত। পাশের চকমকি পাথরের দেয়ালে ক্রিচ-ক্রিচ আওয়াজ তুলল নখ। তার আওতা থেকে দূরে সরল না রানা। হাতে বাউয়ি ছোরা।

আপত্তিকর ঘড়-ঘড় আওয়াজ ছেড়ে সাদা নাইলনের কাপড় দেখল দানবটা। হাত বাড়িয়ে দিল, যেন ছিঁড়ে ফেলবে নেটিং। কিন্তু মশারীর কাছে হাত নিয়েও থমকে গেল। তার মন চাইছে ছিঁড়ে ফেলবে সব। কিন্তু ভীষণ কিছু আছে ওই কাপড়ে। হয়তো শেষ করে দেবে ওকে। হতাশ হয়ে বার কয়েক মাথা নাড়ল। লাল চোখে দেখল ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকা রানাকে।

মুহূর্তের জন্য রানার মনে হলো, ওটা আসলে কোনও মানুষ।

ভীষণ ঘৃণা নিয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে।

লাল চোখে চোখ রেখে পাল্টা চেয়ে রইল রানা।

মাঝে এখন মাত্র দেড় ফুট। মৃদু বাতাসে নড়ছে নাইলনের পাতলা কাপড়। পরস্পরের চোখে চেয়ে রইল ওরা। ভীষণ হতাশ হয়ে হাত মুঠো করল দানব। বাউয়ি নাইফ শক্ত হাতে ধরেছে রানা। পায়চারি শুরু করল দানবের পাশে। গুহার শুরুতে মুখোমুখি হয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাঁটছে ওরা, চোখে রাগ। যেন একে অপরকে শেষ করে দেবে সুযোগ পেলেই।

অবাক করে দেয়া বিরোধ নিষ্পত্তি চলছে।

একপাশে মানুষ মাসুদ রানা, অপর পাশে ভয়ঙ্কর এক দানব।

অথচ ওদের মাঝের বাধা পেরোতে পারবে যে-কোনও শিশু।

আরও কিছুক্ষণ পর বড় করে দম নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল দানব।

হতাশ, বিরক্ত বাঘের সাবলীল ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল গুহা ছেড়ে।

চুপ করে ওখানে দাঁড়িয়ে রইল রানা। টের পেল, মৃদু কাঁপছে ওর হাত, ফেলে দিতে পারবে না ছোরা। বড় করে দম নিল। আরও কয়েকবার শ্বাস নেয়ার পর ফিরল গুহার ভিতরের অংশে।

বিস্মিত বিস্ফারিত চোখে ওকে দেখছে ওরা।

কোনও প্রশ্ন তুলল না কেউ।

ভীষণ অবাক হয়েছে সবাই।

'এর কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারবেন, কমান্ডার?' ঢোক গিলে জানতে চাইল তানামুরা।

ওয়েইলারের দিকে চাইল রানা। 'গুহার মুখ পাহারা দাও। এবারের মত কাজ হয়েছে, কিন্তু পরের বার না-ও হতে পারে।'

ভেজা লাইমস্টোনের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল রানা। এতক্ষণে হাত থেকে শিথিল হলো বাউয়ি নাইফ। সাবধানে ওটা রাখল খাপে। ভিজিয়ে নিল শুকনো ঠোঁট। ক্যান্টিন থেকে এক ঢোক পানি খেয়ে নিয়ে কথা শুরু করল, 'তোমরা বোধহয় জানো বাঘ কীভাবে শিকার করতে হয়?'

মাথা নাড়ল তানামুরা।

'সাদা কাপড় ব্যবহার করে জঙ্গলের এক অংশে তৈরি করা হয় ইংরেজি অক্ষরের বড় একটা ভি। দু'পাশ বড়জোর দৈর্ঘ্যে আধ মাইল। শেষ মুখে সরু কোণ। ওই সাদা কাপড়ের উচ্চতা বড়জোর তিন ফুট। দূর থেকে হৈচৈ ও বিটার ব্যবহার করে সংকীর্ণ ভি'র ভেতর ঠেলে দেয়া হয় বাঘকে। কিন্তু ওই ফাঁদে পা দেয়া মানেই মৃত্যু।'

'কেন?' জানতে চাইল জিনা।

ক্লান্ত শোনাল রানার কণ্ঠ, 'কারণ, ছুটতে শুরু করে চল্লিশ ফুট লাফিয়ে পেরিয়ে যেতে পারে বাঘ, কিন্তু পেরোতে পারে না তিন ফুট উঁচু সাদা কাপড়ের বাধা। খুব ভয় তাতে বাঘের। আর

শিকারিরা অপেক্ষা করে কাপড়ের শেষমাথায়। অনায়াসেই কাপড় টপকে যেতে পারে বাঘ, কিন্তু ওদের মগজে তা খেলে না। আর ভি'র শেষে এসে খুন হয় শিকারির হাতে।'

বিস্ফারিত চোখে রানাকে দেখল জিনা। 'লাফিয়ে পেরিয়ে যায় না কেন?'

'কেউ জানে না কেন।'

অবাক চোখে রানাকে দেখল জিনা। 'আর আপনি ওই সাদা কাপড়ের ওপর ভরসা করে মুখোমুখি হয়েছেন ওটার?' বিস্মিত হয়ে মাথা নাড়ল ও।

'সবারই কোনও না কোনও দুর্বলতা থাকে।'

'আপনার সাহস দেখে অবাক না হয়ে পারছি না,' হাসল জিনা। 'এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় পড়েছেন কখনও?'

মৃদু হাসল রানা। 'কখনও কখনও।'

উনিশ

ধীরে ধীরে পেরিয়ে গেল দুঃস্বপ্নের রাত, এল ভোরের ধূসর আলো। গুহা থেকে বেরিয়ে ওরা দেখল, আবারও আঁধার হয়ে আসছে চারপাশ। আকাশে কালো কালির মত লেপ্টে আছে বজ্র-বৃষ্টির ঘন মেঘ। মাথার মাত্র কয়েক শ' ফুট উপরে বার-বার চমকে উঠছে নীলচে বিদ্যুৎ এই তপ্ত পরিবেশে তুষারপাত অকল্পনীয়। কিন্তু রানা বুঝল, একবার বৃষ্টি আরম্ভ হলে তার খারাপ প্রভাব পড়বে প্রফেসরের উপর। সারা রাত তাঁর শুশ্রূষা

করেছে জিনা।

সব গুছিয়ে নিয়ে দেরি না করে রওনা হয়ে গেল ওরা গন্তব্য লক্ষ্য করে। দুপুর পর্যন্ত ঠিক ভাবেই হাঁটতে পারলেন প্রফেসর, তারপর আরও খাড়া হয়ে উঠল সামনের পথ। তখন থেকে বার-বার থেমে বিশ্রাম নিলেন। রানা বুঝল, নিরাপদ কোথাও পৌঁছে যাওয়ার আগে আগামী রাত কাটাতে হবে বাইরে।

তার মানে, আবারও হামলা করবে ওই দানব।

ধীর গতি তুলে হেঁটে চলল ওরা। তারপর এক সময় ক্লান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়লেন প্রফেসর। ঘুরে দেখতে হলো না রানাকে, বুঝে গেল কী হয়েছে। সবার চলন-বলন এরই ভিতর চিনে নিয়েছে। ফিরে এসে প্রফেসরের পাশে থামল ও।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন বৃদ্ধ। কাঁপছে শ্বাস। বুকের কাছে নেমে এসেছে মাথা।

'একটু বিশ্রাম নিন,' বলে আস্তে করে বৃদ্ধকে মাটিতে শুইয়ে দিল রানা। হাতের ইশারা করল তানামুরার দিকে। দলের অন্যদের থেকে একটু দূরে সরে গেল ওরা দু'জন।

'বুঝতে পেরেছি,' বলল তানামুরা। 'আর এগোতে পারব না।'

জাপানি লড়াকুর কণ্ঠে ভয়ের ছাপ নেই। রানার মনে পড়ল তার কথা: 'জীবন থেকে কিছুই পাওয়ার নেই আমার।'

'উনি আর হাঁটতে পারবেন না,' বলল রানা, 'গতরাতের মত ওটাকে ঠেকাতে পারব, তাও ভাবছি না। ক্রমেই আরও চালাক হয়ে উঠছে। সবার গুলিও ফুরিয়ে এল প্রায়।'

চারপাশ দেখে নিয়ে বলল তানামুরা, 'প্রতিরোধ গড়তে চাইলে জায়গাটা খারাপ নয়।'

'হ্যাঁ, চারপাশে এক শ' গজ ফাঁকা জায়গা,' বলল রানা। 'কপাল ভাল হলে ঠেকাতেও পারব ব্যারেট দিয়ে।' চুপ হয়ে

গেল।

সত্যিই জায়গাটা ভাল। কিন্তু সমস্যা: এক শ' গজ পেরোতে ছয় সেকেণ্ড লাগে ওই দানবের। এত দ্রুতগামী কাউকে লক্ষ্যভেদ করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু চেষ্টা ছাড়া কিছুই করবার নেই ওদের।

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল তানামুরা, 'লড়াইটা ভয়ঙ্কর হবে।'

মাথা দোলাল রানা।

প্রফেসরকে সাবধানে তুলে সামান্য পানি খাইয়ে দিল রানা। ভূতের মত ফ্যাকাসে ধূসর হয়ে গেছেন মানুষটা। তিরতির করে কাঁপছে দু'হাত। নড়ছেন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে।

'এখন কেমন বোধ করছেন, ডক্টর?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা।

'ভাল, বাছা,' হাসলেন তিনি। 'রাতে ভাল ঘুমাতে পারলে দেখবে আগামীকাল তোমার আগে আগে দৌড় লাগাব।'

'তা-ই?' হাসল রানা। কু ডাকছে ওর মন। 'আপাতত বিশ্রাম নেবেন। কালকে দেখব কে কাকে দৌড়ে হারায়।' প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'একবার চারপাশ ঘুরে আসছি। আপনার দিকে খেয়াল থাকবে জিনার। কিছু লাগলে ওকে বললেই ব্যবস্থা করবে।'

মৃদু হেসে আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন প্রফেসর, 'রানা, তুমি কি জানো, ওই মিষ্টি মেয়েটা তোমার প্রেমে পড়েছে?'

'না তো!' অবাক হলো রানা। তারপর বলল, 'আপনি ইয়ং ম্যান, আপনাকে ডিঙিয়ে আমাকে পছন্দ? ঘোড়া ডিঙিয়ে...'

'না, সিরিয়াস, রানা,' বললেন প্রফেসর, 'সারা রাত আমার সেবা করেছে। তখন দেখেছি বার-বার ওর চোখ গেছে তোমার ওপর। তুমি বোধহয় ঠকবে না ওকে বিয়ে করলে।'

'আমি না হয় ঠকলাম না, স্যার, কিন্তু ও যে ঠকবে না, তার নিশ্চয়তা দেবে কে?' উঠে দাঁড়িয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল

রানা। বুকে কেমন চাপা অভিমান। তা কেন, জানে না। আসলে ওর চিরকালের একাকী এই জীবনে এসব কথা শুনলে কেমন যেন গোলমাল হয়ে যেতে চায় সব।

তানমুরার সঙ্গে মিলে যে সীমানা স্থির করেছে, তা ঘুরে দেখল রানা। এক শ' গজ জায়গাটা প্রায় চতুর্ভুজ।

মাঝে ব্যারেট রাইফেল হাতে পাহারা দেবে জিনা। চোখে নাইট ভিশন গগলস। কানে 'উলফ ইয়ার' বা বিশেষ ডিভাইস, অ্যামপ্লিফাই করবে অতি ক্ষীণ সব আওয়াজ।

জ্বেলে দেয়া হয়েছে প্রকাণ্ড আগুন। ওদিকে পিঠ রেখে বৃত্ত তৈরি করেছে অন্যরা। দাঁড়িয়ে আছে তানমুরা, হাতে এমপি-৫।

ওর সামনে থামল রানা। 'এই জায়গার বাড়তি সুবিধা আছে, তানমুরা।'

'তাই?' আবেগহীন সুরে বলল জাপানি লড়াকু।

'বোধহয় ঠেকিয়ে দেয়া যাবে ওটার হামলা।'

বিস্ময় নিয়ে রানাকে দেখল তানমুরা। সরু হয়ে গেল চোখ। 'কী করে?'

'উল্টো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে হবে।'

বিস্ময় বাড়ল জাপানির। 'কীসের চ্যালেঞ্জ? আমরা আমাদের সাধ্য মত করেছি। তারপরেও হারতে বসেছি। আপনি আসলে কী বলতে চান তো...'

'ওটা জন্তু, তানমুরা,' বাধা দিয়ে বলল রানা, 'চিন্তা অন্যরকম। এই জঙ্গলের সেরা আলফা মেল ওটা। সবচেয়ে শক্তিশালী। জঙ্গলের সম্রাট। আমরা আছি তার এলাকায়। তা ভাল লাগছে না, কাজেই বুঝিয়ে দিচ্ছে, আমরা আসলে কিছুই নই।'

'আচ্ছা?' মাথা দোলাল তানমুরা।

'কিন্তু আমরা বুঝিয়ে দেব, আসলে জঙ্গলের সম্রাট সে নয়।

এই চ্যালেঞ্জ ঠেলে ফেলতে পারবে না চাইলেও।'

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল তানামুরা, 'আপনি আসলে কী বলতে চাইছেন, রানা?'

চারপাশের কালো জঙ্গল দেখাল রানা। 'আমি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলে নিজের সম্মান রাখতে গিয়ে সাড়া দেবে সে। আমি হব জঙ্গলের নতুন আলফা মেল। ভয়ঙ্কর ঘৃণা করবে আমাকে। আমার ভুল না হয়ে থাকলে ক্যাম্পের কথা ভুলে পিছু নেবে।'

'আপনি জঙ্গলে একা...'

'হ্যাঁ। তাড়া না করে উল্টো ওটাকেই সুযোগ দেব আমাকে ধাওয়া করতে। উল্টো ফাঁদে ফেলব। প্রথমে অবাক হবে, তারপর রেগে গিয়ে শুরু করবে ধাওয়া। ওকে নিয়ে যাব দক্ষিণে।'

মাথা নাড়ল তানামুরা। 'বোধহয় ঠিক হবে না। আঁধার জঙ্গলে ওটা ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে আপনাকে।'

হাঁটুর কাছে মোকাসিনের বাঁধন ঠিক করল রানা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বলল, 'চেষ্টা করবে, কিন্তু সফল না-ও হতে পারে। সত্যিই যদি বুলফ্রগের ডানা থাকত, লাফ দিয়ে দূরে পড়ার সময় পিছনে ব্যথা পেত না। ...সঙ্গে হান্টারকে নেব। ওর কারণে চট্ করে বুঝে যাব, আশপাশে কেউ আছে কি না। আমরা দু'জন ওটাকে সরিয়ে রাখব ভোর পর্যন্ত।'

'খুন হয়ে যাবেন, মিস্টার রানা। এত বড় ঝুঁকি নেয়া ঠিক নয়।'

'এই বিড়াল-ইঁদুর খেলা ছাড়া উপায়ও নেই। যদি ভোরে না ফিরি, দেরি না করে অন্যদের নিয়ে চলে যাবে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিশ মাইল দূরে। ইকিমা ক্রিক ধরে পাঁচ মাইল গেলে পেরোতে পারবে ঝর্না। আরও পাঁচ মাইল পর পড়বে রিসার্চ স্টেশন। ছয় ঘণ্টা চললে ওখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা।'

'প্রফেসর এত হাঁটতে পারবেন না।'

'একটা স্ট্রেচার তৈরি করে বয়ে নেবে।' কাঁধ থেকে প্যাক নামিয়ে ভিতরে দেখল রানা। পরখ করল কোমরের পুরু চামড়ার বেল্ট। ওটা থেকে বের করল মুঠোয় আঁটে এমন এক খাটো ধাতব দণ্ড ও কয়েক ফুট তার।

'এগুলো দিয়ে কী হবে?' জানতে চাইল তানামুরা।

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'বাঁচার শেষ চেষ্টা।' আবারও গুঁজে রাখল বেল্টে। কাঁধে ঝুলিয়ে নিল মারলিন রাইফেল। একবার দেখল প্রায় আঁধার জঙ্গল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'তা হলে শুরু হলো খেলা!'

নিচু স্বরে 'হান্টার!' বলে ডাক দিতেই তিন সেকেণ্ড পর ওর পাশে পৌঁছে গেল নেকড়ে।

'প্লিয, আরেকবার ভাবুন, মিস্টার রা...'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমরা যাকে শিকার করতে চাই, সে-ও কিন্তু শিকার করতে চাইছে আমাদেরকে।'

দ্রুতপায়ে জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল রানা।

বিশ

ঘন কালো মেঘ ও নৈঃশব্দ্য ভরা নিরানন্দ বিকেলে ডিগবার্ট পয়েন্ট রেস্টুরেন্টে ঢুকল ডেপুটি ইউ.এস. মার্শাল টম জেরাল্ড। অফ ডিউটি ও অন ডিউটি সরকারী এজেন্টদের কাছে এই সুস্বাদু খাবারের কম খরচের রেস্তোরাঁ প্রিয়। মালিক অবসরপ্রাপ্ত এক এফবিআই এজেন্ট। নাম হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। তার আরেকটা নাম:

পাথর ভাঙা।

পঁচিশ বছর আগে পেয়েছে ওই খ্যাতি। তখন ডেপুটি মার্শাল ছিল। আটকা পড়েছিল এক জ্বলন্ত বাড়ির ভেতর। দরজা ধসে যেতে কোথাও যাওয়ার ছিল না তার। সবাই জানত আগুনে পুড়ে মরছে হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। কিন্তু হলওয়ে থেকে দৌড় শুরু করে নতুন একটা বহির্গমন-পথ তৈরি করে নিল সে দেয়ালে। মাথার গুঁতো দিয়ে ইঁট-পাথর ভেদ করে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। পরবর্তী সময়ে তার ক্যারিয়ারে কাঁঠালের আঠার মত এঁটে বসেছিল ওই নাম।

ভিতরে পরিচিত কয়েকজনকে দেখে তাদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল টম জেরাল্ড। নানান আলাপ চলছে ঘরে। নতুন এই সরকার একেবারে শেষ করে দিচ্ছে আমেরিকার সব মান-সম্মান ইত্যাদি। ঘর পেরিয়ে কিচেনে ঢুকে টম জেরাল্ড দেখল, স্টেইনলেস-স্টিলের এক কাউন্টারের পিছনে ব্যস্ত *পাথর ভাঙা।* স্যাণ্ডউইচ তৈরি করবে বলে দুই হাতে কচাকচ কাটছে মিটবল ও লেটুস পাতা।

ধূসর হয়েছে ডিগবার্টের চুল, কিন্তু গত ত্রিশ বছরের ক্রুকাট চুলের ডিযাইন পাল্টে নেয়নি। তার ধারণা: অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে এভাবে চুল ছেঁটে রাখা খুবই যৌক্তিক। প্রকাণ্ড ষাঁড়ের পুরু কাঁধের মত তার দু'কাঁধ। গরিলা সদৃশ দানবীয় দু'হাত আর গাছের গুঁড়ির মত উরুর পেশি এখনও নিরেট পাথর। কিন্তু ধীরেসুস্থে সামনে বাড়ছে পেট।

টম জেরাল্ডকে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল তার। পরক্ষণে দু'ঠোঁট গিয়ে ঠেকল দু'কানের কাছে। পেটে গুঁজে রাখা কাপড়ে হাত মুছল। আরও চওড়া হলো হাসি। 'আরে, বাছা! আজকাল তোমাকে কী ধরনের কাজ দেয় ওরা? পেট চলছে কীসে?'

একটা মিটবল তুলে কামড় দিল জেরাল্ড। 'আগের মতই এর

পাছায় ওর পাছায় লাথি মেরে পেট চলছে।'

'ঠিক যেভাবে শিখিয়েছি, না কি?' হাসল ডিগবার্ট।

লোভী চোখে মিটবলের দিকে তাকাল জেরাল্ড। 'দারুণ তো! কে বানাল এই মাল? ...তুমি?'

'না, রাঁধার কাজ ক্যারিই করে। আমার বাচ্চা ক্যারি করা থেকে শুরু করে সবই চালিয়ে যাচ্ছে ওই বদমেজাজী বেটি ক্যারি। আমাকে বসিয়ে রেখেছে দারোয়ান হিসেবে।'

'ভদ্রমহিলা রাঁধেও বটে!' হাসল জেরাল্ড। 'আমি দারোয়ান হওয়ার সুযোগ পেলে খেয়ে সাফ করে দিতাম সব। ...তো রিটায়ারমেন্টের পর কেমন লাগছে, বস?'

'খারাপ না, বাছা, একবার অবসর পেলে আমার মত করে বড় অফিসারকে বলতে পারবে: ''ঢের শুনেছি তোর ধমক; আরে, শালা, এবার পারলে চুমু দে আমার লালচে পাছায়!'' এসব শুনে কিচ্ছু করতে পারবে না ওরা, উল্টো আবার পেনশনও দেবে। হিম শীতল প্রতিশোধ একেই বলে।' চেহারা সিরিয়াস হয়ে গেল তার। 'কিন্তু এসব জ্ঞান নিতে আসোনি তুমি, বাছা। ব্যাপারটা কী? নাকি সত্যিই বুড়োটাকে দেখতে এলে?'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল টম, বসে পড়ল সামনের টুলে। 'জরুরি জ্ঞান দরকার, বস।'

স্যাণ্ডউইচ তৈরি হয়ে যেতেই হাঁক ছাড়ল *পাথর ভাঙা*। 'অ্যাই, নিয়ে যাও!' ওয়েইটার জিনিসটা প্লেটে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর বলল, 'সিআইএ-র শালারা হাঙরের মত বিয়ার শেষ করে। বোধহয় অন্তরের মারাত্মক সব পাপ ভুলতেই। চলো, বাছা, বিয়ার শেষ হলো কি না দেখতে হবে। কাজ করতে করতে আলাপ করা যাক।'

তার পিছু নিল জেরাল্ড, চলেছে স্টোররুম লক্ষ্য করে।

'আসলে কী হয়েছে?' জানতে চাইল ডিগবার্ট।

'এখনও চারপাশের খবর রাখো?' স্টোররুমে ঢুকে বিয়ারের একটা কেসের উপর বসল জেরাল্ড।

পাশ থেকে চার কেস বিয়ার অনায়াসেই তুলে আরেক দিকে সরাল ডিগবার্ট। 'আসলে, বাছা, আগের মতই কান পেতে রেখেছি।'

'আলাস্কার কয়েকটা স্টেশনের ব্যাপারে কিছু শুনেছ? ওদিকে নাকি গোলমাল হয়েছে?'

আরও চার কেস বিয়ার সরিয়ে রাখল ডিগবার্ট। ধীরে ধীরে ঘুরে চাইল জেরাল্ডের চোখে। 'তা হলে ওরা ওই কাজটা তোমাকে দিয়েছে?'

মাথা দোলাল টম।

বিরক্ত হয়ে পেটের কাপড়ে হাত মুছল ডিগবার্ট। 'বেশি কিছু শুনিনি। মারা গেছে কয়েকজন সৈনিক। একেবারে যা-তা অবস্থা। ...সিআইএ-র শালাদের ভয়ে এবার বাংকারে বিয়ার রাখতে হবে!'

'খবরটা কি সিআইএ থেকে পেয়েছ?'

'না, বাছা। ভাবলে কীভাবে ওদেরকে বিশ্বাস করব? এত বড় গাধা কখনও ছিলাম না। ভেবেছিলাম ভাল করেই তোমাকে শেখাতে পেরেছি, তুমি দেখছি ভেঙে দিচ্ছ আমার মন! ওদের কাছ থেকে একটা আপেল কিনলেও আগে নিজের দু'পকেটে হাত রাখব। নইলে চুরি করবে সব।' গমগমে হাসি দিল সে। 'না, ওই খবর পেয়েছি আপটাউনের এক বন্ধুর কাছে। শুনেছি আর্মি বা মেরিন ওই কাজ নিয়েছে, অবশ্য জানি না পুরো কর্তৃত্ব কাদের। মেরিনরা খুব অসন্তুষ্ট। খুন হয়েছে ওদের অনেকে। কিন্তু মুখ খুলছে না কেউ। তার মানে, বুঝে নাও, ভিতরে বড় ধরনের গোলমাল আছে।'

টম জেরাল্ডকে দেখল ডিগবার্ট। নিজের ছেলের মত এই

যুবককে অন্তর থেকে পছন্দ করে। বেশ কয়েক বছর আগে রুকি ডেপুটি মার্শাল ছিল জেরাল্ড, তখন ট্রেনিং অফিসার ছিল সে নিজে। 'এর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী, বাছা? মিলিটারি অ্যাফেয়ার তোমার জুরিসডিকশনের বাইরে।'

কাঁধ ঝাঁকাল টম। 'ওখানে কী ঘটছে তা দেখতে বলা হয়েছে আমাকে, ডিগ। ওই ঝামেলা এখন আমার নিজের।'

'সিআইএ নিজেদের দোষে পোঁদে লাথ্ খেলে, তাতে তোমার কী?'

প্রিয় গুরুর চোখে নিষ্পলক চাইল জেরাল্ড। 'ওদের পাছার খবর বের করতে বলেছে আমাকে।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল ডিগবার্ট।

টম দেখল, আগের মতই শক্তপোক্ত রয়ে গেছে ওর প্রাক্তন বস। এখনও গর্দান জড়িয়ে ধরে মাটিতে ফেলে দিতে পারবে বড় ষাঁড়কে।

গলা নিচু করল ডিগবার্ট, 'তোমাকে ফাঁদে ফেলা হয়নি তো, বাছা? সিআইএ-র ভেতর শত্রু তৈরি করেছ?'

'না।' মাথা নাড়ল জেরাল্ড। 'গলা-ছেলা শকুন খেপে গেছে। ভাল করেই চেনো তাকে। মরে গেলেও নিজের লোককে ফাঁদে ফেলতে দেবে না। আমি আসলে বুঝতে পারছি না, কী ঘটছে। তবে একদল মেরিন খুন হতেই খেপে গেছে কয়েকজন সিনেটর।'

'কাজেই অফিশিয়াল লাইনে কাজ করতে পারবে না।'

'হ্যাঁ। বুড়ো রিগানের আমলের মতই, যা করার করতে হবে চুপচাপ।'

মাথা দোলাল ডিগবার্ট। 'বুঝেছি। আজ রাতে বাসায় এসো। দেখব কী করা যায়। আরেকটা কথা, ভুলেও বইয়ের গোয়েন্দাদের মত খোঁজ-খবর নিতে যেয়ো না। চুপ করে বসে থাকো লক্ষী ছেলের মত। মাথা থাকবে নিচু, মুখ একেবারে বন্ধ–

যেমন শিখিয়েছি। পরে কথা বলব তোমার সঙ্গে।'

উঠে দাঁড়াল টম জেরাল্ড। 'আমার ঋণ আরও বাড়ছে, ডিগ।'

চোখ টিপল *পাথর ভাঙা*। 'ঋণ অলওয়েয বাড়বে।'

মৃদু হেসে স্টোররুম থেকে বেরিয়ে এল টম জেরাল্ড।

'এ হতে পারে না!' ফিসফিস করল নিনা সয়্যার। সরু হয়ে গেছে দু'চোখ। আবারও দেখল ডিএনএ-র স্ট্র্যাণ্ডের প্রিন্টআউট। 'না, টিপা, এ কোনও ভাবেই হতে পারে না! আমরা কখনও এই জিনিস দেখিনি!'

মাথা দোলাল টিপা। 'জানি, কিন্তু চোখ মিথ্যা না। মেশিনও মিথ্যা বলে না।'

চুপ করে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ডিসপ্লে দেখছে ওরা।

'কন্ট্যামিনেটেড না হলে, এ সত্যিই অবিশ্বাস্য,' দশ পাতা সংখ্যা, গ্রাফ, ও তুলনামূলক চার্ট দেখছে নিনা। 'হায়, ঈশ্বর,' বিড়বিড় করল, 'ইনহিবিটরের ফাইব্রোনেকটিন আর টালিন দেখেছ? এ কী করে সম্ভব? এ তো ঠেকিয়ে দেবে যে-কোনও ইনফেকশন! বা দেখো অকল্পনীয় এপিনেফ্রিন! জীবনেও এ ফ্যাক্টর দেখিনি। ...জন্তুটা আসলে কী– মানুষ, দেবতা না দানব?'

'ওটার নিরানব্বুই পার্সেন্ট ডিএনএ হোমো সেপিয়েন্সের,' বলল টিপা। 'অন্য অংশ যে কী, জানেন শুধু ঈশ্বর! পিনের ডগায় থাকতে পারবে লাখে লাখে। আমাদের ডিএনএ ব্যাঙ্কে এ জিনিস নেই। কিন্তু রেসট্রিকটিভ এনযাইম আর রেট্রোঅ্যাকটিভ প্রোটিন অস্বাভাবিক শক্তি দিচ্ছে ইমিউন সিস্টেমকে। জানি না ওটা কী বা কীভাবে তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু মূল কথা: ওটা বাস্তব। এটাও জানি না কীভাবে ওটাকে ক্লাসিফাই করব।'

প্লাস্টারের ছাপ থেকে পাওয়া লেজওয়ালা আলোককণার ইমেজের দিকে চুপ করে চেয়ে রইল নিনা সয়্যার। চোখ সরাতে

পারছে না ছবি থেকে। কিছুক্ষণ পর শক্ত হয়ে গেল চোয়াল। মনে হলো রেগে গেছে। আড়ষ্ট স্বরে বলল, 'ঠিক আছে, বুঝলাম। সব রেকর্ড করো। তিনটে কপি করবে। জানোই তো কোথায় কোথায় পাঠাতে হবে। একটা নিয়ে যাব ল্যাংলির ল্যাবের জন্যে। ওদেরকে দেখাতে হবে, নইলে বিশ্বাস করবে না।' কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'নিজেই তো জানি না এসব বিশ্বাস করব কি না!'

একুশ

আঁধার গভীর অরণ্যে পাশে হান্টারকে নিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে মাসুদ রানা, খুব সতর্ক। খেয়াল করছে প্রতিটি ছায়া। ভাল করেই জানে, মাত্র শুরু হয়েছে আতঙ্কের দীর্ঘ রাত।

বিশ মিনিট পর প্রথমবারের মত টের পেল, বেশি দূরে নেই সেই দানব। বড়জোর ছয় শ' গজ উত্তরে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মাটিতে পড়ছে চাঁদের রুপালি আলো। বসে পড়ে চারপাশের জঙ্গল দেখল রানা, ফিসফিস করল, 'চল্, হান্টার!'

শিকার ধরবার সময় এই নির্দেশে অভ্যস্ত নেকড়ে।

উত্তর দিক লক্ষ্য করে ছুট লাগাল রানা, দানবটা বুঝবার আগেই কমিয়ে নিতে চাইছে মাঝের দূরত্ব।

ডানে মাঝারি এক বোল্ডার পেয়ে লাফিয়ে উঠল ওটার উপর, পরক্ষণে আরেক লাফে নেমে গেল উপরের ঢালে। মস্ত লাফে বোল্ডার টপকে রানার পাশে নিঃশব্দে নামল নেকড়ে।

ঝড়ের বেগে কোনাকুনিভাবে টিলা বেয়ে উঠছে ওরা।

আওয়াজ তুলছে না রানার মোকাসিন মোড়া পা। এক মিনিটে গিয়ে থামল চূড়ায়। মাত্র দশ ফুট নীচে গিরিখাদ। প্রস্থে বড়জোর দশ ফুট। ঘুরে পিছনে চাইল রানা, ধেয়ে আসছে দানবের মত একটা ছায়া। ইতস্তত করে থেমে দেখল চারপাশ।

চাঁদের ম্লান আলোয় দেখা গেল তার রাগী, লালচে চোখ। মাথা ঝাঁকি দিয়ে একবার এদিক, আবার ওদিক দেখছে। ব্যস্ত হয়ে খুঁজছে শত্রুকে। হয়তো রানার গায়ের গন্ধ পেয়ে জেনেছে, হাতের নাগালের খুব কাছে শিকার। এখন ভাবছে কোথায় গেল শত্রু!

রানা নিশ্চিত, নড়লেই ওকে দেখবে দানব। দু'সেকেণ্ড পর পিছিয়ে গেল কয়েক পা। চুলকে দিল হাণ্টারের কান। নেকড়ের জানা হয়ে গেল কী করবে বন্ধু।

গিরিখাদের দিকে দৌড় শুরু করল রানা, তারই মধ্যে চট্ করে দেখল পিছনে।

চোখের কোণে কাউকে নড়তে দেখে চরকির মত ঘুরে চেয়েছে জানোয়ারটা। মনে হলো গুলি খেয়েছে বুকে। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখল, মস্ত এক কালো নেকড়ের পাশে ছুটছে এক লোক। লাফিয়ে ভেসে উঠেছে, নেকড়ে নিয়ে নেমে গেল গিরিখাদের দিকে।

নিঃশব্দে গিরিসংকটে নামল রানা, পাশেই হাণ্টার। দৌড়ে চলেছে ধনুক থেকে ছোঁড়া তীরের মত। এখানে ওখানে রগের মত ফোলা গাছের পুরু সব শেকড় ও ছোটবড় বোল্ডার। হার্ডল্স্ রেসের মত ছুটে চলেছে ওরা। তারই মাঝে বার-বার থামছে রানা, ঠিক জায়গা বাছাই করে পেতে রাখছে নানান ফাঁদ। সামনে পড়ল টিলা বেয়ে নেমে যাওয়া এক বরফাচ্ছন্ন ঝর্না। তলা দিয়ে বইছে পানি। সামনের গাছের মোটা ডাল ধরে নিজেকে টেনে উপরে তুলল রানা। এক গাছ থেকে আরেক গাছে সরতে শুরু

করে চলে গেল কমপক্ষে এক শ' গজ, তারপর নামল মাটিতে।

সামনেই পাথুরে মস্ত এক সমতল চাতাল। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কমপক্ষে দু' শ' গজ। আদিম আমলে ওটাকে ক্ষুরের মত কেটে মসৃণ করেছে কোনও গ্লেসিয়ার। পরবর্তী সময়ে অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা বা ভূমিকম্পে পড়েছে অসংখ্য বোল্ডার। ওই পাথুরে চাতাল পেরোতে চাইলে যেতে হবে আঁকাবাঁকা, জটিল এক পথে। রওনা হয়ে গেল রানা। বার-বার সরল ট্রেইল থেকে। যেসব জায়গায় অ্যাম্বুশ হতে পারে, সেসব জায়গা এড়িয়ে গেল সাবধানে। ব্যয় করল পুরো দশ মিনিট, অন্তত বারোবার দ্রুত ছুটে চাতালে তৈরি করল নতুন সব ট্রেইল। কয়েকবার গেল জঙ্গলের কিনারায়। কাজ শেষ হলে ভাবল, ওদের গায়ের গন্ধ আর নতুন নতুন ট্রেইলের গোলকধাঁধায় বিভ্রান্ত হবে দানব, সহজ হবে না ওদেরকে খুঁজে বের করা। ঘর্মাক্ত দেহে এক জায়গায় থামল রানা, অবশ হয়ে আসছে দু'পা। কিন্তু মোটেও ক্লান্ত নয় হান্টার, খুব মজা পেয়েছে ছোটাছুটি করে।

'কী রে?' ভুরু নাচাল রানা, 'তুই লড়তে চাস, তা-ই না?' নেকড়ের মাথা চুলকে দিল। 'ভাবিস না, ওটা আলফা মেল না। তুই আসলে চিরকালের সেরা আলফা মেল।'

দু'মিনিট পর হিম শীতল, অগভীর এক ঝর্নায় নামল রানা। রওনা হয়ে গেল ভাটিতে। কিছু দূর যাওয়ার পর পেয়ে গেল পাড়ে বড় একটা গাছ। ওটা থেকে ঝর্নার দিকে এসেছে শক্তপোক্ত ডাল। কিন্তু হাতের আওতার বাইরে। কাছাকাছি গিয়ে বেল্ট থেকে স্টিলের টিউব ও টাইটেনিয়াম তার বের করল রানা। তখনই খেয়াল করল, মাথার তিন ফুট উপরে ভাঙা আরেকটা ডাল। ওটার নীচে পৌঁছে তারের ল্যাসো উপরে ছুঁড়ল রানা। ঠিক ভাবেই খাটো ডালে এঁটে বসল ওটা। ঝর্নার শীতল স্রোত কুলকুল করে বইছে ওর দু'পা ঘিরে।

টাইটেনিয়ামের তার বেয়ে উঠতে হবে উঁচু ডালে। কাজে নামতেই ধারালো তার কেটে বসতে চাইল হাতের দু'তালুতে। তীব্র ব্যথা পাত্তা দিল না রানা। উঠছে দু'বাহুর জোরে। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডে চেপে বসল ভাঙা, খাটো ডালে। একবার দেখল হাতের রক্তাক্ত তালু।

বিশ্রাম নিল পুরো এক মিনিট, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলো শ্বাস-প্রশ্বাস। ভীষণ শীত লাগছে ঝর্নার পানিতে ভিজে। কিন্তু একটু পরেই শুকিয়ে যাবে গায়ের কাপড়। ততক্ষণ কষ্ট করতেই হবে। ডালের ডগার কাছে গভীর ভাবে এঁটে বসেছে ল্যাসো, খুলে নিতে চাইল রানা। কিন্তু পুরো পাঁচ মিনিট চেষ্টা করেও সফল হলো না। উতে ইণ্ডিয়ান গিঁঠ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে ল্যাসো। কোথাও চেপে বসলে খুলবে না। বাউয়ি নাইফ বের করে ডালের ডগা কেটে উদ্ধার করল ল্যাসো। গুটিয়ে রাখল বেল্টে। আগেই ঠিক জায়গায় রেখেছে টিউব। বড় আরেকটা ডাল বেয়ে চলে গেল পাশের গাছে। নিজেকে ওর মনে হলো বাঁদর। এক ডাল থেকে আরেক ডালে চলেছে। শেষ গাছ থেকে নামল কমপক্ষে এক গজ দূরের মাটিতে।

অপেক্ষা করল ওখানে বসে।

পাশেই হান্টার। কান পেতে শুনছে রাতের আওয়াজ।

ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা হলো রানার। থলি থেকে নিল খানিকটা পেমিক্যান। শক্তি ফিরে পেতে হবে। হান্টারকে দিল বড় এক খণ্ড বিফ জার্কি। শুকনো খাবার চিবাতে শুরু করে ভাবতে লাগল: যদি সত্যিই ট্রেইল খুঁজে নেয়, বুঝতে হবে, শুধু যে প্রখর দৃষ্টিশক্তি আছে, তা নয়, নেকড়ের মতই প্রবল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও আছে ওটার।

আরও কী ধরনের ক্ষমতা আছে, তা জেনে নেয়া খুবই জরুরি। নিজে কী ধরনের সুবধা পাবে আর কী নয়, তাও

আগেই বুঝে নিতে হবে।

ধীরে ধীরে পেরিয়ে গেল দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা।

এ সময়টুকু বিশ্রাম নিল রানা। তারপর হঠাৎ করেই শুনল ঝর্নার উজানে ছপাৎ-ছপাৎ আওয়াজ তুলে আসছে কেউ।

যা বুঝবার বুঝে গেল রানা, দেরি না করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল। ওই দানব যে শুধু অতিমানবের মত শক্তিশালী, তা-ই নয়, ওটার ক্লান্তি বলতেও কিছু নেই।

মাথায় জেদ চাপল রানার। বিশ্রাম পেয়েছে বলে দৌড়াতে পারবে মাইলের পর মাইল। ঠিক করল, আসুক ওটা পিছনে। কয়েক ঘণ্টা পর সূর্য উঠবে যখন, প্রয়োজনে তখনও ছুটবে ও।

এই অসম রেসে জেতার সম্ভাবনা একেবারেই নেই ওর, তাও নয়।

ক্ষিপ্র চিতার মত ছুটতে শুরু করেছে রানা। কুঁজো হয়ে এড়িয়ে গেল নিচু একটা ডাল, তীরের গতি তুলে ঢুকে পড়ল বোল্ডারের আঁকাবাঁকা জটিল পথে। বাধ্য হলে লাফিয়ে টপকে যাচ্ছে পাথুরে বাধা। একটু পর পর পাল্টে নিচ্ছে দিক। অন্ধকারে বার-বার মুখে-হাতে লাগছে ডালপালা, পরোয়া নেই। কিছুক্ষণ পর জ্বলতে লাগল ফুসফুস, অবশ হয়ে এল পা। কিন্তু না থেমে পিছনে ফেলছে জঙ্গল, ঝর্না ও টিলা। আরও কিছুক্ষণ পর ফুরিয়ে গেল জঙ্গল, সামনে ফাঁকা জমি। এখানে এসে হাঁটবার গতি স্বাভাবিক করল রানা। এই গতি ওকে অনায়াসে পৌঁছে দেবে পঞ্চাশ মাইল দূরে। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবারও পাড়ি দিতে পারবে আরও চল্লিশ বা পঞ্চাশ মাইল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর গতি আবারও বাড়ল রানার, হেঁটে চলল দীর্ঘ পদক্ষেপে। সাত মাইল পেরোবার পর সামনে পড়ল প্রকাণ্ড গাছের এক উপত্যকা। আঁচ করল, এত দ্রুত হাঁটলে ক্লান্ত হয়ে পড়বে দশ-বারো মাইল গেলেই। কিন্তু গতি না কমিয়ে হেঁটে

চলল একটানা।

অ্যাসপেনে সারাদিন হেঁটে পিছনে ফেলেছে বড় জঙ্গল, কিন্তু তখন ধরে রাখতে হয়নি এই গতি। শীতের ভেতর ওর গাল বেয়ে দরদর করে নামছে ঘাম, ভিজে গেছে চামড়ার শার্ট। সামনে থেকে আসছে হু-হু ঠাণ্ডা হাওয়া। চারপাশে চাদর বিছিয়ে দিয়েছে ঘন কুয়াশা। দেখা যাচ্ছে না বেশি দূর। দ্রুত হাঁটতে গিয়ে জ্বলছে ফুসফুস। বিশাল এই প্রকৃতির মাঝে দূর থেকে দূরে চলেছে। অনেকক্ষণ ছন্দবদ্ধ ভাবে কাঁধ থেকে দুলছে বলে অবশ হয়ে এল দু'হাত। যেন ফুলে উঠছে দু'পা। সামান্য টলতে শুরু করেছে রানা। কিন্তু ওর পাশে অনায়াস ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে হান্টার।

রানার মনে হলো, জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা হবে এখন যদি বেকায়দা ভাবে মচকে যায় পা, একেবারে অসহায় হয়ে পড়বে আঁধারে।

একটা টিলার উপর উঠবার পর রানার মনে হলো, অনেক সরে এসেছে। যেন দাউ-দাউ করে জ্বলছে ফুসফুস, নড়তে চাইছে না হাত-পা, চোখের সামনে সব দৃশ্য আবছা।

না, যথেষ্ট হয়েছে।

দেরি না করে বসে পড়ল রানা মাটিতে।

তখনই দূর থেকে ভেসে এল ভয়ঙ্কর এক ঘড়-ঘড়ে গর্জন।

না, আসলে বিশ্রামের সময় নেই!

আবারও উঠে দাঁড়াল রানা, মৃদু টলতে টলতে রওনা হয়ে গেল। ওর চোখ পড়েছে সরু এক শৈলশিরার উপর।

ওখানে পৌঁছুতে হবে।

সামনে বাঁকা সিঁড়ির মত নেমেছে গ্র্যানেটের ধাপ।

নামতে শুরু করে দশ ফুট পেরিয়ে দ্বিতীয় ধাপে পা রাখল রানা। তারপর তৃতীয় ধাপে নামল কয়েক সেকেণ্ড পর। হান্টারের জন্য দুশ্চিন্তা নেই। খাড়া ধাপ বুঝে সাবধানে নামবে। তৃতীয়

ধাপে বসে পড়ল রানা, কান পাতল। অপেক্ষা করল, যাতে স্বাভাবিক হয় শ্বাস-প্রশ্বাস। স্থির থেকে ভাবতে চাইল। ফিতা সরিয়ে ডান হাতে নিল মারলিন রাইফেল। নিঃশব্দে পাশে বসে পড়ল হান্টার।

রক্ত-পিশাচটা ঠিকই পিছু নিয়েছে, ভাবল রানা। সহজ হয়নি ওদেরকে অনুসরণ করা। পাথুরে এলাকা, ঝর্না, টিলা, র‍্যাভিন, শৈলশিরা– এসব জায়গায় বার-বার বাধা পড়েছে। পিছিয়ে গিয়ে নতুন করে খুঁজে বের করতে হয়েছে ট্রেইল। বহুবার হতে হয়েছে হতাশ, কিন্তু হাল ছাড়েনি দানব।

মট্ আওয়াজ তুলে ভাঙল শুকনো একটা ডাল।

কপাল থেকে ঘাম ঝাড়ল রানা। সতর্ক চোখে চেয়ে রইল উপরের সংকীর্ণ শৈলশিরার দিকে। আর বড়জোর কয়েক মিনিট, তারপর ওদেরকে দেখতে পাবে ওটা।

হয়তো মাত্র দু' শ' গজ দূরে।

কী করবে, ঝড়ের বেগে ভাবছে রানা। চাইল চারপাশে। এমন কোনও অ্যাম্বুশ চাই, যেটার কারণে বাঁচবে।

বুদ্ধি দিয়ে হারাতে হবে দানবটাকে।

কিন্তু পাথুরে এই এলাকায় কোথায় অ্যাম্বুশ করবে?

কীভাবে?

জঙ্গলে আবারও ডাল ভাঙবার আওয়াজ শুনল রানা।

আওয়াজটা টিলার উপরে। পঞ্চাশ গজ দূরে।

ঘুটঘুটে রাতে আবারও নেমে এসেছে নীরবতা।

আতঙ্ক চেপে বসতে চাইছে রানার মনে। বার কয়েক ডান ও বামে দেখল। কোনও বুদ্ধিই খেলছে না মাথায়...

যে সংকীর্ণ শৈলশিরার উপর আছে, ওটা মাত্র চার ফুট চওড়া ও ছয় ফুট গভীর। কিন্তু ডানদিকে আছে মাত্র দু'ফুট চওড়া আরেকটা সরু শৈলশিরা। বাঁক নিয়ে চলে গেছে অন্য দিকে।

নীচে বইছে গর্জনরত সাদা পানির পাহাড়ি এক খেপা নদী।

ওদিকটা ভাল ভাবে দেখে নিল রানা।

অনেক নীচের ওই নদীতে পড়লে ভর্তা হয়ে যাবে যে-কেউ।

কিন্তু মারাত্মক ভাবে আহত না হলে হয়তো বাঁচবে দানবটা।

ওদিকের শৈলশিরার দিকে না গিয়ে উপায় নেই।

কুয়াশা ভরা, সরু, ভেজা শৈলশিরা ধরে রওনা হয়ে গেল রানা। সাবধানে ওর পিছু নিল অকুতোভয় হান্টার।

তিরিশ ফুট যাওয়ার পর যা খুঁজছে, পেয়ে গেল রানা।

সরু শৈলশিরার মাঝে ডানদিকের দেয়ালে ছোট এক গুহা, ভিতরে কালো আঁধার। তিন শ' ফুট নীচে সগর্জনে খল-খল আওয়াজে বইছে খেপা পাহাড়ি নদী।

এই গুহা শেষ আশ্রয়, ভাবল রানা। হান্টারকে হাতের ইশারা করে ঢুকে পড়ল গুহার ভিতর। তখনই নদীর কলধ্বনির উপর দিয়ে শুনল পিছনে কোনও পাথরে ধুপ্ করে নেমেছে দানব।

ছোট্ট গুহার মাঝে ঘুরে দাঁড়াল রানা, হাতে মারলিন রাইফেল। কক করল হ্যামার। ৪৫.৭০ ক্যালিবারের গুলি অনায়াসে খতম করবে বড় বাফেলো। বাইসনের পাল সাফ হয়ে যেতে অনেক কমে গিয়েছিল এই কার্তুজের ব্যবহার। এই মারলিন রাইফেল ছিটকে ফেলে দিতে পারে ছুটন্ত, মস্ত গ্রিজলি ভালুককে।

অতিরিক্ত ক্লান্তিতে আঁকড়ে আসছে রানার ফুসফুস। নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইল শ্বাস-প্রশ্বাস। কাঁপছে হাত-পা। বুঝতে পারছে, অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার কারণে ওকে খুঁজে বের করবে দানব। গুহার ছয় ফুট ভিতরে ভারী কারবাইন কাঁধে তুলে নিল রানা। গুহা-মুখের দিকে নল তাক করে অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ ওর পিছনে আড়ষ্ট হয়ে গেল মস্ত নেকড়ে। সামনে বেড়ে গেল কাঁধ। মনে হলো, চাইছে রানার সামনে চলে যেতে।

উল্টো এক পা পিছিয়ে ওটাকে ঠেকাল রানা। নীরবে বুঝিয়ে দিল, অপেক্ষা করতে হবে চুপ করে। নেকড়ে মানবে কি না, জানে না রানা। নিজে গুহা-মুখ থেকে সরাতে পারবে না চোখ।

ছোট্ট সমাধির মত গুহার মুখে যে এল, তাকে সত্যিকারের জীবন্ত আতঙ্ক বললেও ভুল হবে না। সাবধানে এসে সরু পথে গুহার সামনে হাজির হয়নি, পাহাড় থেকে লাফিয়ে নেমে এসেছে সাড়ে সাত ফুটি দেহ নিয়ে। চাঁদের বাঁকা ম্লান আলোয় দেখা গেল, দু'কাঁধে থোকা থোকা সাদা রোম। পুরো মাথা-মুখ জুড়ে চুল-দাড়ি। কুঠারের মত ধারালো চেহারা। বুক-পেট-কাঁধের প্রচণ্ড শক্তিশালী পেশি সামান্য কুঁজো করে দিয়েছে তাকে। স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে অনেক দীর্ঘ তার বাহু। বড় করে দম টেনে ফুলিয়ে নিল পিপের মত প্রশস্ত বুক। পরক্ষণে ভয়ঙ্কর এক গর্জনে থরথর করে কাঁপিয়ে দিল গুহা।

গোল আলু সদৃশ নাকের নীচে বেরিয়ে এল শাবলের মত একগাদা ধারালো দাঁত। রক্ত-তৃষ্ণায় চকচক করছে দুই লালচে চোখ। ছোরার মত নখ ব্যবহার করে জোরালো খড়-খড় আওয়াজ তুলল গুহার পাশের দেয়ালে।

এবার ঢুকবে গুহায়।

অবাক হওয়ার সময় নেই, দেরি না করে ট্রিগার টিপল রানা।

বদ্ধ জায়গায় প্রচণ্ড আওয়াজ তুলল রাইফেল।

রানা দেখল, আচমকা ব্যথা পেয়ে দু'হাত বুকে তুলেছে মস্ত জন্তুটা। পরক্ষণে গর্জে উঠল গ্রিজলি ভালুকের মত। এবার সামনে বেড়ে ছিঁড়ে ফেলবে শত্রুকে।

বোল্ট টেনে দ্বিতীয়বার গুলি করল রানা। থামল না, সামনে বেড়ে আবারও ট্রিগার টিপল। মনে আশা, একের পর এক গুলি করে সরু শৈলশিরা থেকে নীচের নদীতে ফেলবে দানবটাকে।

প্রতিটি বুলেটের জোরালো ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে যেতে হয়েছে

দানবটাকে। গুহার মুখ থেকে পিছিয়ে গেল সরু কার্নিশে। মাত্র আরেকবার গুলি করলে ছিটকে গিয়ে পড়বে বহু নীচের নদীতে।

কিন্তু ফুরিয়ে গেছে রানার ম্যাগাযিন। ঝট্ করে সামনে বাড়ল রানা, রাইফেল ঘুরিয়ে কুঁদোর গুঁতো বসাল দানবের মুখে। বিকট হুঙ্কার ছাড়ল ওটা। স্থির রাখতে চাইল ভারসাম্য। তারই মাঝে থাবা মেরে চিরে দিতে চাইল শত্রুর বুক।

দুটো নখ চিরে দিল রানার গাল। ওই মস্ত থাবার ঝটকা খেয়ে ছিটকে গিয়ে গুহার ভিতরের দেয়ালে পড়ল রানা। ওখান থেকে পড়ল মেঝেতে।

ভারসাম্য ফিরে পেয়ে সন্তুষ্ট ঘড়-ঘড় আওয়াজ তুলল দানব, এগোতে শুরু করেছে উপরে দু'হাত তুলে। এবার ছিঁড়ে ফেলবে শত্রুকে।

স্তম্ভিত হয়ে গেছে রানা। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে চাইল। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। বুঝল, এবার হামলা করবে দানব। এতই বড়, আটকে দিয়েছে সংকীর্ণ গুহার মুখের চাঁদের আলো। রানা জানে, কিছুই করতে পারবে না। ওটার দৈহিক শক্তির কাছে ও কিছুই না। তবুও আরেকবার হামলা করবার জন্য বাউয়ি নাইফ বের করতে চাইল।

গুহার ভিতর ঢুকল দানব।

মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রানাও, হাতে বেরিয়ে এসেছে ছোরা। লড়াই না করে মরবে না।

ঠিক তখনই পিছনের দেয়াল থেকে ছিটকে গেল কালো কী যেন। প্রচণ্ড গতি ওটার। সাঁৎ করে পেরিয়ে গেল রানাকে। ভয়ানক এক হিংস্র হুঙ্কার ছেড়ে অকল্পনীয় শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দানবের বুকে। ওই ভয়ানক গর্জনে থরথর করে কেঁপে উঠেছে রাত। মাত্র এক সেকেণ্ড পর কয়েক পা পিছিয়ে আর্তনাদ ছাড়ল দানব। গা মুচড়ে দু'হাতে সরাতে চাইল কালো

নেকড়েকে।

নতুন এই শত্রুকে ছিটকে ফেলে দেবে নীচের পাহাড়ি নদীতে।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। হান্টারের পিছু নিয়ে প্রায় বেরিয়ে এসেছে গুহা ছেড়ে।

হুমকিটা শুনেছে দানব, খপ করে ধরল হান্টারকে, পরক্ষণে তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলল পাহাড়ের দেয়ালে। ঘুরে দাঁড়িয়ে থাবা চালাল রানাকে ছিঁড়ে ফেলতে।

কিন্তু তার আগেই বিদ্যুদ্বেগে সামনে বেড়ে ক্ষুরধার ছোরা ব্যবহার করল রানা। দানবের ঘাড়ে পড়ল কোপ। চাঁদের ম্লান আলোয় দেখা গেল, গেঁথে বসেছে ছোরার দশ ইঞ্চি ফলা। ছিটকে বেরোল রক্ত।

তীব্র ব্যথা পেয়ে ঝট করে পিছিয়ে গেল দানব। ডান হাতে আহত ঘাড় ধরে পাল্টা হামলা করতে চাইল বাম হাতে।

তখনই থাবা এড়িয়ে আবারও সামনে বাড়ল রানা, বাউয়ি নাইফের তীক্ষ্ণ ডগা গাঁথল দানবের বুকে। ক্ষত থেকে কুলকুল করে রক্ত নামছে পেট বেয়ে।

বিকট আর্তনাদ ছাড়ল দানব। পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে। দু'হাতে চেপে ধরেছে দুই ক্ষত। অন্য কোনও প্রাণী হলে মারা পড়ত। আরও এক পা পিছিয়ে গেল। তখনই দ্বিতীয়বারের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কালো নেকড়ে। প্রচণ্ড জোরে বাড়ি খেল দুই জন্তু।

আরেক পা পিছিয়ে ভারসাম্য স্থির করতে চাইল দানব, কিন্তু পায়ের নীচে শৈলশিরার মেঝে নেই!

রানার মনে হলো এক যুগ ধরে দেখছে দানবটাকে।

এক সেকেণ্ড পর সাঁই করে রওনা হয়ে গেল নীচের নদী লক্ষ্য করে।

'হান্টার!' সামনে বেড়ে খপ্‌ করে নেকড়ের ঘাড়ের রোম চেপে ধরল রানা। নইলে দানবের পিছনে ঝাঁপ দেবে ওটা।

তখনই রানা দেখল, এখনও পাহাড়ের কিনারা আঁকড়ে ধরে আছে একটা নখ। পতন ঠেকাতে চাইছে ঝুলন্ত দানব। কিন্তু ক্ষতির কারণ হয়ে উঠল নিজের ভারী ওজন। হাত ছুটে গেল উপরের পাথর থেকে। তিন শ' ফুট নীচের নদীর দিকে রওনা হয়ে গেল দানব।

পাথরের বুকে রয়ে গেল তীক্ষ্ণধার নখের গভীর আঁচড়।

দানবটা পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়ার পর আবারও ক্যাম্প লক্ষ্য করে ফিরতে শুরু করেছে রানা। অনেক দূর এসে শুয়ে পড়েছে সমতল এক বোল্ডারের উপর। হু-হু হাওয়া বইছে। ওই লড়াইয়ের কথা ভাবতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল রানা। একবার দেখে নিল নির্দিষ্ট নক্ষত্র। আর বড়জোর দু'ঘণ্টা পর ভোর হবে।

চওড়া উপত্যকার দিকে চাইল রানা। ভাবছে, মরতে মরতেও বাঁচল কারণ ঠিক সময় মত হামলা করেছিল হান্টার দানবের ওপর। কালো নেকড়ের ঘন রোম ভেদ করে ঘাড়-পাঁজরে গভীর কয়েকটা ক্ষত তৈরি করেছে দানব। যদিও আচরণ দেখে মনেই হচ্ছে না হান্টার আহত। অন্য সব প্রাণীর মতই জীবনকে সহজ ভাবে নিয়েছে। যতক্ষণ বাঁচবে, দলের জন্য লড়বে প্রাণপণে।

বোল্ডার থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করে এক মাইল পেরিয়ে গেল রানা, চলেছে এক গিরিপথের দিকে। ওই পথে ফিরবে ক্যাম্পে। আরও কয়েক কদম যাওয়ার পর ঘড়-ঘড় আওয়াজ ছাড়ল হান্টার। ঝট্‌ করে ঘুরে চেয়ে কাঁধে মারলিন রাইফেল তুলে নিল রানা।

চুপ হয়ে গেছে হান্টার।

রানা জানে, মাত্র একবার সাবধান করে মস্ত নেকড়ে।
ওখানে পুরো পাঁচ মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা।
কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।
নড়ছে না কিছু।
তারপর টিলার গায়ে দেখা গেল কালো একটা ছায়া।
ওদিক থেকে আসা বাতাস শুঁকল হান্টার। তার পর সিধে হয়ে ভর করে উঠে দাঁড়াল। বুকের গভীর থেকে বেরোল জান্তব ঘড়্-ঘড় আওয়াজ।
'ঠিক আছে, হান্টার,' ফিসফিস করল রানা। খেয়াল করেছে, খুব ধীরে হাঁটছে ওই ছায়া। টলছে একটু একটু। রাতের আঁধারে আরও ভালভাবে দেখতে চাইল রানা। সরু করল চোখ। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, ওই ছায়া দানবের নয়। এ অনেক ছোট। হাঁটছে প্রায় পা টিপে টিপে।
সরে গেল রানা, একটা বোল্ডারের পাশে বসে পড়ল। লুকিয়ে সরে গেল আক্কেক দিকে। আকাশের পটভূমিতে ওকে আর দেখা যাবে না। কিন্তু ওই লোক হুঁশিয়ার থাকলে ঠিকই বুঝেছে, একটু আগের বোল্ডারের ছোঁয়ে সামান্য বড় হয়ে উঠেছে পাথর-খণ্ড।
রানার ধারণা, ওই লোক মনোযোগ দেয়নি। হান্টারকে কিছু বলতে গেল না। নেকড়ে মিশে গেছে পাথরের গায়ে। ঠিক যেন রাতের কোনও ছায়া।
চালু জমিতে অনাহূত লোকটার আড়ালে রয়ে গেছে রানা। কিন্তু সে যাবে একটু নিচু জায়গা দিয়ে। কাছেই থাকবে ও। অপেক্ষা করল রানা। সে পেরিয়ে যাওয়ার পর উঠে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।
তখনই চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল বয়স্ক লোকটা।
অ্যানাথেসিয়ান। হাতে রাইফেল।
গত শতাব্দীতে তাদের বলা হতো এস্কিমো। উত্তরাঞ্চলের

রেড ইণ্ডিয়ান। চাঁদের আবছা আলোয় দেখা গেল, তার পরনে কর্কশ চামড়ার পোশাক। বহু বছর প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে কুঁচকে গেছে মুখের বাদামি ত্বক। এরাই এ মহাদেশের সেরা শিকারি বা ট্র্যাকার। সত্যিকারের লড়াকু জাতি।

রানা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে রাইফেল নামাল বৃদ্ধ। আচমকা হান্টারের ওপর চোখ পড়ায় চমকে উঠে আড়ষ্ট হয়ে গেল। রানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভয়ঙ্কর এক নেকড়ে।

'এত রাতে শীতে হাঁটা উচিত নয়, দাদু,' মন্তব্য করল রানা। 'আপনার আগুন তো বহু দূরে।' ভাল করেই জানে, আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান কাউকে দাদু সম্বোধন করা মানেই মানুষটাকে শ্রদ্ধা জানানো।

আস্তে করে মাথা দোলাল বৃদ্ধ। 'ঠিক। কিন্তু বেরোতে হলো শিকার করতে। বয়স হয়ে গেছে বলে ভাল শিকার ধরতে পারি না। নইলে ঠিকই দেখে ফেলতাম তোমাকে।' মাথা নাড়ল সে। 'আসলে অনেক বয়স হয়ে গেছে। সামনে আরও খারাপ সময় আসছে। যখন শিকারই পাব না।'

'অত খারাপ অবস্থা হবে না, দাদু,' হাসল রানা। 'শিকার ঠিকই থাকবে।' খেয়াল করেছে, বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়ে নিজের কথা বলেছে বৃদ্ধ। তাঁকে বিব্রত মনে হলো। 'কিন্তু এত রাতে গ্রাম থেকে বেরোলেন কেন? দিনে শিকার করতে পারবেন না, এমন কী আছে যেটা পাবেন রাতে?'

একটু দ্বিধা করে বলল বৃদ্ধ, 'রাতে ঘোরে যে জন্তু, ওটাকে খুন করতে বেরিয়েছি।' কোনও ভয় নেই কণ্ঠে।

বুঝতে বাকি থাকল না রানার। বুড়ো মানুষটা একাকী, অসহায়। গভীর রাতে শীতের ভিতর বেরোতে হয়েছে পেটের দায়ে।

'রাতের আঁধারে কী শিকার করতে চান, দাদু?' জানতে চাইল

রানা।

বুকের কাছে নেমে এল বৃদ্ধের মাথা। 'আমার একটা নাতি ছিল।'

বক্তব্য শুনবার জন্য চুপ করে অপেক্ষা করছে রানা।

'আমার অন্য কোনও নাতি ছিল না। কচি ছেলে। মাত্র শিখছিল কীভাবে শিকার করতে হয়। ওর পাশেই ছিলাম সে রাতে। আর তখনই এল ওই জন্তু...'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'দুঃখিত, দাদু। আপনার পরিবারের জন্যে খারাপ লাগছে আমার। কিন্তু আপনার নাতির খুনের বদলা নেব আমি।'

সামান্য টলে উঠল বৃদ্ধ। মৃদু ঘুরে গেল। সরাসরি চোখ রাখল রানার চোখে। 'তুমি, বাছা, শিকার...

'জী,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'আমি ওটাকে শিকার করতে চাই। ঠিক তা-ই করব।'

মৃদু মাথা দোলাল বৃদ্ধ। অন্তর থেকে বিশ্বাস করেছে রানাকে। আসলে বিশাল পাহাড়-জঙ্গলে এই এলাকায় সত্যিকারের কোনও পুরুষ কাউকে কখনও মিথ্যা বলে না।

কয়েক পা এগিয়ে এল বৃদ্ধ। মন দিয়ে দেখল যুবকের কালো চোখ।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে রানা।

'ওটা কোনও ভালুক না,' বলল বৃদ্ধ। 'কিন্তু মানুষও না... জানি না ওটা কী। শুধু জানি, ওটা এই জগতের না।'

'এই জগতের নয় কেন?'

'কারণ...' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল বৃদ্ধ, 'আমি অনেক বছর আগে এক পাহাড়ের গুহায় ওটার ছবি দেখেছি।' রাইফেল তুলে বহু দূরে দেখাল সে। 'সেই আমলে আমার জাতির মানুষ গুহায় থাকত। তারাই এঁকে রেখে গেছে ছবি। অনেক গল্পও ছিল।

রাতে হামলা করত ওই জন্তু। আমার পরিষ্কার মনে আছে ছবিগুলো।'

'ওই ছবির গল্প কী, দাদু?' জানতে চাইল রানা। 'আপনি বলেছেন ওটা ভালুক নয়। আবার মানুষও নয়। ছবির কথা আমাকে খুলে বলুন।'

'ওটা মানুষ না। মানুষ ভয় পেত ওদেরকে।' হঠাৎ দমকা হাওয়া আসতেই নিচু হয়ে গেছে বৃদ্ধের কণ্ঠঃ 'ওসব ছবি ছিল যুদ্ধের। মানুষ আর অমানুষের লড়াইয়ের ছবি। কোনও কারণ ছাড়াই খুন করত অমানুষরা। একটা পাহাড়ে জমিয়ে রাখত হাড়। অভিশপ্ত পাহাড়। আমরা ওখানে যেতাম না।' রাইফেল তুলে দক্ষিণ দেখাল বৃদ্ধ। 'সাদামানুষ ওই জায়গার নাম দিয়েছে সাদা পাহাড়। ওদিকের পাথর থেকে যে নদী নেমে বার-বার বাঁক নিয়েছে, ওই দিকের পাহাড়ের নাম আমরা দিয়েছি আত্মার গুহা। হাজার বছর আগে ওই এলাকায় খুন হয়েছে বহু মানুষ।'

আগেও কারও কারও কাছে এই কথা শুনেছে রানা।

আবারও শুরু করল বৃদ্ধ, 'দাদুদের কাছে শুনেছি, ওই আত্মার গুহায় ছিল আইসম্যানদের ছবি। হাজার বছর আগে হারিয়ে গেছে তারা। আমাদের ওই পুরো এলাকা গ্রাস করে নিল জঙ্গল। তার আগে লড়াই হয়েছে আইসম্যানের সঙ্গে আমাদের। মারা গেছে অনেক মানুষ। জায়গাটা ভুতুড়ে, অশুভ। খাড়া পাথরের জলপ্রপাত থেকে নেমে দু'পাহাড়ের মাঝ দিয়ে যে গেছে নদী, শুনেছি ওখানে আছে ওই গুহা। দেখতে ওটা নেকড়ে বা বাঘের মত। গেলে এখনও পাবে। যদিও নিজে আমি কখনও যাইনি।'

চুপ করে আছে রানা।

থেমে থেমে বলল বৃদ্ধ, 'মানুষের তৈরি অস্ত্র না এমন সব অস্ত্র পেয়েছি ছোটবেলায় পাহাড়ে। অনেক পুরনো ওসব। আমার দাদু বলেছিলেন, পাহাড়ে গেলেই পাওয়া যায়। আরও বলেছিলেন,

বরফের নীচে লুকানো আছে গোপন কিছু জিনিস। একদিন উত্তর দিকের পাহাড়ে একটা ধনুক পেল আমার এক বন্ধু। তখন দাদু বলেছিলেন, বরফের ভেতর জমাট বেঁধে যাওয়া এক আইসম্যান দেখেছেন তিনি। হাজার হাজার বছর ধরে ছিল। যখন সবাই মিলে বরফ থেকে বের করে আইসম্যানকে গ্রামে নিয়ে গেল, বয়সের কারণে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল তার শরীর, ঠিক অনেক আগের হাড়ের মত। আর কথা বলার সময় দাদুর চোখে ভয় দেখেছিলাম।' থেমে গেল বৃদ্ধ, কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আমি নিজেও এখন খুব ভীত।'

'দাদু, আপনি বাড়ি ফিরে যান,' নরম সুরে বলল রানা। 'আমি আইসম্যানকে খুঁজে বের করে শেষ করে দেব। প্রতিশোধ নেব আপনার নাতির মৃত্যুর।'

'তা আমি বিশ্বাস করি,' হঠাৎ দমকা হাওয়ায় চোখ সরু করল বৃদ্ধ। নিচু স্বরে বলল, 'সাবধান, নাতি, ওটা কিন্তু অনেক মানুষ খুন করেছে।'

'জানি,' বলল রানা, 'ওটাকে শেষ করতে না পারলে আরও বহু মানুষ খুন হবে। আপনি বাড়ি ফিরে যান, দাদু। এত শীতে রাতে ঘুরবেন না। যখন আগুনের পাশে বসে ওম নেবেন, প্রার্থনা করবেন আমার জন্যে: আইসম্যান আমাদের সবাইকে শেষ করে দেয়ার আগেই যেন উল্টো তাকে শেষ করে দিতে পারি আমি।'

মৃদু মাথা দোলাল মানুষটা, নেকড়ের দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থাকল, একবার রানার হাতে আলতো করে হাত বুলিয়ে ধীর পায়ে রওনা হয়ে গেল গ্রামের পথে।

পাহাড়ি এলাকা থেকে ক্যাম্পের দিকে চলেছে রানা। বড়জোর এক ঘণ্টা পর ভোর হবে। থমথম করছে চারপাশ। নেকড়েকে নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা নেই, নীরবে পথ চলবে ওটা।

রানা ভাবছে ওই দানবের কথা। উপর থেকে পড়ে মারাত্মক আহত হওয়ার কথা। ঘাড় বা বুকের ক্ষতের কারণে মরতেও পারে। আর বেঁচে থাকলেও আপাতত এদিকে আসতে পারবে না। এই এলাকা আপাতত নিরাপদ। ধীর পায়ে হাঁটছে রানা, মার খাওয়া অবস্থা। নেকড়েও ক্লান্ত, হাঁটছে পাশে, নজর রেখেছে সবদিকে।

দক্ষিণ থেকে রানা ও হান্টার ক্যাম্পে ঢুকতেই সতর্ক হয়ে উঠল সবাই। গুলি করে বসতে পারে যে-কেউ, কিন্তু এতই হতক্লান্ত যে কিছুই পাত্তা দিল না রানা।

সবার আগে ওর সামনে পৌঁছল তানামুরা। জিনাকে কোথাও দেখল না রানা। পযিশন নিয়েছে অন্য কোথাও। কৌতূহল নিয়ে দুস্থ রানাকে দেখল তানামুরা, নিচু স্বরে বলল, 'আর... তারপর?'

'এখনও বেঁচে আছে,' তানামুরার তাঁবুর পাশ থেকে এক ক্যান এমআরই তুলে নিল রানা। ঢাকনি খুলে খেতে শুরু করেছে খাবার। অবশ্য, দু'সেকেণ্ড পর কুঁচকে ফেলল মুখ। খাবারটা দিয়ে দিল হান্টারকে। পাঁচ সেকেণ্ডে এমআরই চলে গেল নেকড়ের পেটে। 'পশ্চিম-দক্ষিণে নিয়ে গেছি, তারপর ধাওয়া করে ধরেছে আমাকে। উঁচু এক শৈলশিরা থেকে ফেলে দিয়েছি নীচের নদীতে। কিন্তু এখানে অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। রওনা হয়ে যাওয়া উচিত। ওটা অস্বাভাবিক দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে।'

'তাই? আমরা রওনা হব,' অস্বস্তির ছাপ পড়ল তানামুরার মুখে। 'কিন্তু চলতে হবে ধীর গতিতে। ডক্টর সিরাজউদ্দীন খুবই অসুস্থ। হেলিকপ্টারে করে সরিয়ে নেয়া হবে, সে উপায় নেই। রেডিয়ো নষ্ট বলে...

রেগে গেছে রানা, যদিও চোখে-মুখে কোনও প্রকাশ নেই। এখনও মেরামত হয়নি রেডিয়ো। সম্ভবত স্যাবোটাজ করা হয়েছে ওদেরকে।

ওর মনের কথা বলল তানামুরা, 'আমার ধারণা, ইচ্ছা করে নষ্ট করা হয়েছে রেডিয়ো। সিগনাল নেই মোবাইল ফোনেও।'

জবাবে কিছু না বলে প্রফেসরের তাঁবুর কাছে চলে এল রানা।

ভিতরে শুইয়ে রাখা হয়েছে ডক্টর সিরাজউদ্দীনকে। ফ্যাকাসে মুখ, দরদর করে ঘামছেন। পাশেই জিনা। এইমাত্র একটা ইনজেকশন দিল। রানাকে দেখে চট্ করে মাথার ইশারা করল। বাইরে গিয়ে কথা বলতে চায়। কিন্তু রানা ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই ডাকলেন ডক্টর।

'বাছা!' বাচ্চাদের মত খুশি হয়ে উঠেছেন, 'আমি জানতাম! জানতাম তুমি ওটাকে সরিয়ে দেবে! হাহ্-হাহ্-হাহ্! আর্মির লোকটাকে বলেছিলাম না, দুনিয়ার সেরা ট্র্যাকার রানা! কেউ তাকে বিট করতে পারবে না!'

খুব খুশি প্রফেসর।

তাঁর মন ভেঙে দিতে চাইল না রানা। থামল কটের পাশে। মৃদু সুরে বলল, 'স্যর, এখন কেমন আছেন?'

কাছ থেকে বিধ্বস্ত রানাকে দেখে মুখ শুকিয়ে গেল তাঁর। খপ্ করে ধরলেন ওর ডান হাত। 'তুমি ঠিক আছ তো, রানা?'

'জী। রীতিমত ফুর্তিতে আছি।' জোর করে হাসল রানা।

'তা হলে যে হাতে-মুখে এত আঁচড়?'

'দুষ্টুমি করতে গিয়ে।'

'আচ্ছা!'

ঘোরের ভিতর চলে গেছেন সিরাজউদ্দীন, বুঝল রানা। মুখে বলল, 'আপনার খবর বলুন, স্যর।'

'ভালই আছি।' স্মিত হাসলেন প্রফেসর। 'সমস্যা হচ্ছে, হঠাৎ হঠাৎ ধড়-ফড় করছে বুক। ...বয়স! তোমার চাচী গেছেন পঁচিশ বছর আগে, আমারও বোধহয় এবার যাওয়ার সময়! ক্ষতি কী? কম তো হলো না!'

'কী যে বলেন, স্যর, আজকাল এক শ'র নীচে কেউ চলে গেলে তাকে রীতিমত অপমান করা হয়,' নরম সুরে বলল জিনা।

'তা হলে আপাতত আমাকে মরতে মানা করছ?' হাসলেন সিরাজউদ্দীন। 'ঠিক আছে, ভেবে দেখব।'

'আরাম করুন, আমি বাইরে আছি,' বলল রানা। 'একটু পর রওনা হব। স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করছি।'

'আমি হাঁটতে পারব,' আপত্তি তুললেন প্রফেসর।

'আপাতত স্ট্রেচারে বিশ্রাম নেবেন, পরে দরকার পড়লে নামবেন,' জানিয়ে দিল রানা।

রানার চোখে চোখ পড়তে আস্তে করে মাথা দুলিয়ে বাচ্চাদের মত মেনে নিলেন প্রফেসর।

বাইরে লালচে ভোরে ছড়িয়ে পড়ছে সোনালি আভা। তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওর পাশে এসে চুপ করে দাঁড়াল জিনা উইলসন। গুছিয়ে নিল কথা, তারপর বলল, 'ওঁর ব্লাড প্রেশার আগের চেয়ে কমেছে। কিন্তু নীচের পাল্‌স্ এখনও নব্বুই। আমরা আস্তে আস্তে চললে হাঁটতে পারবেন। কিন্তু খাটানো ঠিক হবে না। ডাক্তারি সাহায্য দরকার। যে-কোনও সময়ে হার্ট অ্যাটাক হবে। রক্ত পাতলা করতে ডিসপ্রিন দিয়েছি। কিন্তু বার-বার দেয়া ঠিক হবে না। আমার কাছে যথেষ্ট ওষুধও নেই। ডাক্তারিও জানি না। দ্রুত এখন রিসার্চ স্টেশনে পৌঁছুতে হবে।'

'স্ট্রেচারে করে নেব,' বলল রানা। 'পনেরো মিনিটের ভেতর তৈরি হবে।' তানামুরার দিকে চাইল। 'রেডিয়োর মূল সমস্যা কী?'

'জানি না,' দ্বিধা না করেই স্বীকার করল তানামুরা, 'কোনও ভাবে ডিসেবল হয়েছে।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানা। কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল,

'তোমাদেরকে নিরাপদ কোথাও পৌঁছে আবারও ফিরব এখানে। প্রথম থেকেই এই মিশন অস্বাভাবিক। গোপন করা হয়েছে অনেক কিছুই। রহস্যের জটগুলো ছাড়াতে হবে।'

প্রেস্টন ওয়েস্টকে পাশ কাটিয়ে হেঁটে চলল রানা।

পিছন থেকে ব্রিটিশ যোদ্ধা বলল, 'আশা করি সুস্থ থাকবেন প্রফেসর।'

জবাব না দিয়ে জঙ্গলে ঢুকল রানা। রক্তাক্ত বাউয়ি নাইফ বের করে কাটল দুটো সাত ফুটি পপলার চারা। ডায়ামিটারে ওগুলো এক ইঞ্চি। সবুজ বলেই এখনও নিতে পারবে ভারী ওজন। দু' পপলার চারা লম্বা করে পাশাপাশি রাখল। মাঝে দেড় ফুট জায়গা। প্যাক থেকে বের করল চামড়ার ফিতা, ওটা ব্যবহার করে তৈরি করল স্ট্রেচার।

পনেরো মিনিট পর গুটিয়ে নেয়া হলো রাতের ক্যাম্প। স্ট্রেচারে তোলা হলো প্রফেসরকে, রওনা হয়ে গেল ওরা।

দলের পিছনে পাহারা দেবে কং তানামুরা ও প্রেস্টন ওয়েস্ট। প্রথমে স্ট্রেচার বহনের দায়িত্ব বাড রলিন্স ও আর্থার জয়েসের। এবড়োখেবড়ো জমিতে সাবধানে চলেছে ওরা প্রফেসরকে নিয়ে। ওদের সামনে অস্ত্র হাতে টড ওয়েইলার।

চিন্তিত রানার পাশে চলেছে জিনা। কয়েক মিনিট পর বলল, 'একটা কথা জানতে পারি?' মনে হলো হালকা করতে চাইছে পরিবেশ। 'আপনি এসবের ভেতর জড়িয়ে গেলেন কী করে?' কৌতূহল নিয়ে রানাকে দেখল। 'আর্মি থেকে বলেছিল, তারা দুনিয়ার সেরা কমাণ্ডো লিডার আর ট্র্যাকারকে খুঁজে বের করেছে। কিন্তু তিনি এখন আর আর্মিতে নেই। রাজি হয়েছেন দলের নেতা হতে। কিন্তু এসব তথ্য আর্মি পেল কী করে? আগে কখনও তাদের হয়ে কাজ করেছেন?'

কিছুক্ষণ পর বলল রানা, 'কখনও কখনও, মনের বিরুদ্ধে,

বাধ্য হয়ে।' জিনাকে জানাল না, আমেরিকান সশস্ত্র বাহিনী তাঁকে খুন করতে পারে ধারণা করে সাহায্য চেয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টও। তা বেশি দিন আগের কথাও নয়।

'কখনও ব্যর্থ হননি ট্র্যাক করতে?' জানতে চাইল জিনা।

'হয়েছি। দু'বার আমাকে ফাঁকি দিয়েছে দুই ববক্যাট।'

'ববক্যাট?' ভুরু চাঁদিতে গিয়ে ঠেকল জিনার। 'ও-বাবা, ওদের সঙ্গে পারবে কে! এ-ই আপনার ব্যর্থতা? ...ইশ্, আমি যদি কখনও আপনার মত ট্র্যাক করতে পারতাম! ...কিন্তু আসলে পারব না। ঈশ্বর সবাইকে সেরা করেন না।'

'পারবে,' অন্তর থেকে বলল রানা। 'আরও কিছু কৌশল শিখে নিতে হবে।'

'কে শেখাবে ওসব কৌশল?' মাথা নাড়ল জিনা, 'আর্মির ট্র্যাকারদের চেয়ে বেশি জানি, কাজেই ওদের কাছ থেকে শেখার কিছু নেই।' একটু পর বলল, 'তবে আপনি শেখালে কৃতজ্ঞ থাকব।'

'হাতে সময় পেলে, কেন নয়?' চট্ করে পিছনে চাইল রানা। দেখে নিল ঠিক ভাবেই আসছে প্রফেসরের স্ট্রেচার।

হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণ পর বলল জিনা, 'আপনি অদ্ভুত মানুষ, রানা। আমার মনে হয়েছে, আপনি কারও সঙ্গে মিশতে পছন্দ করেন না। অথচ, আপনার বিষয়ে যা জেনেছি, দরকারে অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতেও দেরি করেন না। ...বলবেন, রানা, আপনি এমন কেন?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'জানি না আসলে।'

'তাই বলে আপনাকে অস্বাভাবিক মানুষ বলতে পারব না!'

পাশাপাশি হেঁটে চলল ওরা দু'জন।

বাইশ

বোঝাতে গিয়ে টেবিলে দু'কনুই রেখে সামনে ঝুঁকে পড়েছে নিনা সয়্যার। অথচ, ওকে মোটেও পাত্তা দিচ্ছেন না ল্যাংলির সিআইএ-র ফিযিসিস্ট।

লম্বা লোক ডেভিড গ্রেবার, চুল পেকে সাদা, আচরণ অভিজাত। চোখ তুলছেন না ডিএনএ-র প্রিন্টআউট থেকে।

'ডক্টর!' স্বাভাবিকের চেয়ে জোরে ডাকল বিরক্ত নিনা, 'আপনি আমার কথায় মনোযোগ দিচ্ছেন না! খেয়াল করুন ইন্টেগ্রিন ম্যাট্রিক্স! বা সংবদ্ধ অ্যাগ্রিগেট করা মলিকিউলের অবস্থান! এ পরিমাণে অ্যাকটিন, টালিন, ভেনকিউলাম বা ও-অ্যাকটিশনকে কী বলবেন আপনি? আগে কখনও এ জিনিস কোনও মানুষ দেখেনি! এমন কী এত ক্যান্সার বিরোধী হতে পারে না অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ইমিউন সিস্টেমও!'

নরম সুরে শুরু করলেন গ্রেবার, 'আপনি আসলে কী বোঝাতে চাইছেন?'

অবাক চোখে বয়স্ক ডক্টরকে দেখল নিনা সয়্যার।

'আমি কী বোঝাতে চাইছি মানে?' ডিএনএ-র প্রিন্টআউটে হাত রাখল নিনা। 'আমার পয়েন্ট আপনার বুঝতে না পারার কথা নয়, ডক্টর! এই জন্তু মানুষের চেয়ে অনেক শক্তিশালী! অসুস্থ হয়ে পড়লে এক শ' গুণ দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে! ইনফেকশন বলতে এর কিছুই নেই!' মাথা নাড়ল নিনা। 'ডক্টর, আমি তো বলব, ওই

প্রাণী কখনও অসুস্থ হবে না!'

নিনার চোখে চেয়ে রইলেন গ্রেবার, কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'এটা আপনার ব্যক্তিগত ধারণা, মিস সয়্যার।'

'তা হলে ওটার শ্বেত রক্তকণিকার ব্যাপারে কী বলবেন আপনি?' রেগে গিয়ে বলল নিনা। 'এই প্রিন্টআউট এক শ' ভাগ নিখুঁত। ইনফেকশন বলতে কিছুই নেই ওই জন্তুর। নিজেই দেখুন রিপারফিউশন মলিকিউল! বা অক্সিডেন্ট লেভেল! মলিকিউলের সংশ্লেষ ঠেকিয়ে দেবে রেস্টেনোসিস। ডক্টর, ভাল করেই জানি কী হয়েছে! আপনিও ভাল করেই জানেন, আমি মিথ্যা বলছি না। এখানে অনুমানের কোনও সুযোগই নেই!'

ভুরু কুঁচকে আবারও প্রিন্টআউটে চোখ রাখলেন গ্রেবার। নিচু স্বরে বললেন, 'আরও প্রিন্টআউট আছে তো আপনার কাছে?'

'নিশ্চয়ই!'

'দয়া করে সংরক্ষণ করবেন,' বলে আবারও প্রিন্টআউটে চোখ বোলালেন ডক্টর গ্রেবার। 'আপনার আপত্তি না থাকলে আমি নিজে একবার অ্যানালাইয করতে চাই। আগামীকাল আপনার সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলব। বিশেষ করে দেখতে হবে ডি-৪ থেকে শুরু করে ডি-১০, নইলে নিশ্চিত হওয়া যাবে না মিটোসিস লেভেল।'

উঠে দাঁড়াল নিনা সয়্যার। 'ঠিক আছে, ডক্টর, আগামীকাল দেখা হবে। আগামীকাল সকালে মিটিঙের পর জানাব ডক্টর সিরাজউদ্দীনকে। এসব তাঁর জানা থাকা উচিত।'

'নিশ্চয়ই। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলব।'

ব্রিফকেস তুলে নিয়ে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল নিনা। পিছন থেকে ডক্টর বললেন, 'আপনি যখন শহরেই থাকছেন, কোনও প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারবেন সিআইএ-তে।'

'না, আমার কোনও সাহায্য লাগবে না,' ঘুরে ডক্টরকে দেখল নিনা, 'ধন্যবাদ।'

মাথা দোলালেন ডক্টর গ্রেবার। 'বেশ।'

নিনা দরজা পিছনে ভিড়িয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার পর চুপ করে কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন গ্রেবার, তারপর তুলে নিলেন ফোন।

ব্যাঙ্কের ভল্টে ঢুকে পুরু দরজা লক করে দিল *পাথর ভাঙা* হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। টম জেরাল্ডকে কিছু না বলে চলে গেল একটা গান ক্রেটের কাছে। ওটার উপর থেকে তুলে নিল জ্যাক ডেনিয়েল'স্ উইস্কির বোতল। দুটো গ্লাসে ঢালল সোনালি তরল। টমের জন্য এক পেগ, নিজের জন্য তিন।

মনোযোগ দিয়ে ব্যাঙ্ক ভল্ট দেখছে টম জেরাল্ড। হাতে উইস্কির গ্লাস পাওয়ার পর সামান্য চুমুক দিল। ওর মনে পড়ল, স্থানীয় এক ব্যাঙ্ক ব্যবসা গুটিয়ে নিলে তখন এই ভল্ট কিনে নিয়েছিল ডিগবার্ট। বাড়িটা মেরামত করবার সময় নামিয়ে দিয়েছে বেযমেন্টে। কারও সঙ্গে গোপন আলাপ করতে চাইলে, সার্ভেইল্যান্স বা ইলেকট্রনিক লিসেনিং ডিভাইস থেকে বাঁচতে এখানে এসে ঢোকে।

'যা শুনলাম, বাছা, পরিস্থিতি ভাল না,' এক ঢোকে গ্লাসের অর্ধেক খালি করল ডিগবার্ট। 'ওরেব্বাপ রে!' বলে বিকৃত করে ফেলল মুখ। চোখের সামনে তুলল মদের গ্লাস। 'অনেক দিন এই মাল পেটে দিইনি! তা হলে কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি? নইলে এত ধক্ লাগবে কেন! কিন্তু মরে যাওয়ার চেয়ে বুড়ো হয়ে যাওয়া ঢের ভাল। আর, বাছা, তুমি কিন্তু নাক গলাতে গিয়ে মরেও যেতে পারো।'

প্রাক্তন বসের কঠোর চোখে চোখ রাখল টম জেরাল্ড। সাধারণত সহজ ভঙ্গিতে কথা বলে ডিগবার্ট। কিন্তু এখন সিরিয়াস মনে হলো। মুহূর্তে কেড়ে নিয়েছে মনোযোগ।

'আমাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে?' জানতে চাইল টম।

কড়া উইস্কি পেটে চালান দিয়ে মাথা নাড়ল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। 'তেমন কিছু শুনিনি। তবে বুঝলাম, মুখ বুজে আছে সবাই, অথবা তেমন কিছুই জানে না। আর তার মানেই, তোমার বুঝতে হবে, সবই জানে ওরা! যদি না জানত, উল্টো আমার কাছে জানতে চাইত। সব না জানলে ওদের চলবে না, ওদের ব্যবসা এমনই।'

কুঞ্চিত পাকা ভুরুর নীচে হালকা নীল চোখ দেখছে টমকে। নিচু স্বরে বলল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, 'না হয় এবারের কাজটা ছেড়েই দাও, টম। ওদেরকে জানিয়ে দাও, সন্দেহজনক কিছুই পাওনি। এমনিতেই তুমি জি-৪, বেশি পদোন্নতি পাবে না। অবসর নেবে বারো-চোদ্দ বছর পর। এখন রেগে গেলেও তা মেনে নেবে বস। বড় কথা, বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।'

বুদ্ধিটা খারাপ না, ভাবল জেরাল্ড। অনেক সময়ে ঝামেলা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে মিথ্যা বলে ডেপুটি মার্শালরা। সে-ও না হয় তা-ই করবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, পুরো ব্যাপারটা ওকে কৌতূহলী করে তুলেছে। 'আসলে কী জেনেছ, ডিগ?' এক চুমুক উইস্কি নিল টম।

একে-৪৭-এর একটা ক্রেটের উপর বসল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। ওর পিছনের দেয়ালে থরে থরে সাজিয়ে রাখা ন্যাটো ৭.৬২ অ্যামিউনিশন। ভল্টে আরও রয়েছে অসংখ্য শটগান, সেমি-অটোমেটিক, পিস্তল, গ্যাস মাস্ক, খাবার, ইমার্জেন্সি মেডিকেল কিট, স্মোক মার্কার, পোর্টেবল রেডিয়ো ও দুই ক্রেট ভরা অ্যান্টিপারসোনেল গ্রেনেড। পাথর ভাঙা কর্মজীবন শুরু করেছিল মেরিন হিসাবে, তাই অন্তর থেকে ভালবাসে অস্ত্র।

নতুন করে গ্লাসে মদ ঢেলে নিয়ে শুরু করল সে, 'খাপছাড়া কিছু তথ্য পেয়েছি। কিন্তু এটা জেনেছি, ঘোষণা করা হয়েছে: ট্রেনিং এক্সারসাইযের সময় হারিয়ে গেছে দুই প্লাটুন মেরিন সৈনিক।'

'আলাস্কায়?'

হাত নাড়ল ডিগবার্ট। 'কোথায় হারিয়ে গেছে তা বড় কথা নয়। আসল কথা: কীভাবে হারিয়ে গেল। ভুলে গেলে চলবে না, তারা মেরিন সৈনিক। এমন না যে একদল এলিয়েন এসে তাদের মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেছে। স্পেশাল কয়েকটা স্টেশনের পাহারায় ছিল তারা, কিন্তু একজনও বাঁচতে পারেনি।'

'মিলিটারি রিসার্চ স্টেশন? ওই ফ্যাসিলিটি থাকে তো শুধু বেয়ারিং স্ট্রেইটে!'

'ওগুলো মিলিটারির স্টেশন ছিল না,' গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল *পাথর ভাঙা*। 'গোপন কিছু হচ্ছিল নর্থ রিজে। জানতে পারিনি কী নিয়ে গবেষণা হচ্ছিল। তবে শুনলাম, গত তিরিশ বছরে আর্কটিক সার্কেলে কোনও রিসার্চ স্টেশন তৈরি করেনি সিআইএ। শেষেরটা বন্ধ করেছিল বহু বছর আগে। সামান্য গুঞ্জন শুনলাম, এসব স্টেশন আসলে তাদেরই। কাউকে চেপে ধরিনি আরও তথ্য পাওয়ার জন্যে। কাজটা উচিত হতো না।'

কয়েক মুহূর্ত পর বলল জেরাল্ড, 'তার মানে গোপনে কোনও রিসার্চ হচ্ছিল। এটা হতেই পারে।'

গ্লাসে চুমুক দিল ডিগবার্ট। 'হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু ওসবের ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে মরে যাওয়াও কোনও কাজের কথা নয়।'

'ধরে নিলাম সিআইএ ওখানে রিসার্চ স্টেশন রেখেছে। কিন্তু তা করবে কেন? কী কারণে? কোথায় পেল ফাণ্ডিং? আলাস্কার নর্থ রিজে কী আছে যে বাজেট দেয়া হবে?'

'জানি না।'

'তার মানেই কিছু পেয়েছে তারা,' ডিগবার্টের চোখে চোখ রাখল টম জেরাল্ড।

'আমার জানা নেই কিছু পেয়েছে কি না,' বলল *পাথর ভাঙা*।

আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'কিন্তু, বাছা, ওরা কিছু গোপন করতে চাইছে। আসলে আড়াল করছে। অন্যদের চোখ সরিয়ে রাখতে চাইছে ওদিক থেকে।' উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করল ডিগবার্ট।

'একই স্টেশনে মারা গেছে সৈনিকরা?' জানতে চাইল টম।

'না। আলাদা স্টেশনে। বেশ কয়েকটা।' চুপ হয়ে গেল ডিগবার্ট। চেহারা দেখে মনে হলো প্রসঙ্গটা অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে তার কাছে। 'খারাপ কিছু হয়েছে, বাছা। দৈনিক পত্রিকা, রেডিয়ো বা টিভিতে কিছুই বলা হয়নি। ছড়িয়ে পড়তে দেয়া হয়নি কোনও খবর। ক্ষমতাশালী কেউ বন্ধ করে দিয়েছে খবরের পাইপ লাইন।' চট্ করে ভল্টের চারপাশ দেখে নিল ডিগবার্ট। 'আরও অস্ত্র রাখব বাংকারে। লাগতে পারে।'

মৃদু হাসল টম জেরাল্ড। কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ খুলল, 'তার মানে, হামলা হয়েছে কয়েকটা রিসার্চ স্টেশনে। এর আরেকটা অর্থ, যারা হামলা করেছে তারা ঠিক জানে না কোথায় দরকারী জিনিস পাওয়া যাবে। শুধু জানে, এসব রিসার্চ স্টেশনের কোনওটায় জিনিসটা আছে। অর্থাৎ, সত্যিই কিছু আছে ওখানে। কেউ বা একদল লোক ওটা চাইছে।'

'এত গুরুত্বপূর্ণ কী আছে, যে দু'প্লাটুন মেরিনকে খুন করতে হবে?' মাথা নাড়ল ডিগবার্ট, 'গোপন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে একদল বিদেশি সৈনিক?'

'তেমন করলে যে-কোনও দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করত আমেরিকা,' বলল টম। 'কিন্তু তা করা হয়নি। তা হলে কী...' চুপ হয়ে গেল সে। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'তো একটা কথাই বেরিয়ে আসে... আমরা নিজেরাই ওদেরকে মেরে ফেলেছি।'

চুপ করে টম জেরাল্ডকে দেখছে হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। 'ওখানে যা ঘটেছে, তা খুব অস্বাভাবিক,' বিড়বিড় করল সে।

তেইশ

হোয়াইট মাউন্টেনের দক্ষিণ দিকের রিসার্চ স্টেশনে যাওয়ার সহজ পথ খুঁজতে টপোগ্রাফিকাল ম্যাপ দেখছে মাসুদ রানা। পাশে ম্যাপে মনোযোগ দিয়েছে ঘর্মাক্ত ও বিরক্ত কং তানামুরা। সামনের পাহাড়ি, এবড়োখেবড়ো, বিপজ্জনক, বিশাল রেঞ্জ দৈর্ঘ্যে তিরিশ মাইলের বেশি। দেরি না করে অসুস্থ প্রফেসরকে নিয়ে পেরিয়ে যেতে হবে ওই এলাকা।

ভুরু কুঁচকে তানামুরাকে দেখল রানা।

জবাবে আস্তে করে মাথা নাড়ল জাপানি যোদ্ধা। এখনও হাঁপিয়ে চলেছে। একটু আগে খুব খাড়া পথে উঠে এসেছে ওরা।

হাঁটবার পথ নেই বললেই চলে। কেউ আহত হলে, বা অসুস্থ হলে তার সর্বনাশ। ম্যাপ অনুযায়ী সামনের পথ আরও অনেক কঠিন।

খুব কষ্ট হয়নি পাহাড়ের উত্তর রিজ পেরিয়ে আসতে। কপাল ভাল ছিল, বেনাম হওয়া নদী ফসিল ক্রিক পেরোতে হয়নি। অসুস্থ প্রফেসরকে নিয়ে দানবের হামলা ঠেকানো বা উল্টো আক্রমণ অসম্ভব। আসলে ওদের কাজ হয়ে উঠেছে রেসকিউ মিশন।

চাইলেই গতি বাড়িয়ে পাহাড় পেরিয়ে যাবে, তা হবে না। সমতল বড়জোর এক শ' গজ, তারপর হয় উঠে যেতে হবে খাড়াই বেয়ে, নইলে নামতে হবে উৎরাই ভেঙে। শক্ত মানুষও এ পথে চললে কিছুক্ষণের ভিতর ভেঙে পড়বে ক্লান্তিতে। তার ওপর

ওদের সঙ্গে রয়েছেন অসুস্থ প্রফেসর।

'জয়েস!' ডাক দিল রানা।

সামনে এসে রাইফেলের নলে ভর করে কুঁজো হয়ে দাঁড়াল আর্থার জয়েস। প্রথম দর্শনেই তাকে পছন্দ করেছে রানা। অবশ্য, সুযোগ হয়নি আলাপ করার। এখন যে কথা বলবে, তাতে মায়া-দয়ার চিহ্নও থাকবে না।

'নীচের এলাকা উইণ্ডি গ্যাপ,' বলল রানা, 'একমাত্র গিরিপথ যেদিক দিয়ে পেরুনো যাবে পাহাড়। সামনের ব্লাফে হার্নেস বেঁধে প্রফেসরকে নামিয়ে দেব। ...পারবে?'

ম্যাপ দেখল আর্থার জয়েস। 'খাড়া এক শ' ফুট দেয়ালের মত ওটা। কিন্তু নামাতে পারব।'

'ঠিক আছে, তৈরি হও। দরকার পড়লে সাহায্য চাইবে।' ম্যাপ গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা।

রওনা হতে হবে, হাঁক ছেড়ে সবাইকে জানাল তানামুরা।

প্রফেসরের পাশে পৌঁছে রানা দেখল অসুস্থ মানুষটার বাহুতে আইভি দিয়েছে জিনা। 'আমাদের হাতে সময় নেই, জিনা,' নিচু স্বরে বলল ও। 'হান্টারকে নিয়ে নামতে শুরু করব আমি।'

'যদি দানবের চিহ্ন দেখেন, ফিরে এসে সাবধান করবেন?' জানতে চাইল তানামুরা।

'নতুন অনেক কিছু শিখছে ওটা,' বলল রানা, 'যে-কোনও সময়ে হামলা করবে। কেউ বাড়তি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠো না, তৈরি রেখো রাইফেল।'

'কী করে বুঝলেন ওটা নতুন কিছু শিখছে?' জানতে চাইল জিনা।

'আগে অনুসরণ করছিল, কিন্তু এখন অ্যামবুশ করছে,' বলল রানা। 'আরও কিছু ব্যাপার আছে। পরে এ নিয়ে আলাপ করব। আপাতত ভরসা হান্টার, মনে হয় না ওর কান ফাঁকি দিয়ে কাছে

আসতে পারবে।'

'আমার মনে হয় মিস্টার রানার পিছনে থাকা উচিত জিনার,' বলল তানামুরা। 'ওর কাছে থাকছে একমাত্র রাইফেল, যেটা ওটাকে আহত করতে পারবে।' রানার দিকে চাইল সে। 'আপাতত প্রফেসরকে বয়ে নিয়ে যাক বাড রলিন্স আর আর্থার জয়েস।'

আপত্তি তুলল না রানা। রওনা হওয়ার পর থেকে দেখেছে, অন্যদের চেয়ে দৃঢ়সংকল্প আর কষ্ট-সহিষ্ণু এই জাপানি যোদ্ধা। ধৈর্যেরও অভাব নেই। দরকার পড়লে লড়াই করবে প্রাণপণ। ধীরে ধীরে তানামুরার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মেছে ওর মনে। আবার এ-ও টের পেয়েছে, ওর ওপর গভীর আস্থা জাপানির।

এদিকে সব সময় ভারী রাইফেল ও গুলি বইতে গিয়ে ক্লান্তির ছাপ পড়েছে জিনার চোখে-মুখে। এ ছাড়া, রয়েছে রোগীর সেবা, ঘুম নেই বেচারির চোখে। ফ্যাকাসে মুখ। কপাল ও ঘাড় থেকে দরদর করে ঝরছে ঘাম। ভেস্টে প্যাড থাকা সত্ত্বেও কাঁধে চেপে বসেছে অস্ত্রের ফিতার গভীর দাগ।

জিনার পাশে হাঁটতে শুরু করে বলল রানা, 'পেরোতে হচ্ছে রুক্ষ, পাহাড়ি এলাকা। সর্বক্ষণ বয়ে নিয়ে চলেছ ভারী অস্ত্রটা। কিছুক্ষণের জন্যে তোমার রাইফেল আমার হাতে দিতে চাও?'

'নেবেন? থ্যাঙ্ক ইউ!' কাঁধ থেকে ফিতা খুলে রানার হাতে রাইফেল দিয়ে দিল জিনা।

একটু বিস্মিত হতে হলো রানাকে। ওর মনেই ছিল না ব্যারেট রাইফেল কতটা ভারী। ওজন কমপক্ষে ত্রিশ পাউণ্ড। দিনের পর দিন সামান্য আপত্তি ছাড়াই বইছে জিনা। দেখে মনে হয়েছে, ওটা কোনও কষ্টের কাজই নয়। কাঁধে ব্যারেট ঝুলিয়ে নিল রানা। ওর মারলিন নিয়ে বোল্ট টেনে চেম্বারে বুলেট ঢোকাল জিনা। ভাল করেই জানে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে অস্ত্রটা।

কপাল থেকে চুল সরিয়ে ঝট্ করে কাঁধে তুলল মারলিনের কুঁদো। অস্ত্র তাক করেছে দূরে। ওটা নামিয়ে ঝুলিয়ে রাখল কাঁধে। স্বাভাবিক সুরে বলল, 'আমার রাইফেলটার নাম ব্যারেট। চেম্বারে বুলেট আছে। ওটা সেফটি ক্যাচ। সেমিঅটো .৫০ ক্যালিবারের বুলেট। আগে যদিও একবার ব্যবহার করেছেন, তবু জানিয়ে রাখছি: বেদম ঝাঁকির জন্যে তৈরি থাকবেন। আশা করি আপনি পাঁচটা বুলেট শেষ করার আগেই পাশে পৌঁছে যাব। ...আপনার মারলিন রাইফেল একটু হালকা, কিন্তু খারাপ নয়।'

'বুলেট ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই পাশে পৌঁছবে, এর ব্যাখ্যা কী?' জানতে চাইল রানা।

কপাল থেকে ঘাম ফেলল জিনা। 'কারণ, বাড়তি ম্যাগাযিন আমার কাছে।'

'ও।'

'মুভ!' পিছনে নির্দেশ দিল তানামুরা, কণ্ঠ শুনে মনে হলো যুদ্ধে চলেছে আর্মির কোনও জেনারেল।

আগেই রওনা হয়েছে রানা। ওর বামদিকে হান্টার। ডানে জিনা। হুঁশিয়ার চোখে চারপাশ দেখতে দেখতে চলেছে ওরা। হিসাব কষে দেখেছে রানা, মাঝের এই পাহাড়ি এলাকা পেরিয়ে রিসার্চ স্টেশনে পৌঁছবার আগে হয়তো আরেক রাত পার করতে হবে খালি জায়গায়। সেক্ষেত্রে হয়তো আবারও হামলা করবে দানবটা।

যাকে গুলি করে হত্যা করা যায় না, কীভাবে তাকে ঠেকাবে ওরা?

চব্বিশ

ল্যাপটপের স্ক্রিনে ই-মেইল পড়ছে ডেপুটি মার্শাল টম জেরাল্ড। সব সময় নিজেকে অদক্ষ কমপিউটার অপারেটর মনে হয়েছে, কোনওমতে চালিয়ে নিয়েছে কাজ। ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি না করে অন্যের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ অনেক সহজ মনে হয়েছে ওর।

ধূসর-নীল মনিটরে পড়ছে এগযেকিউটিভ অর্ডার। তারিখ এক সপ্তাহ আগের। জানানো হয়েছে, প্রয়োজন পড়লে সার্চ টিম গঠন করে আলাস্কায় তদন্ত করতে যেতে পারে ও। একটা নাম মনোযোগ কাড়ল ওর: আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি। তিনি সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের এগযেকিউটিভ ডিরেক্টর।

ইন্টারনেট ঘাঁটতে শুরু করে জেরাল্ড জানল, ক্রিপটোযুলোজি ও ইকোসিস্টেম বিষয়ে দুনিয়া-সেরা বিজ্ঞানী এই বাঙালি ভদ্রলোক। বার-বার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন, ধ্বংস হচ্ছে স্বাভাবিক প্রকৃতি। ফলে বিলুপ্ত হবে অসংখ্য প্রাণী। এবং শেষে ক্ষতিগ্রস্ত হবে গোটা মানবজাতি। প্রায়-বিলুপ্ত প্রাণী ও বিপর্যস্ত পরিবেশ সংরক্ষণে লড়াই করছে তাঁর ইন্সটিটিউট।

সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউট সম্পর্কে আরও পড়তে শুরু করে টম ভাবল: ওই বয়স্ক ভদ্রলোককে কেন নেয়া হলো মিলিটারি মিশনে? পরের পেজে পেল আরেকটি নাম: মাসুদ রানা। তাকে নেয়া হয়েছে স্কাউট হিসাবে।

আর্মিতে অভাব নেই দক্ষ স্কাউটের, ভাবল জেরাল্ড। তা হলে সিভিলিয়ান স্কাউট লাগল কেন? নিজেরা পরিস্থিতি সামলাতে পারছে না আর্মি? নাকি ওই বুনো এলাকা বা টপোগ্রাফির ওপর এক্সপার্ট এই লোক? এসবের ভেতর আরও কোনও ভেদ থাকতে পারে?

একটা জিজ্ঞাসা সাধারণত তৈরি করে অন্য আরেকটা।

কেন এসব টপ সিক্রেট সিআইএ রিসার্চ স্টেশন আলাস্কায়? দেশ যখন বাজেট হ্রাস করছে, সেখানে এ ধরনের গোপন রিসার্চ কীসের জন্য? তার চেয়েও বড় কথা, এসব করাচ্ছে কে? কর্তৃত্ব কার হাতে?

ইন্টারনেট ঘেঁটে সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের ফোন নম্বর বের করল জেরাল্ড। মনে রেখেছে সংগঠনের ঠিকানা। স্থির করল, প্রথমেই ওখানে যাবে তদন্ত করতে। তারপর খোঁজ-খবর নেবে ওই স্কাউটের বিষয়ে। একবার মনে হলো, ওই লোকের নাম আগেও শুনেছে। যদিও মনে এল না কিছুই।

মাসুদ রানা যে-ই হোক, বিশেষ কোনও গুণ আছে তার। আলাস্কা যতই বুনো হোক, বা মানুষ খুন হয়ে যাক নানা কারণে, তাও ওই এলাকা এ দেশেরই– খুব জরুরি কারণ না থাকলে কখনও সিভিলিয়ান কোনও স্কাউটের সাহায্য নিত না আর্মি।

তারপর হঠাৎ মনে পড়ল ওর, রানা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির মালিক মাসুদ রানা। সুনাম আছে তাঁর সংগঠনের। এ ছাড়া, আর্কিয়োলজিস্ট হিসাবেও নাম করেছেন তিনি। নানান অভিযানের কারণে সত্যিকারের সাহসী অভিযাত্রী বলা হয় তাঁকে। নানান সহায়তা দেন সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটকে। বেশ কয়েকবার জঙ্গল-পাহাড় ও সাগরে হারিয়ে যাওয়া মানুষকেও খুঁজে বের করেছেন তিনি।

টম জেরাল্ড ভাবল, এমন বিখ্যাত একজনকে স্কাউট হিসাবে

আলাস্কায় চাইল কেন আর্মি? আর সঙ্গেই বা কেন দেয়া হলো একটা হিট টিম! নামকরা স্কাউট আর সঙ্গে খুনি দল– এর মানে কী? এর কোনও আগামাথা বোঝা যাচ্ছে না। সব যেন হেঁয়ালি।

ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে ৯ এমএম সিগ সাওয়ার ২২৬ সেমিঅটো পিস্তল বের করল টম জেরাল্ড, দেখে নিল বুলেট আছে চেম্বারে। সেফটি ক্যাচ অফ করে দিল। বিড়বিড় করে বলল, 'এবার কাজে নামতে হবে।'

দরকারী কাগজপত্র নিয়ে গাড়িতে রাখল নিনা সয়্যার। এখনও স্থির করেনি ডিএনএ-র তথ্য নিয়ে কী করবে। কিন্তু এ-ও ঠিক, সিআইএ থেকে সহায়তা দেয়া না হলেও চুপ করে বসে থাকবে না। দেরি না করে যোগাযোগ করবে বেসরকারী বৈজ্ঞানিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে।

রাতে ঘুমাতে পারেনি এক ফোঁটা। ভেবে রেখেছে, কোনও তর্কে যাবে না নিম্নপদস্থ সরকারী অফিসারদের সঙ্গে। মস্ত বিপদে আছেন ডক্টর সিরাজউদ্দীন আলাস্কায়। যখন তখন খুন হবেন ওই জন্তুর হাতে। প্রথম কাজ প্রফেসরকে সরিয়ে আনা।

এসব ভাবতে ভাবতে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেল নিনা।

বিশ মিনিট ড্রাইভ করবার পর ফোন দিল ডক্টর ডেভিড গ্রেবারকে। এখনও জানে না কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবেন ভদ্রলোক। কিন্তু এরই ভিতর যদি প্রফেসর সিরাজউদ্দীনের সঙ্গে যোগাযোগ না করে থাকেন, তো বুঝে নিতে হবে, ওই লোককে দিয়ে কাজ হবে না। সেক্ষেত্রে দেরি না করে ল্যাংলি ছেড়ে নিজের পথ ধরবে নিনা।

ল্যাংলি যাওয়ার সময় উত্তর সড়ক ব্যবহার করল। পাহাড়ি ঘোরানো পথে নেমে চলেছে গাড়ি। পাশেই গভীর খাদ। দক্ষ ড্রাইভার নিনা বেশ গতি তুলেছে, অভ্যস্ত এই স্পিডে।

আর তখনই ঘটল দুর্ঘটনাটা।

চমকে গেল নিনা সয়্যার।

ইঞ্জিন হুডের নীচে ঘটাং আওয়াজ হলো, পরক্ষণে একদিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল দ্রুতগতি গাড়ি। দড়াম করে গিয়ে গুঁতো দিল গার্ডরেইলে।

ভয়ে চিৎকার করে উঠল নিনা।

উড়ে গেছে বেড়ার মত ইস্পাতের গার্ডরেইল। ওই ফাঁক দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল গাড়ি। বাতাসে পর পর দুই ডিগবাজি খেয়ে রওনা হয়ে গেল অনেক নীচের জমিনের দিকে। কার্নিশের মত কয়েকটা জায়গায় ঠোকর খেয়ে খেয়ে পড়তে লাগল।

চোখের সামনে সবুজ, কালো ও সাদা আলো দেখল নিনা। তারপর আছড়ে পড়ল গাড়ি। মাথায় আঘাত লাগায় চোখের সামনে আঁধার হয়ে গেল সব।

দপ্ করে ধরে গেল আগুন।

পঁচিশ

হঠাৎ করেই থমকে গিয়ে ডান হাত উপরে তুলল রানা।

থেমে গেল সবাই। চোখ রানার ওপর।

কেন সতর্ক হয়ে উঠেছে রানা, নিজেও জানে না। হতে পারে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ও হয়ে গেছে পাথরের মূর্তি। মাথা নিচু করে একত্র করল সমস্ত মনোযোগ।

ডাকছে অসংখ্য পাখি। কিন্তু এক সেকেণ্ডের জন্য থেমে গিয়েছিল সব, তারপর শুরু হয়েছে আবারও। কিন্তু শব্দের মাত্রা একটু অন্যরকম।

প্রথমে রানা ভেবেছিল জঙ্গলে নড়তে শুরু করেছে কোনও ভালুক বা এল্‌ক্‌, কিন্তু পরক্ষণে বুঝেছে, তা নয়। অন্য কিছু বিচলিত করেছে পাখ-পাখালিকে। ওর দলের কারও কারণে শব্দ হয়ে থাকলেও এমন হওয়ার কথা নয়। অনেক আগেই ওদেরকে দেখেছে পাখিরা। সবার গায়ের গন্ধ পেলে অন্তত দু'মাইল দূরে সরে যাওয়ার কথা বড় কোনও হিংস্র জন্তুর।

ধীরে ধীরে ডানে ও বামে চাইল রানা।

ওরা আছে ব্লাফের সমতল এক জায়গায়। একপাশে কালো উঁচু পাহাড়। উপর ও নীচের পাহাড় দেখা শেষ করল রানা। কিছুই নেই দেখবার মত। নেই অস্বাভাবিক কোনও আওয়াজও। ওদের চারপাশে উজ্জ্বল নীল আকাশে খোঁচা মারছে পেরেকের মত পাহাড়ের একের পর এক সবুজ চূড়া, অপূর্ব সুন্দর। বিশ্বাস হতে চায় না, এই স্বর্গে বাস করে ভয়ঙ্কর খুনি এক দানব।

ঘাড় ফিরিয়ে তানামুরার দিকে চাইল রানা।

নীরবে ভুরু কুঁচকে ওর দিকে চেয়ে আছে জাপানি যোদ্ধা।

আবারও মুখ ফিরিয়ে নিল রানা, একবার ভাবল রওনা হবে, কিন্তু সায় পেল না অন্তর থেকে। গোলমাল আছে কোথায় যেন। এমন কিছু, যা খুব অস্বাভাবিক। উতে ইণ্ডিয়ান চিফের কথা মনে পড়ল: সব সময় সত্য বলে জঙ্গল, কখনও মিথ্যা বলে না।

ঠিক তখনই রানার পিছনে এসে দাঁড়াল তানামুরা। অস্ত্রের নল তাক করেছে কালো পাহাড়ের দিকে। পেরিয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর বলল সে, 'ওটা কিন্তু কখনও দিনে হামলা করেনি। এখন নিজের কৌশল পাল্টে নেবে কেন?'

দ্বিধায় পড়ল রানা। কুঁচকে গেল ভুরু। বলল, 'কারণ, ওকে

খেপিয়ে দিয়েছি আমি। আহত করেছি বলেই প্রতিশোধ নিতে চাইবে। সবাইকে বলো ছড়িয়ে পড়তে, কিন্তু বেশি দূরে যেন না যায়। প্রত্যেকের মাঝে থাকবে পাঁচ ফুট জায়গা। আমার ভুল না হয়ে থাকলে, ওটা হামলা করবে ওপর থেকে।'

'হাই।'

জিনাকে হাতের ইশারা করে আবারও রওনা হলো রানা। 'মারলিন ফিরিয়ে দিয়ে ব্যারেট হাতে তৈরি থাকো।'

বদল করে নিল ওরা অস্ত্র। পরীক্ষা করল যে যার অস্ত্রের ম্যাগাযিন ও চেম্বার।

একবার পিছনে চাইল রানা।

বাড রলিন্স ও আর্থার জয়েস বয়ে আনছে প্রফেসরকে। তাদের দিকে একবার ইশারা করে কালো পাহাড়ের চূড়ার দিকে চলল রানা।

নীরবে পিছু নিল সবাই।

প্রতিবার সামনের জমি বা পাথর পরখ করছে রানা, তারপর পুরো ভর দিচ্ছে পায়ের। খেয়াল রাখছে, বদলে যাচ্ছে কি না বাতাস, বা কোনও গন্ধ। মারলিন রাইফেলে আছে ছয়টি তাজা বুলেট। যে-কোনও ছুটন্ত গণ্ডারকে থামিয়ে দিতে পারবে। অথচ, এত শক্তিশালী বুলেটও ঠেকাতে পারছে না ওই দানবকে। ওটাকে শেষ করতে কিছুই যেন যথেষ্ট নয়। গুলি কেন ওটার দেহ ভেদ করছে না, তা বোঝা যাচ্ছে না। আগে বেরিয়ে যেতে হবে এই মৃত্যু-ফাঁদ থেকে, তারপর ভেবে দেখতে হবে।

রানার ধারণা, ওই দানবের দেহে একই জায়গায় ব্রাশ ফায়ার করলে বা জিনা ওর ব্যারেট দিয়ে পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করলে কাবু হবে ওটা। তখন তানামুরা কাটানা দিয়ে ওটার মাথা কেটে নিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। কিন্তু এসব প্রায় অসম্ভব কাজ। হাঁটতে হাঁটতে ওর মুখ বেয়ে পড়ছে শীতল ঘাম। চোখ রেখেছে

চারপাশে।

কালো নেকড়েকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে। বার-বার মাথা ঘুরিয়ে দেখছে সবুজ জঙ্গল। কালো আগ্নেয় পাথরে ঢুঁকছে সামনের দুই পা। চাইছে শেষ হয়ে যাক লড়াই। কিন্তু রানা নির্দেশ না দিলে হামলা করবে না।

ভাবতে ভাবতে চলছে রানা, হঠাৎ থমকে গিয়ে কাঁধে তুলে নিল মারলিন রাইফেল। যে-কোনও মুহূর্তে গুলি ছুঁড়বে। হঠাৎ করেই থেমে গেছে চারপাশের স্বাভাবিক সব শব্দ। থমথম করছে পাহাড় ও জঙ্গল।

মনে হলো বরফের মত জমে গেছে কালো নেকড়ে।

চোখের পলক পড়ল না রানার।

হান্টারের চোখকে অনুসরণ করল ও।

বাদুড়ের কানের মত খাড়া হয়ে গেছে নেকড়ের কান। যে-কোনও আওয়াজ বা ফিসফিস শুনতে তৈরি। টের পাবে কেউ নড়লে। কিন্তু হতাশ মনে হলো ওটাকে।

দানবটা আছে খুব কাছে। হয়তো সবুজ ঘাস মাড়িয়ে আসছে বলেই আওয়াজ নেই। ৪৫.৭০ রাইফেল হাত বদলে নিল রানা, চট করে দেখল জিনাকে।

সতর্ক হয়ে উঠেছে মেয়েটা। চোখ বিস্ফারিত।

চোখের ইশারায় দূরের পাথুরে এলাকা দেখাল রানা। দৈর্ঘ্যে ওটা চল্লিশ ফুট, এবড়োখেবড়ো। ওই জায়গায় ভর করেছে পাহাড়ের চূড়ার কালো আঁধার।

আস্তে করে মাথা দোলাল জিনা।

রানার চোখ অনুসরণ করে কালো, উঁচু পাহাড়ের দিকে চাইল তানামুরা।

কাঁধে শটগান তুলে নিয়েছে টড ওয়েইলার।

কৃষ্ণ পাহাড়ের ওদিকে কোনও গুহা থাকলে অ্যাম্বুশ করা

সহজ হবে, ভাবল রানা। আগে কখনও দিনের আলোয় হামলা করেনি দানব, কিন্তু বাড়তি সুযোগ পেলে করবে না, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। আরেকটা কথা ভাবল রানা: ছোট ক্যালিবারের অস্ত্রে কিছু হয় না ওটার, কিন্তু হতেই পারে পাহাড়ের শৈলশিরায় গুরুতর ভাবে ওটাকে আহত করতে পেরেছে ও। হয়তো এখনও অসুস্থ, নড়তে চাইছে না।

সামনের পাথুরে, কালো পাহাড় থেকে যখন তখন আক্রমণ আসতে পারে। তার জানা থাকার কথা, এদিক দিয়ে চলেছে ওরা। আর এখন হামলা করলে উপায় থাকবে না ওদের।

থেমে অপেক্ষা করবে ওরা, সে রাস্তা নেই।

পাথুরে পাহাড়ে যাওয়ার সময় সার্চ করতে করতে যাবে, তাও সম্ভব নয়। রাত নামার আগেই পৌঁছুতে হবে নিরাপদ কোনও আশ্রয়ে।

মারলিন রাইফেল হাতে এক পা সামনে বাড়ল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল অন্যদেরকে।

অনুসরণ শুরু করেছে সবাই।

বাড রলিন্স ও আর্থার জয়েস বইছে অসুস্থ প্রফেসরের স্ট্রেচার। কাছেই নিরাপত্তা-মূলক পযিশনে টড ওয়েইলার, হাতে শটগান।

ওরা পাথুরে পাহাড় পেরোলে অ্যাম্বুশের সুযোগ হারাবে দানব। কিন্তু তার আগে স্ট্রেচার বহনকারী দুই কমাণ্ডো থাকবে অসহায়। প্রফেসরকে নামিয়ে অস্ত্র তুলতে হলে পেরিয়ে যাবে কয়েকটা মুহূর্ত।

'হান্টার,' ফিসফিস করল রানা। মুখ তুলে ওর দিকে চাইল না কালো নেকড়ে। 'খুঁজে বের কর। ওটা কোথায়?'

পাথুরে পাহাড়ে সবুজ গাছের ভিতর কালো একটা গুহার দিকে সরাসরি চেয়ে রইল হান্টার।

আর তখনই এল ওটা।

ছুটন্ত চিতার চেয়েও বেশি গতি তুলে মাত্র তিন সেকেণ্ডে পৌঁছুল। বিদ্যুদ্বেগে থাবা বসিয়ে দিল বাড রলিন্সের বুকে।

পরিষ্কার সব দেখল রানা।

বুকের মাংস খুবলে নিয়েই পরক্ষণে ঘাড় থেকে ছিঁড়ে নিল বাডের মাথা। পিছনে ছিটকে গিয়ে পড়ল ওটা। রগ থেকে ঝরঝর করে ঝরছে তাজা রক্ত। রলিন্সের চোখে প্রাণের আভা, কিন্তু এক সেকেণ্ড পর হয়ে গেল নিষ্প্রভ।

'শালার ঈশ্বর!' চিৎকার করে উঠল টড ওয়েইলার।

একই সময়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে আর্থার জয়েস। কিন্তু তার বুকের ব্যালিস্টিক ভেস্টের বড় এক অংশ ছিঁড়ে নিল দানব। প্রচণ্ড এক থাবড়া মেরে পাশের উঁচু পাথরের ওপাশে ছিটকে ফেলল কমাণ্ডোকে। স্বর্গের দিকে পা তুলে রইল জয়েস। বেঁচে আছে, না মরে গেছে, বোঝা গেল না।

টড ওয়েইলারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল দানব। কিন্তু সেমিঅটো শটগানের গুলির তোড়ে থরথর করে কেঁপে উঠতে হলো ওটাকে। ওই গুলিতে মরবে না। সবাইকে একই হামলায় শেষ করে দিতে সামনে বাড়ল আবারও।

গুলি লাগলে রেগে গিয়ে গর্জন ছাড়ছে, এত দ্রুত নড়ছে, রানা নিশ্চিত হতে পারল না টড ওয়েইলার মারা গেছে কি না। আগুনে পোড়া মুখের কমাণ্ডোকে পেরিয়ে গেল দানব। তানামুরার সাবমেশিন গানের গুলি এড়াতে সরে গেল বনমানুষের মত মস্ত এক লাফে। বড় এক পাথর টপকে গিয়ে পড়তে চাইল প্রেস্টন ওয়েস্টের বুকে।

কিন্তু ঝট্ করে সরে গেছে ব্রিটিশ সৈনিক, গুলি করছে ঝড়ের গতিতে। বার-বার লাফিয়ে উঠছে আগুন ঝরা রাইফেলের নল।

গাছগুলোর পাতায় আগুন ধরিয়ে দিল মাযল ফ্ল্যাশ।

চারপাশে চিৎকার, গর্জন, হুলুস্থুল।

গুলি করতে চাইল রানা, কিন্তু ওর সামনে পড়ে গেছে জিনা।

ঝট্ করে সরে গিয়ে গুলি করল রানা।

কয়েক পা ফেলে তানামুরার উপর চড়াও হতে গেল দানব। ওটা দেখতে প্রায় মানুষের মতই, কিন্তু আসলে পৃথিবীর যে-কোনও প্রাণীর চেয়ে অনেকগুণ বেশি হিংস্র।

গুলি করতে করতে ওটার গতিপথ থেকে সরে যেতে চাইল তানামুরা। গায়ের কাছে আসবার আগেই শেষ গুলিটা করল, তারপর লাফিয়ে গিয়ে পড়ল আরেক দিকে।

দানবের সামনে শুধু জিনা আর রানা।

জিনার উপর হামলে পড়তে চাইল ওটা। প্রচণ্ড এক থাবড়া মেরে সরিয়ে দিল রাইফেল। আর ওই বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে দূরের মাটিতে গিয়ে পড়ল জিনা।

পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে বুকে গুলি করতেই ব্যথা পেয়ে বিকট গর্জন ছাড়ল ওটা। তেড়ে এল রানার দিকে।

মাত্র এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে রক্তলাল চোখে তীব্র ঘৃণা দেখল রানা।

বেরিয়ে এসেছে ওটার তীক্ষ্ণধার দাঁত। দু'হাত বাড়িয়ে মরণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতে চাইল ওকে।

বাইম মাছের মত গা মুচড়ে সরে গেল রানা। তার আগেই গায়ের জোরে রাইফেলের কুঁদো নামিয়ে আনল দানবের মুখে।

মনে হলো না ব্যথার কোনও অনুভূতি আছে ওটার। প্রচণ্ড এক উল্টো চড় বসিয়ে দিল রানার গালে।

ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে পরক্ষণে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল রানা। লাঠিয়ালের মত ধরেছে রাইফেল। বুঝে গেছে, দেখাতে হবে জীবনের সেরা দক্ষতা।

সামনে বেড়ে বার-বার রানার মুখ লক্ষ্য করে থাবা মারতে

শুরু করেছে দানব।

পিছাতে শুরু করে রাইফেলটাকে লাঠির মত ধরে গোটা ছয়েক বিদ্যুদ্গতি হামলা ঠেকিয়ে দিল রানা। পরের বার থাবা মারতেই ঝট্ করে সরে গেল। ওর মাথার পাশের গ্র্যানেট বোল্ডারে নামল চাপড়। পাথরের বুকে খড়-খড় শব্দ তুলল নখের আঁচড়, জ্বলে উঠল কমলা আগুনের ফুলকি। কুঁজো বামনের মত পিছাতে শুরু করেছে রানা। নাকের সামনে দিয়ে ঘুরে গেল ধারালো কয়েকটা কালো নখ। পাথরে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তেও সামলে নিল রানা।

হৈ-চৈ-এর ভিতর কাউকে কাউকে অস্ত্র তুলতে দেখল রানা।

রাগে, উত্তেজনায় ঘড়-ঘড় গর্জন ছাড়ছে হান্টার। নিচু এক বোল্ডার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল দানবের কাঁধে। ঝুলছে মাংসপেশি কামড়ে ধরে। ছিঁড়ে ফেলছে শক্ত তন্তু।

বিকট গর্জন ছাড়ল দানবটা। হাত পিছনে নিয়ে চেপে ধরতে চাইল নেকড়েকে। তখনই লাফ দিয়ে নেমে গেল হান্টার। পরক্ষণে আবার চেপে বসল শত্রুর কাঁধে। এবার খপ্ করে ওকে ধরল দানব, ছিটকে ফেলে দিল অন্তত দশ ফুট দূরের বোল্ডারের উপর।

'গুলি করো!' গলা ফাটিয়ে নির্দেশ দিল রানা।

একই সময়ে লালচে ফুলকি ঝরাল কয়েকটা আগ্নেয়াস্ত্র।

এক দৌড়ে হান্টারের পাশে পৌঁছল রানা, গুলির আওতার বাইরে টেনে সরিয়ে নিল নেকড়েকে।

ওদিকে হাঁটু গেড়ে বসে ব্যারেট রাইফেল কাঁধে তুলেছে জিনা। প্রচণ্ড গর্জন ছাড়ল অস্ত্রটা। উগরে দিল পাঁচ ফুটি কমলা আগুন।

.৫০ ক্যালিবারের গুলি বিঁধতেই আর্তনাদ ছেড়ে ঘুরে গেল দানব। রানা খেয়াল করল, গুলি বুকে না লেগে বিঁধেছে বাহুতে।

অন্য হাতে চেপে ধরল আহত বাহু, ব্যথায় বসে পড়েছে মাটিতে।

ব্যারেটের রিকয়েল সামলে দ্বিতীয়বার গুলি করতে চাইল জিনা। এবার গুলি বিঁধল বুকের মাংসপেশিতে। একবার হাহাকার করে উঠে দুই লাফে ঘন জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল দানব। যাওয়ার পথে ভেঙে দিয়ে গেল ডালপালা।

'দাঁড়া!' পিছন থেকে চিৎকার করল জিনা।

এমপি-৫-এর খালি ম্যাগাযিন পাল্টে নিল তানামুরা, ঘামে চকচক করছে মুখ। নিজেকে সামলে নিতে চাইছে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'ওটাকে আহত করেছে কেউ?'

'পুরো দশটা কার্তুজ গেঁথেছি ওটার বুকে!' দাঁত খিঁচিয়ে বলল টড ওয়েইলার। ব্যস্ত হয়ে পড়ল শটগানে নতুন ম্যাগাযিন ভরতে। 'চামড়া ভেদ করেছে কি না জানি না! আগে কাউকে এত দ্রুত নড়তে দেখিনি!'

চুপ করে আছে রানা। ঘুরে দেখল বাড রলিঙ্গের মৃতদেহ।

লাশের পাশে গিয়ে থামল তানামুরা, সার্চ করল। রলিঙ্গের কোনও পরিচয়পত্র নেই। ডগ ট্যাগের প্রশ্নই ওঠে না।

ওদের দলের কাউকে কোনও আইডি দেয়া হয়নি।

সিরাজউদ্দীনের স্ট্রেচারের কাছে পৌঁছল রানা।

প্রফেসরের পাশে বসে ভাইটাল সাইন চেক করছে জিনা। নরম সুরে কথা বলতে শুরু করেছে। 'উত্তেজিত হবেন না, স্যর। সব ঠিক আছে। কোনও ভয় নেই। ওটা পালিয়ে গেছে...'

দাঁড়িয়ে আছে তানামুরা, মুখ কালো।

একটু দূরে চারপাশ দেখছে টড ওয়েইলার, চোখে পাগলাটে দৃষ্টি। স্বস্তি পাবে না ওই জন্তুটাকে খুন করতে না পারলে।

দানবের মুখোমুখি হয়েও নতুন করে আহত হয়নি হান্টার।

কাজে এসেছে জিনার গুলি। কিন্তু দানবটাকে প্রথমে চমকে দিয়েছিল কালো নেকড়েই, অপেক্ষা করেনি রানার নির্দেশের জন্য,

ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওর এলাকায় বড় কোনও জানোয়ারকে সহ্য করবে না। মরতেও দ্বিধা নেই। রানা অন্তরে বুঝল, পাহাড়ি এই এলাকায় হান্টার থাকলে ঠিকই খুঁজে বের করবে ওই দানবকে। তার ফলাফল: মরতে হবে কালো নেকড়েকে।

'প্রফেসর নিরাপদেই আছেন,' রানাকে বলল জিনা। 'কোনও চোট লাগেনি।'

নিজের দিকে মনোযোগ দিল রানা। বোল্ডারে আছড়ে পড়ে ছেঁচে গেছে হাড়-মাংস। জ্বলছে জায়গাটা। ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু ক'দিন আড়ষ্ট থাকবে পিঠের পেশি, কষ্টকর হবে উঠে দাঁড়ানো।

চারপাশে আছে নানান গাছ, কোনও কোনোটার ঔষধি গুণ কমিয়ে দেবে ব্যথা। কয়েকটা গাছের পাশে থামল রানা, সাবধানে বেছে নিল নির্দিষ্ট পাতা, মুখে ফেলে চিবুতে শুরু করেছে।

রানা অদ্ভুত লোক, জানে টড ওয়েইলার, দ্বিতীয়বার ওদিকে চাইল না। কিন্তু আগ্রহী হয়ে উঠল প্রেস্টন ওয়েস্ট। সরু হয়ে গেল চোখ। দানবের আঁচড়ে কয়েকটা অগভীর ক্ষত হয়েছে শরীরে, কিন্তু ঘাবড়ে যায়নি। একবার ভাবল, রানার কাছে জানতে চাইবে ওসব পাতা খেয়ে কী হবে। কিন্তু চুপ করে থাকল। বাড রলিন্সের মৃত্যুর কারণে মহা খেপে আছে বাঙালি লোকটা। থমথম করছে মুখ।

এসব পাতা আরও তিতা ও শুকনো হলে বা সেদ্ধ করলে কাজে আরও বেশি লাগত, কিন্তু আপাতত সেই সময় রানার হাতে নেই। সরাসরি পাতা চিবিয়ে খাচ্ছে বলে পরে খিঁচ ধরবে মাংসপেশিতে, মেনে নিতে হবে ওটা। আগে ব্যথা দূর করা জরুরি, নইলে মনোযোগ দিতে পারবে না কাজে। হান্টারের জন্য দুশ্চিন্তা নেই, আহত হলেও কিছুই পাত্তা দেবে না কালো নেকড়ে।

তানামুরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে এগিয়ে গেল রানা। চোখে চোখ পড়ল দু'জনের। 'এবার?' জানতে চাইল জাপানি।

'আগের প্ল্যান অনুযায়ী এগোতে থাকব,' বলল রানা, 'প্রথম সুযোগে রিসার্চ সেন্টারে পৌঁছে দেব প্রফেসরকে।'

'তারপর?'

'তারপর আবার বেরোব শিকার করতে,' শীতল হয়ে গেছে রানার কণ্ঠ। 'দরকার পড়লে দুনিয়ার শেষমাথা পর্যন্ত ধাওয়া করব ওটাকে।'

মাথা দোলাল তানামুরা। 'আমারও একই কথা। হয় আমি থাকব, নয় ওটা।'

'জয়েস,' ডাকল রানা। 'তৈরি হয়ে নাও। দু' শ' গজ দূরে ব্লাফ। নামিয়ে দিতে হবে প্রফেসরকে।'

'ঠিক আছে,' চাপা স্বরে বলল আর্থার জয়েস। এখনও হতভম্ব। কমব্যাট ভেস্ট ও কেভলার সুটে পাতলা লোহার তার না থাকলে মরত। হামলার সময় পাতলা টিশু পেপারের মত ইস্পাতের নেটিং ছিঁড়ে নিয়েছে দানব। বুকে ছেঁড়া লালচে পেশির ক্ষত থেকে পড়ছে রক্ত।

'টড ওয়েইলার আর আমি প্রফেসরকে বয়ে নেব,' বলল সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড তানামুরা। 'রানা, আপনি হান্টারকে নিয়ে সামনে থাকছেন?'

মাথা দোলাল রানা। 'পিছনে গার্ড দেবে জিনা আর জয়েস। ...জিনা-জয়েস, মনে রেখো, আগেও একবার পেছন থেকে হামলা করেছে, কাজেই আবারও করতে পারে। ...ঠিক আছে, চলো রওনা হওয়া যাক!'

এক মিনিট পেরোবার আগেই প্রায় ছুটতে শুরু করল ওরা।

রানার ধারণা, আপাতত আক্রমণ করবে না ওটা। কিন্তু ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। ওর মনে আছে, ব্যারেট রাইফেলের গুলি লাগতে খুব বিস্মিত হয়েছিল জন্তুটা। যেন বিশ্বাস করছিল না কোনও অস্ত্র তাকে এত ব্যথা দিতে পারে।

মাত্র কয়েক মিনিটে ব্লাফের কিনারায় পৌঁছল ওরা। সবার আগে র‍্যাপেল করে নীচে নেমে গেল টড ওয়েইলার। এরপর তানামুরা। ওদের কাজ নিরাপদে প্রফেরকে নীচে নামিয়ে নেয়া।

কোনও ঝামেলা ছাড়াই বাঙালি ডক্টরকে নামানো গেল। এরপর র‍্যাপেল করে নেমে গেল রানা, জিনা ও জয়েস।

'দড়ির কী হবে?' জানতে চাইল তানামুরা। 'ওটা পরে কাজে আসতে পারে। বেঁধে রাখা হয়েছে ওপরের গাছে।'

রানা জবাব জানে, কিন্তু কিছু বলবার আগেই আর্থার জয়েস বলল, 'দড়িটা বড় কোনও সমস্যা করবে না। এ জন্যেই দলে রাখা হয়েছে আমাকে।' জোড়া দড়ি ব্যবহার করে আবারও উঠতে লাগল সে। চূড়ায় উঠে হারিয়ে গেল। একটু পর দীর্ঘ অজগরের মত ঝপাৎ করে এসে নীচে পড়ল দড়ি। সাবধানে নেমে এল জয়েস। হাঁপিয়ে গেছে বড্ড। 'এক মিনিট, একটু বিশ্রাম নেব।'

তাড়া দিতে গেল না রানা। ওরা প্রত্যেকে হতক্লান্ত।

পাঁচ মিনিট পর দড়ি-দড়া গুছিয়ে নিল জয়েস, এম-২০৩ হাতে বলল, 'রওনা হই চলুন।'

ঢালু পথে চলেছে ওরা, পাশে ক্রিক। গেছে পাহাড়ের মাঝের উইণ্ডি গ্যাপের দিকে। সবার আগে দুলকি চালে ছুটছে কালো নেকড়ে হান্টার।

গিরিপথ পেরিয়ে প্রফেসরকে পৌঁছে দিতে হবে রিসার্চ স্টেশনে। যদি না পারে, রাতে আবারও হবে হামলা। গতরাতে কপাল ভাল ছিল, কিন্তু বার-বার সহায়তা পাওয়া যায় না ভাগ্যের।

মারলিন রাইফেল হাতে সাবধানে চলেছে রানা। যদিও জানে, জন্তুটাকে ঠেকাতে পারবে না এই অস্ত্র দিয়ে। চট্ করে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল জিনাকে। তার চোখে সতর্কতা আর হিংস্রতা। নতুন করে লড়তে তৈরি। অন্তর থেকে চাইছে, একবার

ওর রাইফেলের সামনে পড়ুক দানবটা। আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই।

মনে পড়ল রানার, ভয়ঙ্কর জানোয়ারটার লালচে চোখে অশুভ রক্ত-পিপাসা দেখেছে। বিকট গর্জন ছেড়ে ওদের উপর হামলে পড়েছিল। ওই দুই মারাত্মক থাবা নিশ্চিত করে মৃত্যু। বার-বার মরতে মরতেও বেঁচে যাচ্ছে ওরা। কিন্তু বুঝে গেছে রানা, হাল ছাড়বে না দানব, আপ্রাণ চেষ্টা করবে ওদেরকে খুন করতে। বিশেষ করে ওকে। ও একমাত্র মানুষ, যে মুখোমুখি হয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে চ্যালেঞ্জ। আঁধার রাতে হারিয়ে দিয়েছে ওটাকে। বেরিয়ে গেছে তার খপ্পর থেকে।

হ্যাঁ, ওকে শেষ করতে হামলা করবেই ওটা!

ছাব্বিশ

'সেলুলার ফোনে এসব বলা যাবে না,' ঘড় ঘড়ে কণ্ঠে বলল *পাথর ভাঙা* হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। 'ল্যাণ্ড ফোনে কল করো।'www.boighar.com

'আগে নাম্বার তো দাও,' ভাড়া করা ফোর্ড নিয়ে পেট্রল স্টেশনে ঢুকে পড়ল টম জেরাল্ড। আর মাত্র ত্রিশ মাইল গেলেই পৌঁছবে সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটে। তদন্ত করতে হলে প্রথমে ওখান থেকেই শুরু করা উচিত।

ডিগবার্টের দেয়া নম্বর নোটবুকে টুকে নিল টম, গাড়ি রেখে ঢুকে পড়ল পাশের টেলিফোন বুথে, কল করল। বুঝতে পারছে, দেরি না করে নামতে হবে কাজে।

প্রথম রিং শেষ হওয়ার আগেই ওদিক থেকে রিসিভার তুলল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। 'এক টুকরো খবর আছে। আমার এক লোক চেনে একজনকে, সে বলেছে ওসব রিসার্চ স্টেশনের লজিস্টিক, স্যাটালাইট সাপোর্ট এসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে আরেক লোক। বিশেষ করে হিট টিমের সঙ্গে স্যাটালাইট সংযোগ বন্ধ করে দিতে চেয়েছে। এসব যখন করছে, তার কোনও না কোনও উদ্দেশ্য থাকবেই।'

'তোমাকে ট্র্যাক করতে পারবে না তো?' জানতে চাইল জেরাল্ড। ওর মনে হলো, ফাঁদ পেতেছে কেউ। এসপিয়োনাজ কৌশলের বইয়ে প্রথম সূত্র ওটাই: মিথ্যা তথ্য দাও। দেখো খোঁজ নিতে শুরু করে কে। ছুঁচো বা গর্ত খুঁজতে গেলে এই কৌশল সেরা।

'আমার লোক সলিড,' বলল ডিগবার্ট। 'বহু দিনের পরিচয়।'

'কারও নাম দিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' চাপা শোনাল হ্যাঙ্কের কণ্ঠ, 'ওই লোকের নাম জেম্স সিমন্স। সিআইএ-র কর্মকর্তা। অবশ্য, কিছুই বলেনি ডিভিশনের কথা। তুমি ওখান থেকে শুরু করতে পারো। যদি চাও, খোঁজ লাগাতে পারি।'

দ্বিধায় পড়ে গেল টম।

আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেন ইউনাইটেড স্টেটসের জমিতে কোনও ফ্যাসিলিটি তৈরি না করে দ্য সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি। বড়জোর নিউ ইয়র্ক সিটিতে রাখতে পারবে কভার্ট সাইট বা ডোমেস্টিক অফিস। প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাণ্ডেটে বা সিআইএ চার্টারে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, দেশের ভিতরে কোনও অপারেশনে যেতে পারবে না ওরা। অথচ, আলাস্কার রিসার্চ স্টেশন ওদেরই হলে, কাঁচকলা দেখাচ্ছে আইনকে। প্রয়োজন পড়লে খুন করতেও দ্বিধা করবে না। কাজেই উচিত হবে না হ্যাঙ্ক

ডিগবার্টকে কাজে লাগানো। মস্ত বিপদে পড়তে পারে সে। শেষে হয়তো খুন হয়ে যাবে।

'না, আর খোঁজ নিতে হবে না,' বলল জেরাল্ড। 'কাজ এখান থেকেই ধরতে পারব। এমন ভঙ্গি নাও, তোমার কোনও আগ্রহ নেই ওই বিষয়ে। সবাই বুঝুক, ভয় পেয়েছ। আর তা-ই জানতে চাইছ না কিছু। আসলে এক সময় মেরিন ছিলে, আর ওখানে খুন হয়েছে একদল মেরিন সৈনিক, এজন্যে রেগে গিয়েছিলে। ওরা বুঝবে, একজন মেরিন সব সময় মেরিনই থাকে। নিজেকে ক্লিয়ার রাখো।'

মনের চোখে হ্যাঙ্ক ডিগবার্টকে মাথা দোলাতে দেখল টম।

'নিজের পিঠ বাঁচিয়ে চলো, বাছা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল হ্যাঙ্ক। 'নাক গলাতে চাইছ মস্ত বিপদে। আরও কয়েকটা কৌশল জানি, যেগুলো এখনও শেখোনি। ধরে নাও, ওরা চোখ রেখেছে তোমার ওপর। পিঠ বাঁচিয়ে, টম!'

'ঠিক আছে,' চট্ করে হাইওয়ে দেখে নিল টম। 'চারপাশে চোখ রাখব।'

'গুড।'

ফোন রেখে গাড়ির কাছে ফিরল জেরাল্ড। আগেও অস্বস্তি বোধ করছিল, এখন আরও বেড়েছে ওটা। আবারও মনে এল চিন্তাটা: ওই পাহাড়ি এলাকায় কী খুঁজছে ওরা? কেন সেজন্যে লাগবে সেরা ক্রিপটোযুলোজিস্ট? কী স্পিশিস খুঁজছে ওরা?

গাড়ির দরজা খুলল টম, ডুবে গেছে চিন্তায়।

মিলিটারি বা সিআইএ-র হয়ে কাজ করছে অ্যানথ্রোপলজিস্ট আর হাই-টেক মিলিটারি হান্টিং পার্টি। ওই দল শিকার করতে চাইছে এমন কিছু, যেটা আসলে মানুষ নয়।

তার মানে কোনও জানোয়ার?

হঠাৎ গলা শুকিয়ে গেল টমের।

কী ধরনের জানোয়ার?

মনে মনে বলল টম, 'ওখানে আছেন নামকরা ইকোলজিস্ট, এক বিখ্যাত স্কাউট, হাই-টেক কিলিং টিম... কোনও জন্তুকে খুন করতে? আর ওই জন্তু হামলা করছে সৈনিকদের ওপর? সে কারণে ওটাকে খুন করতে চাইছে? তা হলে কি একটা জন্তু ধ্বংস করে দিয়েছে ওসব রিসার্চ ফ্যাসিলিটি?

এটা অবিশ্বাস্য মনে হলো ওর কাছে।

আবারও প্রথম থেকে ভাবতে লাগল।

বড় কোনও সূত্র চোখ এড়িয়ে গেছে, এমন নয় তো?

নাহ!

অনেকক্ষণ গাড়ির পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল টম জেরাল্ড। ভেবে দেখল, সত্যিই কোনও জন্তু সৈনিক ও বিজ্ঞানীদেরকে খুন করে থাকলে, বা রিসার্চ ফ্যাসিলিটি ধ্বংস করে থাকলে, প্রথম কাজই হবে ওটাকে খুন করা। আর সে কাজেই পাঠানো হয়েছে ওই দলকে।

তার আগে মনে প্রশ্ন জাগে, কেন ওরকম হয়ে উঠল ওই পশু?

থাক্‌ ওই চিন্তা।

ওটার কোনও নাম দিয়েছে ওরা। কী জাতের প্রাণী তা বুঝতেই সঙ্গে করে নিয়ে গেছে বয়স্ক প্রফেসরকে।

ওটা এখনও জীবন্ত।

ট্র্যাক করে খুন করতে হবে।

তাই চাই স্কাউট।

সঙ্গে আছে হিট টিম।

ওর থিয়োরি অস্বাভাবিক মনে হলেও ঘটনা বোধহয় তেমনই। এ ছাড়া, অন্য কোনও কারণও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অত্যন্ত ক্ষমতাশালী কেউ চাইছে কবর-চাপা দেয়া হোক ওই

অপারেশন। দরকার পড়লে মিথ্যা বলবে সিআইএ। আর এজেন্ট জেন্স সিমন্স নিশ্চিত করতে চাইছে, যেন নষ্ট করে দেয়া হয় কিলার টিমের স্যাটালাইট লিঙ্ক। কারণ জানে না টম, কিন্তু কমিউনিকেশন স্যাটালাইট বিকল করা মানেই... হ্যাঁ, স্যাবোটাজ করা হচ্ছে হিট টিমকে।

কেন?

জবাবও সহজ।

ওরা যেন আর্মির কাছ থেকে কোনও সহায়তা না পায়।

গহীন অরণ্যে বা দুর্গম পাহাড়ে মরলে মরবে ওরা।

ওদেরকে পরিত্যাগ করেছে সিআইএ।

ভুরু কুঁচকে গেল জেরাল্ডের। ওই জন্তু যদি সত্যিই দুই প্লাটুন মেরিন সৈনিক খুন করে থাকে, অনায়াসেই ছোট একটা অ্যাটাক টিমকে শেষ করে দিতে পারবে।

কিন্তু ওটা কী জন্তু?

একেকটা হামলায় এতজন মানুষকে খুন করছে কীভাবে?

আর খুন করতে চাইছেই বা কেন?

ওটাকে যদি খুন করা জরুরি মনে হয়, তো হিট টিমকে শেষ করে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে কেন?

সব আগামাথা গুলিয়ে গেল না?

ওসব রিসার্চ সাইটে কী এমন জরুরি জিনিস ছিল, যে এত গোপন রাখতে চাইবে সিআইএ?

গোটা ওই অপারেশন স্যাবোটাজ করল কে?

কী কারণে?

তার চেয়েও বড় কথা, এত ক্ষমতা আছে কার?

ইঞ্জিন চালু করে রওনা হয়ে গেল টম। পেট্রল স্টেশন থেকে বেরিয়ে উঠল একযিট র‍্যাম্পে, আগের চেয়ে অনেক সাবধান। চলেছে উত্তর দিকের পথে ইন্সটিটিউট লক্ষ্য করে। হয়তো ওখানে

পাবে জরুরি তথ্য বা সূত্র। পরক্ষণে ওর মনে হলো, ওখানে গিয়ে নতুন কিছুই জানবে না। মন বলছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আগে অনেক খারাপ দিকে মোড় নেবে।

সাতাশ

ক্রিকের পাশ দিয়ে গভীর এক গিরিসঙ্কট ধরে নেমে চলেছে রানা। এই ক্রিক গিয়ে পড়েছে আরও প্রশস্ত এক ক্রিকে। আপাতত টপোগ্রাফিকাল ম্যাপ দেখছে না রানা। তার দরকারও নেই, ওর দক্ষতা ওদেরকে পৌঁছে দেবে পাহাড়ি গিরিপথে। কিন্তু এখনও কমপক্ষে বিশ মাইল দূরে ওই গিরিপথ।

দলের সত্যিকারের অসীম সাহসী প্রাণ হচ্ছে কালো নেকড়ে হান্টার। মনে কোনও দ্বিধা নেই, তীরের মত গিয়ে দেখে আসছে সামনের পথ, আবার ফিরে যাচ্ছে পিছনে। যেন পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে দ্বিধান্বিত মানুষগুলোকে। লড়তে আপত্তি নেই ওর।

চারপাশে চোখ রেখেছে রানাও।

নীরব হয়ে আছে সবুজ জঙ্গল। তা অস্বাভাবিক নয়। পাহাড়-অরণ্যে মানুষ চলাচল দেখে অনেক আগেই সরে গেছে প্রতিটি প্রাণী।

একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে চাইল রানা। ঠিক ভাবেই আসছে সবাই, টলছে না কেউ। দ্রুত হাঁটছে না ওরা, আবার অতি ধীরেও নয়। সন্ধ্যার দিকে পৌঁছবে গিরিপথে। ওখানে থাকবার কথা ছোটখাটো কোনও গ্রাম। ফোন থাকবে, যোগাযোগ করতে

পারবে রিসার্চ স্টেশনে। আর্মি এসে তুলে নেবে ওদেরকে। আধুনিক চিকিৎসা দরকার অসুস্থ প্রফেসরের।

আরও পাঁচ ঘণ্টা হাঁটলে পৌছবে গ্রামে। রানা স্থির করেছে, প্রফেসরকে আর্মির হাতে বুঝিয়ে দেয়ার পর একা পিছু নেবে ওই দানবের। যেভাবে হোক খতম করবে রক্ত-পিশাচটাকে। ওর মনে আছে, শিকার করা হরিণের মাংসের অধিকার বজায় রাখতে আলফা নেকড়ের বিরুদ্ধে লড়তেও দ্বিধা করেনি তরুণ হান্টার। ওর নিজেরও উচিত বিনা দ্বিধায় দানবের বিরুদ্ধে লড়া। ওটা যতদিন বাঁচবে, থামবে না, খুন করবে একের পর এক মানুষ। হয়ে উঠেছে নরখাদক সিংহের মত। ওটাকে হত্যা না করলে আবারও খুন করবে।

খাবারের জন্য নয়, ভয়ের কারণে নয়, এলাকা দখলে রাখবার জন্যও নয়, নরখাদক বাঘের চেয়েও খারাপ ওই দানব– কোনও কারণ ছাড়াই খুন করছে খুনের আনন্দে। অন্তরহীন খুনের মেশিন হয়ে উঠেছে ওটা। কাজেই শেষ করতে হবে তাকে।

আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে বিশ্বের বুকে ওই দানবের মত আরও জানোয়ার ছিল কি না, জানা নেই রানার। ওদিকের পাহাড়ে কখনও যায়নি। কিন্তু সেই আমলে গোটা পৃথিবীর ক্ষমতা বোধহয় এসব দানবের হাতেই ফুর্তিতে খুন করত যাকে খুশি।

হারিয়ে গিয়েছিল ওই প্রজাতি, কিন্তু এসব রিসার্চ ফ্যাসিলিটির গবেষণার কারণেই নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে এই দানব। কাজেই প্রথম সুযোগে কপ্টারে করে পরের রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে যাবে, ঠিক করেছে রানা। খুঁজে বের করবে জরুরি কিছু জিজ্ঞাসার জবাব। আর তখন...

হঠাৎ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সাবধান করতেই কালো এক পাথরের মত কিছু থেকে ঝট্ করে বিদ্যুদ্গতিতে সরে গেল রানা।

সরু এক ফাটল থেকে বেরিয়ে এসেছে কালো-লালচে এক মুখ। থাবা পাকানো হাত ঘুরে গেল রানার নাকের সামনে দিয়ে। তীক্ষ্ণ নখর আঁচড় কাটল ওর চামড়ার শার্টের বুকে।

বাজ পাখির গতি তার, লাফিয়ে সামনের মাটিতে পড়েই ঘুরে উঠে দাঁড়াল। খিঁচিয়ে ফেলেছে দাঁত-মুখ। পরের সেকেণ্ডে ফুটবলের মত কয়েক গড়ান দিয়ে পৌঁছল জিনার সামনে, লাফিয়ে উঠেই এক চাপড়ে চিৎপাত করে দিল মেয়েটাকে।

জিনার হাত থেকে ছিটকে গিয়ে দূরে পড়ল ব্যারেট রাইফেল।

ঝটকা দিয়ে ঘুরে চেয়েছে তানামুরা, পরের সেকেণ্ডে পশুটার বুকে গাঁথতে চাইল এমপি-৫ সাবমেশিনগানের ম্যাগাযিন ভরা গুলি। অজস্র বুলেটের আঘাতে থরথর করে কাঁপল দানব, দ্বিতীয় সেকেণ্ডে প্রচণ্ড থাবড়া মেরে ছিটকে ফেলল জাপানি যোদ্ধাকে।

দূরে গিয়ে পড়ে প্রেস্টন ওয়েস্টের ভারসাম্য নষ্ট করে দিল তানামুরা। বোল্ডার ভরা মৃদু ঢালু জমিতে পড়ে গড়াচ্ছে দু'জন। জড়িয়ে গেছে আট হাত-পায়ে, পাথরে ঠোকর খেল হাতের অস্ত্র। থামল ওরা বড় এক বোল্ডারের গায়ে বাড়ি খেয়ে।

তখনই ঝড়ের গতিতে আর্থার জয়েসের উপর চড়াও হলো দানব। হাসিখুশি যোদ্ধার কেভলার জ্যাকেট এবার রক্ষা করতে পারল না তাকে। প্রচণ্ড এক চাপড় খেয়ে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল সে। তার আগেই বুক ভেদ করে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে বেচারার ফুসফুস।

উড়ন্ত অবস্থায় হতবাকের মত হাঁ করল জয়েস। পরক্ষণে মুখ থেকে ছিটকে বেরোল তাজা রক্তের স্রোত। মারা পড়ল মাটিতে পড়বার আগেই।

একই সময়ে ঝড়ের গতিতে তার পাশে পৌঁছল দানব, মৃত সৈনিকের কাদার মত নরম দেহটা তুলে ছুঁড়ে দিল টড

ওয়েইলারের দিকে। নিজেও ছুটতে শুরু করে পৌছে গেল শত্রুর সামনে।

আর্থার জয়েসের লাশ বড় এক লাফে এড়াল প্রকাণ্ডদেহী কমাণ্ডো, ঝট্ করে নল-কাটা শটগান তুলেই দুই ব্যারেল খালি করল দানবের বুকে-মুখে।

থমকে গিয়ে টলতে লাগল দানব। ছাড়ল বিকট এক গর্জন। দু'হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলতে চাইল টড ওয়েইলারকে। নাগালে পেলে দু'টুকরো করত, কিন্তু আগেই বুঝতে পেরেছে যোদ্ধা।

ঝট্ করে মাটিতে গড়িয়ে সরে গেল ওয়েইলার। পরক্ষণে উঠে বসেই আগুন ঝরাল শটগানের দুই ব্যারেল থেকে। তিন সেকেণ্ডে অন্তত বারোবার দানবের বুক-মুখে গুলি করল সে। ম্যাগাযিন ফুরিয়ে গেলেই যন্ত্রের মত লাগিয়ে নিল নতুন ক্লিপ।

একই কাজ করছে রানা। চারপাশ থরথর করে কাঁপিয়ে দেয়া শব্দ তুলছে মারলিন। গুলির ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলেছে দানব। টলতে শুরু করে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। খুব অবাক হয়েছে ওয়েইলার ও রানার উল্টো ঝটিকা হামলা দেখে।

তখনই ব্যারেট রাইফেল থেকে গুলি করল জিনা।

দানবের পাশে বিস্ফোরিত হয়ে নানাদিকে ছিটকাল ছোট এক গাছ। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বাড়তি সুবিধা পেল রানারা। গুলি করতে পারল ওটার গায়ে।

দু'হাঁটু গেড়ে বসে বুক চেপে ধরেছে জিনা। রিকয়েলের ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। গুলি ছুঁড়ছে রানা। গুলির আওয়াজে ভোঁ-ভোঁ করছে কান। ব্যারেট তুলে গুলি করতে চাইল জিনা। কিন্তু মাটিতে গিয়ে ঠেকল ভারী অস্ত্রের নল। আবারও তাক করতে চাইল দানবের দিকে। উপরে উঠল ব্যারেল।

কিন্তু জিনা গুলি করবে বুঝে গেছে দানব, মস্ত এক লাফে গিয়ে পড়ল বড় এক বোল্ডারের ওদিকে, অকল্পনীয় গতি। চওড়া

ঝর্না পেরিয়ে গেল দ্বিতীয় লাফে। ছিটকে গিয়ে ঢুকল ঘন জঙ্গলে।

শেষবারের মত গুলি করল রানা। আবছা ভাবে খেয়াল করল ভারী ৪৫.৭০ বুলেটের আঘাতে বিস্ফোরিত হলো এক গাছ। আগেই ওটাকে পাশ কাটিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে দ্রুতগতি দানব। মারাত্মক আহত নয়।

ঝর্নার পাড়ে অসংখ্য ধূমায়িত গুলির খোসা, অস্ত্রের নলের মুখ চুঁইয়ে বেরোচ্ছে ধূসর ধোঁয়া। থমথম করছে চারপাশ। শব্দ বলতে নিজের শ্বাসের আওয়াজ।

লালচে মুখে জঙ্গলের দিকে চেয়ে আছে টড ওয়েইলার, মনে হলো অপমানিত। অসহায় দৃষ্টি। শটগান নামিয়ে নিল।

বরফঠাণ্ডা ঝর্নায় পড়ে গিয়েছিল তানামুরা, কাঁপতে কাঁপতে উঠে এল। চট্‌ করে একবার দেখল মৃত আর্থার জয়েসকে। আবার চাইল ওদিকের জঙ্গলে। একবার ঝাঁকাল হাতের মুঠো।

দানবের খামচি খেয়ে আহত প্রেস্টন ওয়েস্ট। ছেঁড়া বাহু থেকে দরদর করে পড়ছে রক্ত। চেয়ে আছে দূরের পাহাড়ে।

জঙ্গল পেরিয়ে ঝড়ের গতিতে ওই পাহাড়ে গিয়ে উঠছে তখন দানব। গুলি শুরু করেছে তানামুরা ও ওয়েইলার। কিন্তু রেঞ্জের অনেক বাইরে ওটা।

'সিয ফায়ার!' নির্দেশ দিল রানা। 'কেউ গুলি নষ্ট করবে না!'

'ওটা আসলে কী...' বিড়বিড় করল তানামুরা।

প্রায় এক মাইল দূরের পাহাড়ের চূড়ায় উঠছে দানব। ঘুরে চাইল ওখান থেকে।

একই সময়ে উঠে দাঁড়াল জিনা, রাগে লালচে চোখ। খপ্‌ করে কোমর থেকে খুলে নিল ম্যাচেটি, ওটার কোপে কেটে ফেলল কাছের এক ডাল। দেরি না করে গেঁথে দিল মাটিতে। ডালের ডগার ভি'র উপর চাপিয়ে দিল .৫০ ক্যালিবারের ভারী রাইফেল, খুলে ফেলল স্কোপের কাভার। শীতল ক্রোধ জিনার মুখে।

চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিল অবাধ্য চুল।

দূরের পাহাড়ে চেয়ে আছে রানা।

চূড়ায় উঠে যুরে দাঁড়িয়ে বাতাসে থাবা মারল দানব, যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছে ওদেরকে।

'আর এক সেকেণ্ড দাঁড়া... জিনাকে বিড়বিড় করতে শুনল রানা।

তখনই এক মাইল দূর থেকে এল গুটার গর্জন। পাহাড়ে পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল ওই আওয়াজ।

'শুভরাত্রি,' ফিসফিস করে বলেই ট্রিগার টিপে দিল জিনা।

পেরিয়ে গেল এক মুহূর্ত, তারপর চূড়া থেকে ওদিকে ছিটকে গেল দানব।

ব্যারেটের পাঁচ গুলির ম্যাগাযিন খুলে নিল জিনা, ভেস্ট থেকে নিয়ে আটকে নিল নতুন একটা। নির্বিকার হয়ে গেছে চেহারা।

মনে মনে জিনার মার্কসউওম্যানশিপের প্রশংসা না করে পারল না রানা। এত দূরের টার্গেটে গুলি লাগাতে হলে চাই কঠোর ট্রেনিং।

লাথি দিয়ে ডালটা ফেলে দিল জিনা। কাঁধে ঝুলিয়ে নিল ব্যারেট। রানার দিকে চাইল। 'তলপেটে লেগেছে। মাথায় গুলি করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু...' কাঁধ ঝাঁকাল সে।

হতাশ হয়ে মাথা নাড়ছে তানাযুরা।

চট করে একবার অসুস্থ প্রফেসরকে দেখল রানা। স্ট্রেচারে চুপ করে পড়ে আছেন মানুষটা।

'দেরি না করে রওনা হব,' বলল রানা, 'হয়তো আবারও হামলা করবে।'

মাথা দোলাল তানাযুরা। 'পরের বার খুন হয়ে যেতে পারি সবাই।'

'ওয়েইলার, প্রফেসরকে বয়ে নিতে আমাকে সাহায্য করবে,'

বলল রানা। 'পেছনে পাহারা দেবে ওয়েস্ট।'

তানামুরার দিকে চাইল রানা। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। কেন যেন ওর মনে হলো, অন্য কেউ আহত হতে পারে, কিন্তু জাপানি যোদ্ধা নয়। অবশ্য, দেখে মনে হলো বসে পড়বে তানামুরা। কয়েক সেকেণ্ড পর সোজা হয়ে দাঁড়াল। চাইল দূরের পাহাড়ে। চোখে রাগ ও ঘৃণা।

প্রফেসরের পাশে থেমে তাঁকে দেখল রানা। ভাবছে, মাইলের পর মাইল পেরিয়ে আরও ক্লান্ত হয়ে উঠছে ওরা। ঘামে ও ধুলোয় মাখামাখি চুল। ছিঁড়ে গেছে নোংরা পোশাক। এখনও নাক উঁচু ভঙ্গি নিয়ে চারপাশ দেখছে ব্রিটিশ সৈনিক প্রেস্টন ওয়েস্ট। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, সে-ও হতক্লান্ত। নিজের কথা ভাবল রানা। বহু মাইল হেঁটে টনটন করছে পা। মন চাইছে সটান শুয়ে পড়তে। বার-বার এখানে ওখানে পড়ে গিয়ে এবং দানবের থাবার হামলায় ছিঁড়ে ফালাফালা হয়েছে ওর কোট। কপালে ও ঘাড়ে আঁচড়ের লাল দাগ। বাম গালে চারটে নখরের টানে তৈরি হয়েছে অগভীর ক্ষত, থেমেছে গিয়ে চিবুকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রানা, তারপর বলল, 'এবার রওনা হওয়া যাক।' পাশে এসে দাঁড়াল কালো নেকড়ে। 'আমাদের আগে আগে চলেছে। হয়তো সামনে আবার দেখা হবে। সতর্ক থাকবে সবাই।'

'হাই,' মৃদু নড করল তানামুরা।

'পাহারা দেবে ওয়েস্ট,' আবারও বলল রানা, 'এখন কাউকে হারালে মস্ত বিপদে পড়ব। পরে ফিরে আসব জয়েস আর রলিন্সের দেহ নিতে।'

'যদি বাঁচি,' মন্তব্য করল টড ওয়েইলার।

নিজেকে সামলে নিয়েছে জিনা, সরাসরি চাইল রানার চোখে। ওর চোখে প্রথমবারের মত ভয় দেখল রানা। নিচু স্বরে বলল

জিনা, 'আমরা বোধহয় এই পাহাড় বা জঙ্গলেই মারা যাব, তা-ই না?'

ওর চোখ থেকে নিজের চোখ সরাল না রানা।

জিনার চোখ বলছে: দয়া করে মিথ্যা বলবেন না।

প্রথমবারের মত জিনার কাঁধে হাতে রাখল রানা। মৃদু চাপড় দিয়ে বলল, 'না, মরব না আমরা, জিনা। বাজি ধরতে পারো।'

মৃদু হাসল জিনা। আস্তে করে মাথা দোলাল।

ঘুরে চাইল রানা, 'হান্টার!'

লোহার খুঁটির মত শক্ত হয়ে গেল কালো নেকড়ের চার পা। নির্দেশ দিলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে যে-কোনও শত্রুর উপর। রানার চোখে চোখ ওটার। ওখান থেকে ঝরছে ভালবাসা, নিশ্চিত নির্ভরতা ও নির্ভীকতা। আঙুল তুলে সামনের ট্রেইল দেখাল রানা। 'সার্চ, হান্টার!'

ইচ্ছা করলে কালো নেকড়েকে নানান ট্রেনিং দিতে পারত রানা, কিন্তু প্রয়োজনের বাইরে কিছু শেখায়নি। পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকা পরিশ্রান্ত মানুষগুলোকে পাশ কাটাল নেকড়ে, ছুটতে শুরু করে চলে গেল ট্রেইলের অনেক দূরে। ওখানে থেমে অপেক্ষা করল। একবারও রানার চোখের বাইরে গেল না।

'এখন থেকে দ্রুত হাঁটব,' বলল রানা। 'প্রতিবারে সামনের এক শ' গজ ট্রেইল দেখে থামবে হান্টার। চার ঘণ্টার ভেতর পৌঁছতে হবে গিরিপথে।' সবাইকে দেখে নিল। 'এই গতি বজায় রাখতে না পারলে আগে থেকে জানাবে।'

মাথা দোলাল সবাই।

এমন কী স্ট্রেচারে শুয়ে থাকা প্রফেসরও।

'চুপ করে শুয়ে থাকুন, স্যার,' বলল রানা, 'আশা করি আজই হাসপাতালে পৌঁছে দিতে পারব।'

'যেতে চায় কে ওখানে!' ম্লান চেহারায় হাসলেন সিরাজউদ্দীন,

'তবে শুয়ে থাকতে খারাপ লাগছে না।'

মারলিন রাইফেল রিলোড করে নিল রানা।

নিজের ব্যারেট পরীক্ষা করল জিনা। ভারী কাজটা করতে গিয়ে কষ্ট হচ্ছে, বুঝল রানা। কিন্তু কিছুই করার নেই। যার যার কাজ করে যেতে হবে। সামনের পথ আরও দুর্গম।

বার-বার সামনের পথ দেখে এসে রানার কাছে ফিরতে লাগল নেকড়ে।

অন্তরে রানা জানে, ওদের জন্য মস্ত ঝুঁকি নিচ্ছে হান্টার। সামনে থেকে বাতাস না পেলে দানবের গায়ের গন্ধ পাবে না। ওটা চুপ করে অপেক্ষা করলে এড়িয়ে যাবে নজর। সেক্ষেত্রে বুঝবার আগেই খুন হবে হান্টার।

ওর ধারণা, রক্ত-পিশাচটা ভাববে আগের মতই হুঁশিয়ার থাকবে ওরা, চলবে ধীরে সুস্থে। আপাতত হামলা করবে না। কম-বেশি আহত হয়েছে। জিনার বুলেট লেগেছে তলপেটে। হয়তো পাল্টে নেবে নিজের কৌশল। সরে যাবে অনেক দূরে। সেক্ষেত্রে নিরাপদে গ্রামে পৌঁছুতে পারবে ওরা। পরে আবারও খুঁজে বের করবে ওটাকে।

রানা স্থির করল, জানোয়ারটার সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াইয়ের পর বেঁচে থাকলে যোগাযোগ করবে বিসিআই হেডকোয়ার্টারে। ওর রিফ্লেক্স ও স্মৃতিশক্তি এখন প্রায় স্বাভাবিক।

নিক্ষিপ্ত তীরের মত টিলা থেকে রানার দিকে ফিরছে কালো নেকড়ে হান্টার। ওর জন্য অপেক্ষা করছে রানা, দ্বিধান্বিত। অন্যরা ঠিক ভাবে আসছে কি না তা দেখতে ঘুরে চাইল পিছনে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও পিছিয়ে পড়ছে জিনা, ধসে পড়ছে বেচারির শরীর।

আসলে সবাই জানে, মিথ্যা আশা বুকে পুষে লাভ নেই। প্রাণ

হাতে নিয়ে গিরিপথের দিকে ছুটছে, কিন্তু যখন-তখন হাজির হবে নিষ্ঠুর মৃত্যু। আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানা। চাইলেও সন্ধ্যার আগে পাহাড়ি এই রুক্ষ এলাকা পেরিয়ে গিরিপথে পৌঁছুতে পারবে না।

অত সময় ওদের হাতে নেই।

হাত তুলে সবাইকে থামতে ইশারা করল রানা। মাটিতে নামিয়ে রাখা হলো প্রফেসরের স্ট্রেচার। সাবমেশিনগান হাতে রানার দিকে এল তানামুরা। 'আমরা থামলাম কেন?'

'কারণ গিরিপথে যাওয়ার আগেই সন্ধ্যা নামবে,' একটু কর্কশ শোনাল রানার কণ্ঠ।

আপত্তি তুলবে বলে মুখ খুলেও চুপ থাকল জিনা, অতিরিক্ত হাঁপিয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে কুঁজো হয়ে।

রানা ভেবেছিল তর্ক করবে তানামুরা, কিন্তু তা করল না। বুঝে গেছে, আসলেই গিরিপথের দিকে গেলে মস্ত বিপদে পড়বে ওরা। হতাশ হয়ে এমপি-৫ হাতে মাথা নাড়ল সে। নদীর ওদিকে চোখ। একটু জিরিয়ে নিতে বসে পড়ল মাটিতে।

টড ওয়েইলারের চোখে চোখ রাখল রানা। লোকটা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে স্ট্রেচারের পিছনে, হাতে অস্ত্র নেই। নির্বিকার চেহারা। ঝগড়া করছে না ক্লান্তির কারণে। যা ভাবছে, নিজের কাছেই রাখছে। পেশাদার সৈনিক, ভাল করেই জানে, মরতেই হবে একদিন। সেজন্য তৈরি। মরতে হলে মরবে সাহসী পুরুষের মত।

তানামুরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রানা। 'ম্যাপটা দাও।'

মুড়িয়ে রাখা কাগজ রানার হাতে দিল জাপানি যোদ্ধা। হাঁটু গেড়ে সামনে ম্যাপ বিছিয়ে দিল রানা। পাশেই রাইফেল। তখনই হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল হান্টার। ওটার দিকে না চেয়েই বলল রানা, 'পাহারা দে।'

দূরে সরে গেল কালো নেকড়ে, নাক তুলে শুঁকতে শুরু করেছে বাতাস।

টপোগ্রাফিকাল ম্যাপ দেখছে রানা। এখন চাই এমন কোনও অবস্থান, যেখানে নিরাপদে রাত কাটাতে পারবে ওরা। গভীর একটা নালা দেখল। কিন্তু ওখানে ঢুকলে মারা পড়বে। মাথা-চাঁছা এক টিলা আছে, কিন্তু ওখানেও রাতে হামলা করতে পারবে দানব। ক্লান্ত অবস্থায় কিছুই করতে পারবে না ওরা। একে একে শেষ করে দেবে ওদেরকে। তখনই ম্যাপে রানা দেখল পরিত্যক্ত খনিটা।

ভুরু কুঁচকে গেল ওর।

খনি...

ওটার মুখ আটকে দিয়ে ভিতরে রয়ে গেলে কেমন হয়?

তিন দিকে পাথরের পুরু দেয়াল।

চট করে সময়ের হিসাব কষতে লাগল রানা। আর মাত্র সিকি মাইল গেলেই পৌঁছবে ওরা ওই খনিতে। মনে গেঁথে নিল কোন পথে সহজে যেতে পারবে। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলো, রাতে আশ্রয় নেয়ার মত জায়গা কাছেই আছে।'

টুঁ শব্দ করল না কেউ। ক্লান্ত শরীর টেনে রওনা হয়ে গেল রানার পিছনে। মনে আশা, নিরাপদ কোথাও ওদেরকে নিয়ে যাবে বাঙালি কমাণ্ডো।

আটাশ

মনে অস্বস্তি ও দ্বিধা নিয়ে সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটে পা রেখেছে টম জেরাল্ড। সম্মানীয় অ্যাকাডেমিকদের সংগঠন এটা। আঁতেলদের কথাবার্তা কেমন, কে জানে!

লবিতে লম্বা লিস্টে ঝুলছে সায়েন্টিফিক হেভিওয়েটদের নাম ও লম্বা পদবী। আগেই টম শুনেছে, এই প্রাইভেট ফ্যাসিলিটিতে পা রাখতে পারাও মস্ত সম্মানের বিষয়। বিখ্যাত সব ডক্টরের ছবির শুরুতে আছেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি। তবে উল্লেখ করা হয়নি তাঁর ডিগ্রিগুলো।'

টম দেখল, করিডোর ধরে ওর দিকে আসছে অধৈর্য কিন্তু মিষ্টি মুখের এক তরুণী মেয়ে।

মুড ভাল নেই জেরাল্ডের, কিন্তু হাসল মুলোর দোকান খুলে।

'আমি টিপা মুই,' হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা ওর দিকে। মনে হলো না ডেপুটি ইউ.এস. মার্শালের পদবী ওকে মুগ্ধ করেছে। 'কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? আপাতত অত্যন্ত ব্যস্ত আমি।'

'তা বুঝতে পারছি,' করমর্দন শেষে নিজের ক্রেডেনশিয়াল দেখাল জেরাল্ড। 'আসলে ডক্টর আহমেদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'তিনি আপাতত এই ফ্যাসিলিটিতে নেই।'

'কোথায় আছেন?'

'এক এক্সপিডিশনে। ফিরতে হয়তো কয়েক সপ্তাহ লাগবে। ওখানে কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটি নেই।' মাথা কাত করল টিপা মুই। 'আপনি জানতেন না এক্সপিডিশনে গেছেন?'

এক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে দ্বিধাহীন ভাবে বলল টম, 'শুনেছি স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাজে গেছেন। আসলে সেই কারণেই ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।'

'তাই?' আগের চেয়ে নরম হলো মেয়েটার কণ্ঠ, 'আমি হয়তো সাহায্য করতে পারব। আসলে কী জন্যে এসেছেন?'

সরাসরি কাজে এল টম, 'আপনি কি জানেন, উনি কী ধরনের অভিযানে যোগ দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আলাস্কার ওই অভিযানের কথা জানেন?'

বার কয়েক চোখের পাপড়ি নড়ল টিপার। সামান্য বিরতি শেষে বলল, 'আপনি আসলে কী জানতে চান, মার্শাল জেরাল্ড?'

ওকে 'মার্শাল' বলেছে মেয়েটা, ভাল লাগল টমের। আসলে ওয়াশিংটনের এত কাছে মার্শাল পদবীর মূল্য নেই। রাজধানীতে সাধারণ মানুষ নাক সিটকায় ফেডারেল এজেন্ট শুনলে। অথচ, ওকলাহোমা বা মন্ট্যানায় ইউ.এস. মার্শাল ক্রেডেনশিয়াল দেখলে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সবাই। নিশ্চিত ভাবেই পাওয়া যায় বিনা পয়সায় খাবার।

'আমি আসলে জানতে চাই, ওই এক্সপিডিশনে কী ভূমিকা ডক্টর আহমেদের,' বলল জেরাল্ড। 'এ বিষয়ে কিছু বলার মত সময় আছে আপনার হাতে?'

টিপা মুই খেয়াল করল, সরল হাসছে টম জেরাল্ড।

'ঠিক আছে, সময় দিতে পারব,' বলল নেপালি মেয়েটা। 'আমার সঙ্গে আসুন। দেখাচ্ছি কী বিষয়ে স্টাডি করছিলাম আমরা।'

ঝকঝকে করিডোর ধরে টমকে নিয়ে চলল টিপা মুই। হঠাৎ ডানদিকের বড় এক দরজার সামনে থামল। নব ঘুরিয়ে হাতের ইশারা করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। পিছু নিল জেরাল্ড। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ঘরটা মস্ত বড়, আধুনিক কোনও ল্যাবোরেটরি।

টিপা মুই-এর পিছু নিয়ে একটা টেবিলের সামনে থামল টম।

'প্লাস্টারের ছাঁচটা দেখুন,' আঙুল তুলে দেখাল মেয়েটা।

কোনও কিছুর পায়ের ছাপের ছাঁচ টেবিলে।

ওদিকে মনোযোগ দিল টম। বুঝতে দেরি হলো না, ভালুকের পায়ের নয়। জীবনেও এই ধরনের ছাপ দেখেনি।

'ডক্টর আহমেদও জানেন না এ জিনিস কোন্ জন্তুর?' জানতে চাইল টম। ঝুঁকে গেল ছাপের উপর। 'ওঁরই না এ বিষয়ে জানবার কথা?'

'দুনিয়ার সেরা উনি, মার্শাল,' বলল টিপা। দীর্ঘ প্রিন্টআউট মেলল টেবিলে। 'ছাঁচ থেকে পাওয়া একটি ফাইবার নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই ডিএনএ-র প্রিন্টআউট। খালি চোখে ধরাই পড়ত না ওই ফাইবার। কিন্তু মাইক্রোস্কোপে পাওয়ার পর পরশু দিন টেস্ট করি আমরা। আপনি কি জানেন ডিএনএ কোডিং কী?'

'না,' মাথা নাড়ল টম। দেখছে সারি সারি সংখ্যা ও অক্ষর। এসব আসলে কী, কার বাপের সাধ্যি জানবে। 'আপনি নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন আমাকে?'

'ডক্টর সয়্যারের মত করে নয়।'

...আর উনি কে?'

'ওঁর নাম ডক্টর নিনা সয়্যার। ডক্টর আহমেদ ইন্সটিটিউট ছেড়ে এক্সপিডিশনে গেলে দায়িত্ব দিয়ে যান তাঁর কাছে।' প্রিন্টআউট গুছিয়ে রাখল টিপা। 'আপনি অপেক্ষা করলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। বেশি দেরি হবে না ফিরতে। দু'চার

দিন। আপাতত আছেন ল্যাংলিতে। আগেই যদি যোগাযোগ করতে চান, চলে যেতে পারেন ওখানে।'

'ল্যাংলিতে কী করছেন তিনি?' শান্ত, নিচু কণ্ঠে জানতে চাইল টম। সতর্ক হয়ে উঠেছে।

'এই প্রিন্টআউটের কপি পৌঁছে দেবেন,' বলল টিপা। 'ই-মেইলে পাঠিয়ে দেয়া যেত, কিন্তু আমাদের এখানে সিকিয়োর লাইন নেই। নার্ভাস হয়ে উঠেছিলেন ডক্টর সয়্যার।'

'আচ্ছা,' মাথা দোলাল টম। 'ওর সেল ফোন নম্বর দিতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই,' ব্যাগ খুলে মোবাইল ফোন বের করল টিপা, আর তখনই বেজে উঠল ওটা। ক্ষমা চাওয়ার চোখে টমকে দেখে রিসিভ করল কল। 'জী, বলুন, টিপা বলছি। কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

মেয়েটার মুখ তিলে তিলে ফ্যাকাসে হতে দেখল টম। মনে হলো হতবাক হয়ে গেছে বেচারি। বিশ সেকেণ্ড পর ফিসফিস করে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ। না। ওটা যত্ন করে রেখে দেয়া হবে।'

নীরবে টেবিলে মোবাইল ফোন নামিয়ে রাখল টিপা মুই।

টম জেরাল্ড আঁচ করতে পারল, কী হয়েছে।

'টিপা?' নরম সুরে ডাকল। 'আপনি ঠিক আছেন তো?'

টমের দিকে চাইল না মেয়েটা। ভৌতা স্বরে বলল, 'ডক্টর সয়্যার... তিনি মারা গেছেন!'

ঊনত্রিশ

সমান্তরাল উৎরাই পথে চলেছে সে, একহাতে ধরেছে রক্তাক্ত পাঁজর। ওই যে, ঢালু ট্রেইল বেয়ে উঠছে লোকগুলো। নদীর এদিকে ঘন হয়ে জন্মেছে শেওলা, তা ছাড়া আছে খসে পড়া পাতার কার্পেট, ছাপ পড়ছে না পায়ের। নিজেকে আড়াল করে হেঁটে চলেছে সে নীরবে, কোনও আওয়াজ করছে না।

খিদে লেগেছে প্রচণ্ড। খেতে হবে, নইলে শরীরে শক্তি পাবে না। আর শক্তি না পেলে খুন করতে পারবে না লোকগুলোকে। সামনে কোথাও থাকবে এল্‌ক্‌, হরিণ বা নেকড়ে। ওটা যা-ই হোক, খুন হবে। দেরি না করে গপাগপ মাংস খেয়ে নেবে, তা হলেই ফিরবে জোর। জন্তুটার মাংস তৈরি করবে ওর দেহে অক্ষত মাংস, বিশ্রাম নিয়ে তারপর একে একে খুন করবে বদমাসগুলোকে। একে একে...

মৃদু ঘড়-ঘড় আওয়াজ বেরোল কণ্ঠ থেকে। প্রায় হাসি-হাসি হয়ে গেল মুখ। মাথার উপর ছায়া দিচ্ছে দুটো বড় সিডার গাছ। নিঃশব্দে লাফিয়ে বড় এক পাথর পেরিয়ে গেল সে, ওদিকে নেমে কুঁচকে ফেলল মুখ। ঝাঁকি লাগতেই পাঁজরে লেগেছে তীক্ষ্ণ ব্যথা। দাঁত খিঁচিয়ে চেপে গেল গর্জন। হ্যাঁ, আগে খেতে হবে, নইলে গায়ে জোর পাবে না। ভেঙে পড়ছে শরীর ক্লান্তিতে।

জঙ্গলের গভীর থেকে ওই মেয়েলোকটাকে দেখল রাগ-ঘৃণা নিয়ে। সবচেয়ে আগে খুন করবে ওই নেকড়েওয়ালাটাকে।

তারপর ওই শালীকে। ওই শালী গুলি করেছিল। খুব ব্যথা দিতে পারে শালী। মাফ নেই তার।

কালচে জিভ দিয়ে চেটে নিল কালো ঠোঁট। গলা থেকে বেরোল ঘড়-ঘড় আওয়াজ। বড় করে দম নেয়ায় বিস্ফারিত হলো নাকের দুই ফুটো। সাধারণ মানুষ যে পরিমাণ বাতাস বুকে টেনে নেয়, তার চেয়ে ঢের বেশি অক্সিজেন ঢুকল ফুসফুসে। সে বুঝে গেছে, কী করবে মানুষগুলো। রক্ত-লাল চোখে চেয়ে রইল ওই কালো নেকড়ের দিকে। ওই নেকড়ে... ওটাকে খুন করতে হবে।

এদের সবাইকে ঘৃণা করে সে।

রাগে মাটিতে দু'পা দাবিয়ে তৈরি করল গভীর গর্ত। কাজটা করতে ভাল লাগছে। চুপচাপ দেখছে পালাচ্ছে তারা। একবার চাইল নিজের পোশাকের দিকে। আছে শুধু ছেঁড়া প্যান্ট, প্রায় হাফ প্যান্ট হয়ে গেছে।

তাতে কী?

শীতে কাতর হবে সাধারণ মানুষ, সে নয়। ব্যথার অনুভূতি নেই বললেই চলে। পায়ের নীচে রুক্ষ পাথর পড়লেও সমস্যা কোথায়। কাউকে খুন করলে বা ক্ষত-বিক্ষত করলেও আসে না অনুশোচনা। বরং ভাল লাগে হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিলে। যে-কোনও মানুষকে বুকে চিপে তার মুখ থেকে রক্ত বের করতে কী যে মজা! রক্ত চাটলে মনে হয় মুখে গলে পড়ছে রসাল, লোভনীয় আঙুর। না, আসলে অনুভূতি নেই তার। না শরীরের, না অন্তরের কষ্ট। দেবতা বুঝি এমনই হয়।

কিছু দিন আগেও মন ছিল, কিন্তু তারপর পাল্টে গেল সব। বদলে গেল দেহ। আবছা ভাবে মনে পড়ল অপ্রয়োজনীয় কিছু তথ্য: অর্জন করতে হবে আরও ক্ষমতা ও শক্তি। এখনও যে-কোনও মানুষের চেয়ে ঢের শক্তিশালী সে। ইচ্ছা করলে খুনের আগে সবাইকে বলতে পারত, কী কারণে দেবতা হতে চাইল সে।

কিন্তু দুর্বল প্রাণীর কাছে অন্তরের কথা কেন বলবে? বলবে না! শসার মত শরীর ওগুলোর, টিপে ধরলেই ফস্ করে রক্ত বেরোয়, গলে যায় মাংস। মরেও এক সেকেণ্ডে। কলঙ্কজনক! ওর তুলনায় অতি সামান্য কেঁচো ছাড়া ওগুলো আর কী?

তাদের মত উচ্চারণ করে কথা বলতে চাইল সে। কিন্তু পাল্টে গেছে ভোকাল কর্ড। দাঁতের মাঝ দিয়ে বেরোল ফিসফিস সামান্য আওয়াজ। মাঝে মাঝে মানুষ খুন করার আগে তাদেরকে জানিয়ে দিতে ইচ্ছা করে: তোরা জানিস, তোদের চোদ্দ গুষ্টি মরে সাফ হলেও আমি বাঁচব হাজার হাজার বছর! আমি দেবতা! তোদের মত আমার আকস্মিক মরণ নেই!

এই কথা ভাবতে গিয়ে ভাল লাগল তার। রসাল মাংস বা তাজা রক্ত খাওয়ার মতই আনন্দ মনে।

বিশেষ করে নেকড়ের মালিক ওই লোকটার সঙ্গে কথা বলবে সে। বোকাটাকে খুন করার আগে জানাবে, কোনও জন্তু নয়, আসলে সে দেবতা! যেমন-তেমন দেবতা নয়– সাক্ষাৎ যম। শেষ নেই ক্ষমতার। যাকে খুশি শেষ করবে, আবার ক্ষমাও করতে পারে ইচ্ছে হলে।

বেশি দিন নেই, একদল ভাই-দেবতা তৈরি করবে। ওদের চেয়ে বেশি থাকবে তার বুদ্ধি। সে হবে দেবতাদের রাজা। কারণ সে একই সঙ্গে দেবতা আবার মানুষ।

প্রাচীন আমলের নামকরা সব দেবতার মত নতুন উদ্যমে শায়েস্তা করবে মানুষকে। ইঁদুরের গর্তে গিয়ে মুখ গুঁজতে চাইলেও বাঁচতে দেবে না নগণ্য প্রাণী মানুষগুলোকে। কাঁচা মগজ খেয়ে ফূর্তি করবে তারা।

হাসতেই সরু হয়ে গেল তার লালচে চোখ।

হ্যাঁ, মানুষের জাতিকে খেয়ে সাফ করবে তারা!

রক্ষা নেই কোনও মানুষের!

ত্রিশ

শেষ বিকাল, একটু পর ঝুপ্ করে নামবে রাতের নিকষ কালো আঁধার। নিনা সয়্যারের গাড়ির দুঃখজনক দুর্ঘটনার পর পুলিশ রিপোর্ট পড়ছে মার্শাল টম জেরাল্ড।

হোটেল থেকে বেরিয়ে ল্যাংলি যাওয়ার পথে হঠাৎ বাঁক নিয়ে পাহাড়ি রাস্তা থেকে অনেক নীচে গিয়ে পড়েছিল ওই গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছেন ডক্টর নিনা সয়্যার। সন্দেহজনক কিছুই পায়নি পুলিশ। স্যাবোটাজ করা হয়নি, ঠেলে ফেলে দেয়া হয়নি, অন্য কোনও গাড়ির ধাক্কা দেয়ারও চিহ্ন নেই। পোস্টমর্টেমে জানা গেছে, মহিলার রক্তে অ্যালকোহোল ছিল না। খাড়া খাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভেঙে গিয়েছিল গাড়ির সামনের বাম চাকার স্ট্রাট। গাড়ি বাঁক নেয়ার সময় চাপ সহ্য করে ওই জিনিস। চুরমার হয়ে গিয়েছিল দণ্ড। ফলে হঠাৎ বাঁক নিয়ে রেলিং ভেঙে নীচে গিয়ে পড়েছেন বিজ্ঞানী।

জেরাল্ড একবার ভাবল, পরীক্ষা করবে ওই গাড়িটা, কিন্তু পরক্ষণে পাল্টে নিল মত। অনুচিত হবে নিজের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা। কাঁচা গোয়েন্দার মত নানান প্রশ্ন তুললে সতর্ক হয়ে উঠবে সিআইএ। ফলাফল হবে খারাপ। শুরু হবে একের পর এক বিপদ।

আগামীকাল রাতে *পাথর ভাঙার* সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে আরেকটা কাজ করবে, ঠিক করল জেরাল্ড। ল্যাংলিতে গিয়ে খুঁজে

বের করবে কে আছে ওসব ফ্যাসিলিটির দায়িত্বে। ওই খোঁজ নিতে গেলে বিপদ হওয়ার কথা নয়। গাধা না সিআইএ-র লোক, ভাল করেই জানে, শুরু হয়েছে অফিশিয়াল তদন্ত। ওখানে গিয়ে হাজির না হওয়াই সন্দেহজনক। হালকা ভাবে খোঁজখবর নিচ্ছে ও, তা ভাল করেই বুঝিয়ে দেবে।

সিআইএ-র অফিসে ফোন করলে ল্যাংলির সিকিয়োর সেকশনে ঢুকতে সমস্যা হবে না।

প্রকাণ্ড দালানে ঢুকে এখানে-ওখানে বার কয়েক ঠোকর খেয়ে নির্দিষ্ট রিসেপশনিস্টের কাছে পৌঁছে গেল টম জেরাল্ড। এই জায়গার নাম এজেন্টরা দিয়েছে: হোয়াইট টার্মিনাল। নানান তথ্য সংগ্রহের পর রিসার্চ করা হয় এই ডিপার্টমেন্টে। আগেই রিসেপশনিস্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সাদা চুলের এক লোক, হাতে ক্লিপবোর্ড। কথা বলছে আরেকজনের সঙ্গে। ডেস্কে এসে জেরাল্ড দাঁড়াতেই ওর দিকে ঘুরল সাদা চুল।

'মার্শাল জেরাল্ড?' খুশি-খুশি সুরে জানতে চাইল প্রৌঢ়।

দু'চার কথায় পরিচিত হওয়ার পর জেরাল্ডকে নিজের অফিসে নিয়ে গেল ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। টেবিলে মুখোমুখি হয়ে বসবার পর জেরাল্ড বুঝে গেল, এই লোক সামান্য কেউ নয়, হেভিওয়েট।

সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটে যেমন নিচু স্বরে কথা বলে আঁতেলরা, বিনয় দেখায়, তেমন কিছু ডক্টর ডেভিড গ্রেবারের ভিতর নেই। দামি আসবাবপত্রে সাজানো অফিস। একদিকের দেয়ালে ঝুলছে অসংখ্য ডিগ্রির সার্টিফিকেট আর সোনালি রঙের সব পদক। একটাও চিনল না টম। আরেক দিকের দেয়ালে নানান জিয়োলজিকাল চার্টের রেকর্ড। ডেস্কে বিছিয়ে রেখেছে ওই একই জিনিস।

'হ্যাঁ, মার্শাল, তো বলুন কী বলবেন?' আয়েসী ভঙ্গিতে আরামদায়ক চেয়ারে হেলান দিল ডেভিড গ্রেবার, 'বোধহয় আলাস্কায় আমাদের ওই প্লেগ ধরা ফ্যাসিলিটির বিষয়ে তদন্ত করছেন?'

এই লোক উল্টো কোণঠাসা করবে না, জানে জেরাল্ড। খেলতে চাইছে, আর খেলতে আপত্তি নেই ওর। এই লোক ভাল করেই জানে কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে ও।

'এসব রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে দুঃখজনক যেসব ঘটনা ঘটেছে, তার কারণ জানতে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে, ডক্টর,' বলল গম্ভীর জেরাল্ড। কণ্ঠ সম্পূর্ণ পেশাদার। নিজ কাজের বিষয়ে অত্যন্ত সিরিয়াস, কিন্তু তদন্তের বিষয়টি যেন দেখছে বহু দূর থেকে। ব্যক্তিগত ভাবে নিজেকে জড়িয়ে নেবে না। 'এ কারণেই আপনাকে জরুরি কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আপনার সময় হবে?'

'অবশ্যই,' মাথা দোলাল ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। তাকেও সিরিয়াস মনে হলো। 'নিশ্চয়ই জানেন, মার্শাল, ওখানে যা ঘটেছে, তার সুষ্ঠু তদন্ত হোক, তা আমরাও চাই। জানতে চাই কে, কারা বা কী হামলা করেছে ওখানে আমাদের লোকের ওপর। এসব ফ্যাসিলিটি গড়তে গিয়ে কোটি কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে আমাদের। ট্রেনিং দিতে হয়েছে বিজ্ঞানী ও সহকারীদেরকে। তাতেও লেগেছে লাখ লাখ ডলার। চাইলেই তাদের বদলে আরেকদল লোক পাব না। বাধ্য হয়ে আপাতত বন্ধ রাখতে হয়েছে এসব রিসার্চ ফ্যাসিলিটি। সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে, খুন হয়ে গেছে বহু মানুষ।' আস্তে করে মাথা নাড়ল গ্রেবার। 'ভাবাই যায় না কারও এমন পরিণতি হবে।'

কেশে গলা পরিষ্কার করল জেরাল্ড। 'ডক্টর, বলুন তো আসলে কী গবেষণা হচ্ছিল এসব ফ্যাসিলিটিতে? প্রতি বছর আর্কটিকের রিসার্চ স্টেশন বন্ধ করছে আর্মি, কারণ যথেষ্ট বাজেট

নেই। এই যখন অবস্থা, কী কারণে এত খরচ করছে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি?'

'বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্যে,' সহজ ভঙ্গিতে বলল ডক্টর গ্রেবার। 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মার্শাল... আমি কনফার্ম হয়ে নিয়েছি, এসব ইনফর্মেশন আপনাকে দেয়া যাবে... এসব ফ্যাসিলিটি আসলে মনিটর করছিল আর্কটিক সার্কেলের সাইসমিক অ্যাকটিভিটি। বেয়ারিং স্ট্রেইট আর সাইবেরিয়ায় নতুন করে নিউক্লিয়ার বোমার পরীক্ষা চলছে কি না, তা জানা আমাদের জন্যে অত্যন্ত জরুরি।' সামান্য দ্বিধা করল ডক্টর। 'শীতল যুদ্ধ শেষ, কিন্তু শান্তি বজায় রাখতে এ খরচটা আমাদের করতেই হবে। খারাপ উদ্দেশ্য নেই, কিন্তু অন্যদের উদ্দেশ্য না জেনেও উপায় নেই।'

'বুঝতে পেরেছি,' চট্ করে সামনের চার্ট দেখল টম। 'তা হলে নিশ্চয়ই এসব রিসার্চ ফ্যাসিলিটির মিশনের জন্যে ছাপা প্রিন্টআউট আছে আপনাদের?' ওর জানা আছে, প্রতিটি সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ফ্যাসিলিটির জন্য আলাদা উদ্দেশ্যের রিপোর্ট রাখা হয়। ওই একই কাজ করে মার্শাল সার্ভিস।

কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোনও রাষ্ট্রীয় সংগঠন সিআইএ-র মত এত গোপন তৎপরতায় জড়িত নয়– এদেরকে করতে হয় প্রচুর পেপারওঅর্ক। যদিও চেষ্টা করে সবই গোপন রাখতে।

আগেই টেবিল থেকে একটা ম্যানুয়াল হাতে তুলে নিয়েছে ডক্টর গ্রেবার, অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে ওটা দিল টম জেরান্ডের হাতে। কাজটা শেষ করে হেলান দিল দামি চেয়ারের পিঠে। 'চাইলে এখনই পড়তে পারেন। যদিও কপি করতে পারবেন না, বা নোট নিতে পারবেন না। এমন কী আমিও অপারেশন ম্যানুয়াল সরাতে পারব না এই ফ্যাসিলিটি থেকে। অবশ্য, যতক্ষণ খুশি পড়তে পারবেন আমাদের রিডিং রুমে বসে।'

কাভার খুলে ম্যানুয়ালে চোখ বোলাতে লাগল টম জেরাল্ড। খেয়াল করল, সদস্যদের অনেকেরই আছে ডক্টর পদবী। ইকুইপমেন্ট যা ব্যবহার হয়েছে, বেশিরভাগই টেকটোনিক প্লেটের বিষয়ে সনিক মেযারমেন্টের। প্রতিটি রিসার্চ ফ্যাসিলিটি এসওপি বা স্পেশাল অপারেশনাল প্রসিজারে চালিত।

'এসব ফ্যাসিলিটি একই নিয়ম মেনে চলে কেন?' অবাক হয়েছে, এমন ভঙ্গি নিল জেরাল্ড, 'আমার মনে হচ্ছে ওই ছয়টা ফ্যাসিলিটির দরকার ছিল না। একটাই যথেষ্ট ছিল এসব কাজ সারতে।'

'না-না, তা নয়,' মাথা নাড়ল ডক্টর গ্রেবার। 'প্রথমে তাই মনে হয়, কিন্তু আসলে তা নয়।' চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে আরেকটা ডেস্ক থেকে চার্ট নিয়ে এল। 'খেয়াল করুন, প্রতিটি স্টেশন আছে আলাদা সব টেকটোনিক প্লেটের কিনারায়। এসব প্লেট একেকটা শত মাইল চওড়া, ভাসছে অ্যাসথেনোস্ফেয়ারে বা স্বল্প গলিত পদার্থের ওপর। ওই পদার্থ মাঝে মাঝে সরিয়ে নিচ্ছে ওপরের প্লেট।'

বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে বলছে ডক্টর। কত সহজেই না বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ঝেড়ে ওকে আরেক দিকে সরিয়ে নিচ্ছে, বিস্মিত না হয়ে পারল না জেরাল্ড। হয়ে উঠল আরও হুঁশিয়ার। বুঝে গেল, সামনের এই লোক অত্যন্ত বিপজ্জনক।

জিয়োফিযিক্স বিষয়ে লেকচার দিল গ্রেবার, আর চুপ করে শুনল জেরাল্ড। লোকটা থেমে যাওয়ার পর জানতে চাইল, 'আচ্ছা, বুঝলাম, আমাদের শত্রু-দেশও নজর রাখছে আমাদের ওপর, মনিটর করছে সব। কিন্তু ওখানে যে দুই সপ্তাহ ধরে খুনের পর খুন হলো, এর কী ব্যাখ্যা দেবেন আপনি? নিশ্চয়ই একমত হবেন, এসব তথ্য পাওয়ার জন্যে এত মানুষের প্রাণ যাক, তা কারও কাম্য হতে পারে না। কিন্তু ওখানে তা-ই হয়েছে।'

'শত্রু-দেশ সত্যিই নজর রাখছে আমাদের ওপর,' মাথা দোলাল ডক্টর গ্রেবার। চেহারা ও বয়সের কারণে মানিয়ে গেছে এই উঁচু পদে। বয়স কমপক্ষে ষাট, যদিও একটুও কুঁচকে যায়নি কপাল বা গালের চামড়া। পুরো ফিট, এই বয়সের অন্য কাউকে এত স্বাস্থ্য সচেতন দেখেনি জেরাল্ড। লোকটার দেহ থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে শক্তি ও খেলুড়ে মনোভাব।

চুপ করে জেরাল্ড শুনল, শত্রুরা পৈশাচিক হামলা করে বিনষ্ট করেছে এসব ফ্যাসিলিটির স্যাটালাইট সার্ভেইল্যান্স।

'পৈশাচিক হামলা, সন্দেহ নেই,' সায় দিল জেরাল্ড। 'কিন্তু কেন মানুষ খুন করা হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা আপনার কথার ভেতর পেলাম না, ডক্টর। এরই ভেতর মারা পড়েছে এক শ'রও বেশি লোক। আপনি নিশ্চয়ই আন্দাজ করেন, কী কারণে এভাবে মানব-হত্যা করা হচ্ছে?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল ডক্টর গ্রেবার। 'না, মার্শাল, এর কোনও ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। শুধু জানি, সাধ্য মত করছি। পাঠিয়ে দিয়েছি স্পেশাল হান্টিং টিমকে। তাদের কারও কারও বিষয়ে শুনে থাকতে পারেন, তাঁরা বিখ্যাত।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করল সে, ডান হাত চিবুকে। 'আমি বিজ্ঞানী, মার্শাল, আপনার মত গোয়েন্দা নই। আসলে ভুল মানুষের কাছে এসেছেন। আমি চিনি এই প্রকৃতিকে, বুঝতেও পারি, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তেমন জ্ঞান নেই। আমার কাছে জানতে চাইলে প্রকৃতির বিষয়ে অনেক তথ্য দিতে পারব, কিন্তু ওখানে কী ঘটেছে জানতে চাইলে, কিছুই বলতে পারব না। আসলে যা মোটেই জানি না, তা নিয়ে কথা বলতে চাইলে নষ্ট হবে আপনার সময়।'

'কিছুই আঁচ করতে পারছেন না, ডক্টর?'

'না, মার্শাল। আপনার মত আমিও রহস্য নিয়ে কাজ করি। কিন্তু তা প্রকৃতির। বাকি জীবনেও তার ব্যাখ্যা পাব না।' হতাশ

ভাবে মাথা নাড়ল গ্রেবার। 'আসলে জিয়োফিযিক্স এমনই, যতই ডিগ্রি থাকুক, ওই সৈকতে দাঁড়িয়ে বড়জোর সারাজীবনে হাতে তুলে নিতে পারব মাত্র এক কণা বালি। বহু আগেই মহাবিশ্বের রহস্য নিয়ে ভাবতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। এমন কী কাউকে কিছু ব্যাখ্যাও দিই না। এই ময়দানে এতই কম জানি, নিজেকে মনে হয় শিশু। আর আপনি যে রহস্যের পেছনে ছুটছেন, তা তো আরও কম জানি।'

কাব্যিক ভঙ্গি নিয়েছে ডক্টর, আর অজান্তেই বোধহয় সুযোগ করে দিয়েছে ওর জন্য, ভাবল টম। সাবধানে কথা পাড়ল ও, 'ডক্টর, আপনি তো অত্যন্ত শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান মানুষ। কোনও দিকে মন দিলে অন্যের চেয়ে বেশি বুঝতে পারেন।'

'তা বোধহয় মোটেও ঠিক নয়, মার্শাল,' ঘুরে দাঁড়িয়ে জেরাল্ডকে দেখল ডক্টর।

লোকটা সত্যিই ফিট, ভাবল টম। এক দৌড়ে ঘুরে আসতে পারবে এক মাইল।

'জানাতে পারি বহু কিছুরই ব্যাখ্যা, অনেকের চেয়ে ভাল ভাবে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে পারব কোয়ান্টাম থিয়োরি, বা কী কারণে একে অপরে আটকে থাকছে পদার্থ। আঁচ করতে পারব অরিজিন থিয়োরি...' মৃদু হাসল ডক্টর গ্রেবার। 'কিন্তু, মার্শাল, আপনি এসব জানতে চান না, তা-ই নয় কি?'

ভুল পথে পা দিয়েছি, ভাবল জেরাল্ড। সহজ সুরে বলল, 'না, আসলেই এসব জানতে চাইছি না। এখানে এসেছিলাম জানতে, কেন মানুষ খুন হচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনার কী ধারণা।'

'কিন্তু সত্যিই ওই ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারব না, সরি।' নীরবে যেন বলে দেয়া হয়েছে, এবার বিদায় হন।

চেয়ারে পিঠ-সোজা করে বসে থাকল টম জেরাল্ড। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আসলে, ডক্টর, আমি এখানে এসেছি, কারণ

আপনি হয়তো আমাকে নির্দিষ্ট কোনও ধারণা দিতে পারবেন– ওখানে মানব-হত্যা করছে কে, কারা বা কী।'

নিজের চেয়ারে বসে সামনে ঝুঁকে এল ডক্টর গ্রেবার। 'আমি শুধু বলতে পারি, যা বলা হয়েছে আমাকে। ওই খুনি... সে যে-ই হোক, একেবারে তছনছ করে দিয়েছে আমাদের তিনটে রিসার্চ ফ্যাসিলিটি, খুন করেছে প্রত্যেককে। দক্ষিণে রয়ে গেছে মাত্র একটা ফ্যাসিলিটি। ওটা যদি এখন ধ্বংস করে দেয়া হয়, মুখ থুবড়ে পড়বে গোটা অপারেশন। বন্ধ করে দিতে হবে পুরো প্রোগ্রাম। যে এসব ধ্বংস করছে, সে... বা তারা অত্যন্ত শক্তিশালী। বিদ্যুদ্গতি, অত্যন্ত বুদ্ধিমান। কখনও মনে হয়েছে, ওটা মানুষ নয়, অন্য কোনও প্রজাতির প্রাণী। এমন প্রাণী, যার নামও শুনিনি আমরা। এমনটি মনে হয়েছে বলেই, সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রেখে আলাস্কায় পাঠিয়ে দিয়েছি দক্ষ শিকারি দল।'

'কী ধরনের প্রাণী বলে মনে করছেন ওটাকে?' জানতে চাইল টম।

'কী বলা উচিত... জানি না,' ভুরু কুঁচকে ফেলল ডক্টর গ্রেবার। তাকে মনে হলো দ্বিধান্বিত। 'মার্শাল, আপনি দেখেননি কত ভয়ঙ্কর ভাবে খুন করেছে? অত্যন্ত চতুর খুনি। হয়তো মানুষই নয়। গণ্ডারের চেয়েও বেশি তার শক্তি। রিইনফোর্সড্ দেয়াল থেকে উপড়ে ফেলতে পারে স্টিলের দরজা!'

'এটা জানি বিজ্ঞানীদেরকে খুন করার আগে খুন করেছে একদল সৈনিককে, তারপর ঢুকেছে ল্যাবোরেটরিতে,' বলল জেরাল্ড। 'কিন্তু ফাঁকি দিতে পারেনি ভিডিয়ো সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরাকে। রেকর্ড করা ছায়াছবি দেখেছি ওয়াশিংটনে। ওই একই জিনিস দেখেছেন সিনেট ইন্টেলিজেন্স সাব-কমিটির সদস্যরা। তাঁরা জানতে চান কোথা থেকে এল ওই জন্তু।'

মাথা দোলাল ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। 'হ্যাঁ, জানতে চাওয়া স্বাভাবিক। প্রথমে নিজেরা চেষ্টা করেছি অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে। তখন কনফারেন্স করেছি বেশ কয়েকবার। তারপর ঠিক হলো, হাইলি স্কিল্ড আর্মড্ টিম পাঠানো হবে ওখানে। তারা নিয়ন্ত্রণে আনবে পরিস্থিতি। আমাদের প্রচেষ্টা মোটেও যথেষ্ট ছিল না। মিথ্যা বলব না, হান্টিং টিম গঠন করে ওই খুনিকে শেষ করতে চাইলে, তাতে সামান্যতম আপত্তি তুলিনি। শুধু একটা শর্ত দিই: ওই টিমের নিয়ন্ত্রণ যেন থাকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি কর্তৃপক্ষের হাতে।'

'তার মানে হান্টিং টিমের পরিকল্পনা আপনার নয়?'

'না, তবে আপত্তিও তুলিনি।'

'তা হলে কি ধরে নেব, ওই বুদ্ধি আপনাদের এজেন্সির কারও নয়?'

'না, যতটুকু জানি, বাইরে থেকে নির্দেশ দেয়া হয়।'

'বুঝলাম।' চুপ হয়ে গেল জেরাল্ড। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'তা হলে কি ধরে নেব, ওই সময়ে আর্মি বা মেরিন ফোর্সের কাছে সাহায্য চায় সিআইএ? আর তখনই পেন্টাগনের কেউ... নাম সম্ভবত এজেন্ট জেন্স সিমন্স... তাকে বলে দেয়া হয় কিলার টিম তৈরি করতে?'

'আ... আসলে... খুকখুক করে কাশল ডক্টর গ্রেবার। 'এসব সাইটে আগে থেকেই সিকিউরিটির জন্যে মিলিটারি কনটিনজেন্ট রাখা হতো। পরে ওই পশু বা দানবকে শেষ করতে স্পেশাল ইউনিট তৈরি করলে আরও গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়ে তারা।'

এ বিষয়ে আগে যা শুনেছে, মনে মনে পর্যালোচনা করছে জেরাল্ড। সামান্য বিরতির পর বলল, 'একটা কথা বলুন, ডক্টর, আপনি তো বিজ্ঞানী। বায়োলজির বিষয়ে অনেক কিছুই জানেন। ওই জন্তুকে কী প্রজাতির বলে মনে করছেন?'

'আসলে, মার্শাল, ওই একই কথা জানতে চাইতে পারি আপনার কাছে। আর যা-ই হোক, এসব বিষয়ে তদন্ত করছেন আপনি, আমি নই। আপনি নিজে আসলে কী ভাবছেন... বাস্তবে ওটা কী?'

'আমি কি ভাবছি?' সরাসরি বিজ্ঞানীর চোখে চাইল জেরাল্ড। গোপন রাখল না মনোভাব। 'আপনি ওটাকে পুরুষ জন্তু বা মাদী জন্তু যা-ই বলুন, ওটা আসলে সত্যিকারের দানব, ডক্টর।'

'হ্যাঁ, আসলেই তা-ই,' মৃদু হাসল গ্রেবার। মনে হলো হঠাৎ করে চলে গেছে হাজার মাইল দূরে। শীতল হয়ে উঠেছে দুই চোখ।

অস্বস্তিকর নীরবতা নামল ঘরে। অন্য কৌশল ধরতে চাইল জেরাল্ড। এরই ভিতর *পাথর ভাঙা* ডিগবার্টের পরামর্শ পাত্তা না দিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

ডক্টর ডেভিড গ্রেবার বুঝে গেছে, আসলে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে মার্শাল। আরও খারাপ দিক, প্রমাণ হয়ে গেছে কাজে ও সিরিয়াস। পরে রাতে *পাথর ভাঙার* সঙ্গে কথা বলবার সময় দরকার পড়লে এই দিকটা গোপন করতে হবে। সত্যিই অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিয়ে ফেলেছে।

'আপনি যে হান্টিং টিম গঠন করেছেন, সে বিষয়ে বলুন,' বলল জেরাল্ড, 'কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই জরুরি তথ্য জেনে নিয়েছে আপনার কাছ থেকে?'

'উপদেষ্টা হিসেবে বলেছি, প্রাথমিক অবস্থায় যেন রাখা হয় একজন বিজ্ঞানীকে,' বলল গ্রেবার, 'আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এই পরিস্থিতিতে এ ছাড়া উপায় ছিল না। অনেকের ভেতর থেকে বেছে নেয়া হয়েছে সত্যিকারের জিনিয়াস আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালিকে। সৈনিকদের বাছাই করার কাজে নিজে আমি ছিলাম না। তাদের সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না। তবে জেনেছি, তারা

দক্ষ এবং পেশাদার সৈনিক। তাদের নেতা হিসাবে রাখা হয়েছে এক বাঙালি প্রাক্তন মেজরকে। নাম মাসুদ রানা। শুধু যে নেতা, তা-ই নয়, তার আরেকটা কাজ ট্র্যাকার হিসেবে ওটাকে খুঁজে বের করা। দলের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড কং তানামুরা। জাপানিয় আর্মি থেকে অবসর নেয়া এক অভিজ্ঞ সৈনিক।'

'ওই জন্তুকে খুঁজে খুন করার কাজ দেয়া হয় তাদেরকে?'

'হ্যাঁ, ওটা আসলে সার্চ-অ্যাণ্ড-ডেস্ট্রয় মিশন। চোখ বুলিয়েছি এদের সবার ফাইলে। কাউকে অযোগ্য মনে হয়নি।'

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করছে, ভাবল জেরাল্ড। নামকরা অভিযাত্রী, শখের আর্কিয়োলজিস্ট, রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির চিফ মাসুদ রানার কথা চেপে যেতে চাইছে।

'হ্যাঁ, এই লোক মাসুদ রানা, তার সম্পর্কে আরও কিছু বলবেন?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

'হ্যাঁ, বেশ নামকরা ট্র্যাকার। নিখোঁজ মানুষকে কয়েকবার জঙ্গল থেকে খুঁজে এনেছে। পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর সঙ্গে জড়িত। যদিও তাকে এত গুরুত্বপূর্ণ ধরে নেয়ার কোনও কারণ নেই। খুঁজলে পেয়ে যাব তার ফাইল। এখানেই কোথাও রেখেছি। আপনি পড়তে চান?'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর মুখে বলল জেরাল্ড। 'তবে তার আগে আরেকটা প্রশ্নের জবাব দিন। আগেও অন্তত দু'বার ওই প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেছেন আপনি।'

'তাই? সত্যিই দুঃখিত!' অবাক হয়েছে মনে হলো গ্রেবারকে। 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও তথ্য দিতে পারিনি? আপনার মনে কোনও সন্দেহ তৈরি হয়ে থাকলে, নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, আসলে কিছুই গোপন করছি না আমি। এই বিষয়ে কিছুই লুকাবার নেই কারও।'

'বুঝলাম,' অমায়িক হাসল জেরাল্ড, 'আপনার কি মনে হয়, আমেরিকানদেরকে যে খুন করছে, সে কি অন্য দেশের হয়ে কাজ

করছে? বিশেষ করে রাশা? অথবা উত্তর কোরিয়া? এসব ফ্যাসিলিটি তাদেরও আছে। আপনাদের সংগ্রহে করা তথ্য কাজে আসবে তাদের?'

ডক্টর গ্রেবারের মুখে হাসি ফুটতে গিয়েও ফুটল না। 'না, মার্শাল। মনে হয় না গোপনে হামলা করছে কোনও দেশ। আমরা যেসব টেকটোনিক ফেনোমেনা মনিটর করি, সেসব মিলিটারির বিষয় নয়।'

'হান্টিং পার্টির কর্তৃত্ব কার হাতে?'

'আগেই বলেছি, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির।'

'আমি আসলে জানতে চাইছি, এই সংগঠনের তরফ থেকে ওই অ্যাসেট টিমের বিষয়ে কাকে দেয়া হয়েছে কর্তৃত্ব?' হাল ছাড়ল না টম জেরাল্ড।

'কর্তৃত্ব? সেটা দেয়া হয়েছে পেন্টাগনের লেফটেন্যান্ট কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ানকে। বহুবার এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। মাঝে মাঝে ফোন করেন... জরুরি আলাপের জন্যে।'

'এজেন্ট জেন্স সিমন্সকে চেনেন?'

দ্বিধাহীন ভাবে গ্রেবার বলল, 'ভাল করেই চিনি। সে আছে এনএসএ বা ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিতে। গোটা অপারেশন সুপারভাইস করছে।'

'বলতে পারেন কোথায় পাব তাকে?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

'তা... ঠিক...' চুপ হয়ে গেল গ্রেবার। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'সে আছে বোধহয় এখন ল্যাংলিতে। ঠিক নিশ্চিত নই। মাত্র দু'বার তার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে আমার। তবে তাকে যোগ্য লোক মনে হয়েছে। এনএসএ-এর হয়ে সুপারভাইস করছে ওই টিমের সমস্ত কার্যক্রম।'

মিথ্যা বলছে, ভাবল জেরাল্ড। চট করে চাইল তার চোখে। রাগ-ভয়ের অনুভূতি নেই লোকটার ভিতর। বলল, 'ডক্টর, আপনি

নিশ্চয়ই জানেন, ওই শিকারি দলের কাজের দায়-দায়িত্ব যার, সে নিশ্চয়ই প্রতিদিন যোগাযোগ করছে তাদের সঙ্গে?'

বোধহয় মিলিটারি কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অজ্ঞ ডক্টর ডেভিড গ্রেবার, নইলে অভিজ্ঞ, দক্ষ অভিনেতা। 'তাই তো... হওয়ার কথা, মার্শাল। আমি অবশ্য কখনও মিলিটারিতে ছিলাম না, তাই জানি না কী করে ওরা। মনে হয় এজেন্ট জেন্স সিমন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করলে এসব বিষয়ে জানতে পারবেন।'

'তাই করব,' বলল জেরাল্ড। বুঝে গেছে, এখানে তদন্ত করে সুবিধা হবে না। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। নরম সুরে বলল, 'ঠিক আছে, ডক্টর, আপাতত আর বিরক্ত করব না আপনাকে। আগে চোখ বোলাতে হবে আপনার দেয়া ফাইলে।'

চেয়ার ছাড়ল ডক্টর গ্রেবারও, হাত বাড়িয়ে নিল কয়েকটা ফোল্ডার। সহজ সুরে বলল, 'মার্শাল, আমার কাছে কিন্তু এজেন্ট জেন্স সিমন্সের ফাইল নেই।'

'আসলে আমার দরকার মিস্টার রানার ফাইলটা, ডক্টর,' বলল জেরাল্ড।

'ও, আচ্ছা,' মাথা নাড়ল গ্রেবার। 'আগেই বলেছি, ওই লোক কিন্তু এই মিশনের জন্যে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

কথা না বাড়িয়ে বিজ্ঞানীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট ফাইলটা নিল জেরাল্ড। দ্বিতীয় পাতায় এক যুবকের আট বাই দশ ইঞ্চির ছবি। নিষ্ঠুর মনে হলো তাকে। কালো চুল ক্রু-কাট। চওড়া কপাল। অদ্ভুত কুচকুচে কালো চোখের মণি। সরাসরি চেয়ে আছে ক্যামেরার দিকে। খাড়া নাক। ঠোঁটের কোণে জ্বলন্ত সিগারেট। যেন হাসতে গিয়েও হাসছে না। চওড়া কাঁধ, প্রশস্ত বুক। সবমিলে সত্যিকারের নায়ক, অভাব নেই আত্মবিশ্বাসের।

মনে মনে বলল টম জেরাল্ড, খুঁজে বের করতে হবে, কেন এত কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে এই লোককে!

'পাশেই রিডিং রুম পাবেন,' বলল ডক্টর গ্রেবার।

মৃদু মাথা দুলিয়ে ফাইলগুলো হাতে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল জেরাল্ড।

একত্রিশ

নির্ভুল ভাবে পথ দেখিয়ে সবাইকে খনির মুখে এনেছে মাসুদ রানা। ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা। এক ঘণ্টা পর চারপাশ হয়ে উঠবে ধূসর, তারপর জঙ্গল ও পাহাড়ে নামবে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

পিকঅ্যাক্স ব্যবহার করে পাথুরে টিলা গভীর ভাবে খুঁড়ে বের করা হয়েছে খনি। রাতে থাকতে চাইলে জায়গাটা ভাল। খনি-মুখে দাঁড়াতে পারবে বড়জোর চারজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ। আগের মালিক কুঠারে কাটা পুরু গাছের গুঁড়ি দিয়ে আটকে গেছে খনি-মুখ। এসব গুঁড়ির বয়স কমপক্ষে বিশ বছর, কিন্তু পচে যায়নি ভেজা-শীতল এ আবহাওয়াতেও। আরও ভাল, অন্য কারণে। খনি-মুখে স্টিলের পুরু বিমের পিছনে আটকে দেয়া হয়েছে এসব গুঁড়ির একদিক।

ভিতরে ঢুকতে চাইলে বিমের উপর তুলতে হবে গুঁড়ি। একেকটা এতই মোটা, সরাতে পারবে না একা কেউ। ভাঙতে গেলে চাই হাতির জোর। স্টিলের দরজা থেকে কবজা ছিঁড়ে ফেলা এক কথা, কিন্তু আড়াই ফুট ব্যাসের গুঁড়ি ফাটিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়া একেবারেই অন্য।

ফুটবল খেলোয়াড়দের মত জড় হয়ে বসে আলাপ শুরু

করেছে রানা এবং ওর দলের সবাই। স্ট্রেচারে শুয়ে আছেন প্রফেসর, আগের চেয়ে সুস্থ। রানার কথা শুনে মাথা নাড়ল তানামুরা। 'সব ক'টা গুঁড়ি একসঙ্গে উপড়ে ফেলতে পারে ওটা।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল রানা। 'সহজে ভাঙবে না এগুলো। একটা যদি ভাঙে, আমরা তো চুপ করে বসে থাকব না। ওটার জন্যে সহজ হবে না শিকার করা। বুঝবে, আমাদের কাছে পৌঁছুতে হলে কমপক্ষে বিশ মিনিট খাটতে হবে। ততক্ষণে ওটাকে আহত করতে পারব আমরা।'

খনির দিকে চেয়ে হাসল টড ওয়েইলার, মাথা নাড়ল বার কয়েক। 'ওটা মৃত্যু-ফাঁদ, রানা। ওখানে রাতে কেউ থাকলে, হাড়গোড় থাকবে বহু কালের জন্যে।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখল রানা। 'এর চেয়ে ভাল কোনও পরামর্শ আছে তোমার, ওয়েইলার? থাকলে বলে ফেলো।' কঠোর চোখে চেয়ে আছে ও।

খনির দিকে চাইল ওয়েইলার, আস্তে করে মাথা নেড়ে আবারও চাইল রানার চোখে। ম্লান হাসছে। মনে হলো, সে এমন এক লোক, যাকে বলে দেয়া হয়েছে, এবার ফাঁসিতে ঝুলতে হবে তাকে। 'না, রানা,' বলল সে, 'আমার মাথায় এর চেয়ে ভাল কিছু আসছে না।'

উঠে দাঁড়াল সবাই। এমন কী কনুইয়ে ভর করে স্ট্রেচারে আধবসা হলেন সিরাজউদ্দীন। কান পেতে শুনেছেন ওদের কথা। আবারও হয়ে উঠেছেন সতর্ক। মনে হলো না হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হবে। মনোযোগ দিয়ে দেখলেন খনি-মুখ।

'ঠিক আছে,' পুরনো খনির সামনের দুই গাছের গুঁড়ির কেবিন দেখাল রানা। ওগুলো বেশ টেকসই। কয়েক বছর আগেও ব্যবহার করা হতো। 'এবার বলছি কী করতে হবে।' সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ডের দিকে চাইল রানা। 'তোমার কোনও আপত্তি থাকলে

বলে ফেলো।'

'কোনও আপত্তি নেই,' শুকনো মুখে বলল তানামুরা।

'রাত নামার আগেই কাজে নামতে হবে,' বলল রানা, 'প্রথমে কেবিন থেকে খসিয়ে নেব কয়েকটা গুঁড়ি। বয়ে নেব খনির ভেতরে। পরে আগুন জ্বালতে কাজে আসবে। তানামুরা আর আমি এ কাজটা করব। তারপর খুলব খনি-মুখের গুঁড়ি। ...ওয়েইলার, প্রেস্টন, তোমরা কেবিনে ঢুকে দেখবে খাবার, ফিউয়েল, লণ্ঠন, দু'চারটা কট বা দরকারী কিছু পাওয়া যায় কি না। ...এখানে প্রফেসরকে পাহারা দেবে জিনা। দানবটাকে আহত করার মত একমাত্র শক্তিশালী রাইফেল ওর কাছেই আছে। ...সবাই বুঝতে পেরেছ?'

মাথা দোলাল সবাই।

'গুড। আর বড়জোর এক ঘণ্টা হাতে পাব, তার আগেই খনির ভেতর অংশ নিরাপদ করে তুলতে হবে।'

সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওরা।

কেবিন থেকে গুঁড়ি সরিয়ে নেয়ার পর খনি-মুখের গুঁড়ি খুলতে গিয়ে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হলো রানা ও তানামুরাকে। পিঠ ও কোমর বাঁকা হয়ে গেল ওদের, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্টিলের বিমের এদিক থেকে তুলে আনল দ্বিতীয় গুঁড়ি আগের চেয়ে সহজে উঠল। খনি-মুখের ফাঁক ব্যবহার করে নানান ইকুইপমেন্ট ভিতরে পাঠাল ওরা। ততক্ষণে কেবিনে তিনটে লণ্ঠন, অর্ধেক ক্যান কেরোসিন, ছয়টা কম্বল ও তিনটে পোর্টেবল কট পেয়ে নিয়ে এসেছে প্রেস্টন আর ওয়েইলার।

কেবিনে খাবার বলতে কিছুই নেই। কিন্তু টিলা বেয়ে নেমে আসা এক ঝর্না থেকে ক্যান্টিন ভরে নিল ওরা। আধ ঘণ্টা পর ঢুকে পড়ল খনিতে। সাবধানে আবারও বিমের এদিকে তুলল দুই পুরু গুঁড়ি। ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা। সামান্য ফাঁক দিয়ে খনির

মেঝেতে পড়েছে এক চিলতে লালচে আলো। ওই পথে আসছে শীতল হাওয়া, কিন্তু চাইলেই হঠাৎ হামলে পড়তে পারবে না দানবটা।

দেয়ালের আংটায় ঝুলিয়ে জ্বেলে নেয়া হলো তিন লণ্ঠন। খোলা হলো এমআরই। সবাই ক্ষুধার্ত। ঝর্নার পাহাড়ি ট্রাউট নেই, নীরবে বিস্বাদ খাবার খেতে লাগল রানা। ওদের সঙ্গে রয়েছে কালো নেকড়ে হান্টার। খনির বাইরে জ্বেলে এসেছে ওরা বড় আগুন। সারা রাত জ্বলবে ওটা।

আপাতত আর কিছু করবার নেই, অপেক্ষা করা ছাড়া।

নীরবে পেটে খাবার চালান দিচ্ছে ওরা।

কিছুক্ষণ পর বালিশে আধ-শোয়া হয়ে দুর্বল স্বরে বলতে শুরু করলেন প্রফেসর সিরাজউদ্দীন, 'আমার ধারণা... ভুল না হয়ে থাকলে... বুঝতে পেরেছি... ওটা আসলে কী। এত অসুস্থ না হলে... আগেই বুঝতাম... আগেই বলতে পারতাম।'

একবার সিরাজউদ্দীনকে দেখে নিয়ে তানামুরার দিকে চাইল রানা।

খাবার চিবুতে চিবুতে থেমে গেছে জাপানি সৈনিক। গভীর মনোযোগে দেখছে প্রফেসরকে।

'আগে খেয়ে নাও,' বললেন সিরাজউদ্দীন। 'বুঝতে পারছি খুব ক্লান্ত তোমরা। আর... সত্যি, অনেক ধন্যবাদ, আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। সবার খাওয়া শেষ হলে বলব কে আসলে আমাদের শত্রু।'

সবার খাওয়া শেষ হলো দশ মিনিট পর। বলতে শুরু করলেন প্রফেসর, 'এবার বলছি আমার ধারণা।' মুখ খুলেই খক-খক করে বেদম কাশতে লাগলেন। সামলে নিয়ে বললেন, 'হাতে বোধহয় বেশি... সময় পাব না। রানার কথাই ঠিক। উচিত কাজ হয়েছে... নিজেদেরকে সুড়ঙ্গে আটকে ফেলা।'

'সান ত্যু বলেছেন, শত্রুর ক্ষমতা বেশি হলে সবসময় উচিত নিরাপত্তামূলক অবস্থান থেকে লড়াই করা,' বিড়বিড় করল তানামুরা। 'প্রথমে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে হবে, তারপর লড়াই।'

মৃদু হেসে মাথা দোলালেন সিরাজউদ্দীন। 'ঠিক কথাই বলেছেন। আমিও সে কথাই বলছি। প্রথম কাজ যতটা সম্ভব নিজেদেরকে নিরাপদ রাখা। ...আগে বুঝতে পারিনি ওটা আসলে কী। এবার বলছি আমার অ্যানালিসিস। প্রথমে শুনলে মনে হতে পারে, ফালতু কথা বলছি। তবে পরে বোঝা যাবে, জরুরি কারণেই এসব বলেছি। ...রানা, তোমার মনে আছে, প্রথম ক্যাম্পসাইটের কাছে যে ঝর্না ছিল, পাশেই ছিল আর্কটিয়াম ল্যাপ্পা বা বারডক, বাংলা ভাষায় বলে ভাঁটুই গাছ?'

মাথা দোলাল রানা।

'ঠিক গাছ নয়, ঝোপ। ওগুলোর থাকে মাথা বা গম্বুজের মত আকৃতির পাতা। চূড়া হয় সূচালো। ঝর্না, খাল বা নদীর তীরে বড় এলাকা নিয়ে জন্মায়। মাটিতে বিছিয়ে পড়ে থাকে পাতা। ঢেকে ফেলে অন্যসব গাছ।' একটু বিরতি নিয়ে আবারও বলতে লাগলেন প্রফেসর, 'রানা, তোমার মনে আছে, গত বছর ক্যানাডিয়ান রকিতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম? ওই পাতা দিয়ে কীভাবে চিকিৎসা করেছিলে? আহত ছিলাম। জ্বর এল গা কাঁপিয়ে।'

'মনে আছে,' বলল রানা। 'ওই গাছের পাতা দিয়ে চা করে দেয়ার পর খুব দ্রুত ছেড়ে গেল আপনার জ্বর।'

'ঠিক,' মাথা দোলালেন প্রফেসর, 'মনে আছে, দু'বছর আগে জখম হলো আমার ডান পায়ের হাড়? তখন চা-র মত করে খেলাম ইউরাটোরিয়াম পার্ফোলিয়াটামের পাতা? ওই জিনিস ব্যবহার করে দ্বিগুণ দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম।'

'জী,' বলল রানা।

সবাই বুঝতে পারছে, বাইরে অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী এক দানব। খুঁজছে ওদেরকে। চেয়ে আছে গুঁড়ির দেয়ালের দিকে। ভাবছে, কীভাবে হামলা করবে।

এই অবস্থায় কী কারণে এসব অতীত রোমন্থন করছেন বৃদ্ধ?

বাজে কথার মানুষ নন, দরকার ছাড়া এসব বলছেন না তিনি।

'গাছ, শেকড় বা লতা... আসলে প্রকৃতি মস্ত বড় এক গবেষণাগার,' বেদম কাশতে শুরু করলেন বাঙালি প্রফেসর। দমক থেমে গেলে বললেন, 'কেউ যদি বুঝতে পারে প্রকৃতির অপার রহস্য, তার হাতে আসবে অচিন জাদুকরের দারুণ জাদুর দণ্ড। আজ আমরা দেখছি চারপাশের প্রকৃতি। কিন্তু আজ থেকে মাত্র দশ হাজার বছর আগে এই প্রকৃতি ছিল আজকের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ। আর প্রতি বছর প্রতিটি দিন বিলুপ্ত হচ্ছে কমপক্ষে এক শ' প্রজাতির প্রাণী বা গাছ। অর্থাৎ, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, অতীতে আরও কত বিচিত্র ছিল এই প্রকৃতি? হয়তো ভাববে, আরও কত হাজারো ঔষধী গাছ ছিল? আঁচ করতে পারো, কী ছিল হাতের নাগালের কাছে? এবং তখন যদি হোমো সেপিয়েন্সের মত কোনও জাতি জানত প্রকৃতির এসব রহস্যের কথা?'

চুপ করে থাকল সবাই।

পরস্পরের দিকে চাইল রানা ও জিনা।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন সিরাজউদ্দীন, মৃদু হাসলেন। 'তোমরা বুঝতে পেরেছ আমার কথা? আজকের মানুষের কোনও এক পূর্বপুরুষ জাতি জানত, কীভাবে প্রকৃতির কাছ থেকে পেতে হবে অসীম ক্ষমতা। গাছ-গাছালি থেকে সংগ্রহ করত শক্তি, সারিয়ে নিত প্রায় সব রোগ। দেহের পেশি ও হাড়ের জোর বাড়িয়ে নিয়েছিল তারা। আয়ু হয়ে ওঠে হাজার হাজার বছর। শত শত

জেনারেশন ধরে ফিযিকালি ও সাইকোলজিকালি অন্যরকম হয়ে গেল নানান গাছের ওষুধের কারণে। বুঝতে পারছ?'

'আর উত্তর-পুরুষদের জিনে লিখিত থাকল এসব গুণ?' প্রফেসরের দিকে চেয়ে আছে রানা।

'ঠিক!' তুড়ি বাজালেন সিরাজউদ্দীন। 'জানতাম তুমি ধরে ফেলবে, রানা! পাল্টে গিয়েছিল তাদের জেনেটিক প্যাটার্ন।'

'আপনি তা হলে বলতে চাইছেন, বাইরে যেটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওটা আমাদের পূর্বপুরুষদের মিউটেটেড দানব?' জানতে চাইল তানামুরা।

'কথা আরও আছে,' একটু ঝুঁকে বসলেন প্রফেসর, 'বাইরে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে কিন্তু হোমো সেপিয়েন্সের চেয়ে শারীরিক ভাবে অনেক শক্তিশালী। কিন্তু প্রকৃতির ওষুধের কাছ থেকে সাহায্য নিতে হয়নি তাকে। তার পূর্বপুরুষরা বহু কাল ধরে যুক্তি বা সচেতন চিন্তার বদলে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে শিকারি মনোভাব ও শারীরিক শক্তি বাড়িয়ে নেয়ায়, ফলে হয়ে উঠেছে অসচেতন মগজের প্রাণী।'

'অসচেতন?' ভুরু কোঁচকাল তানামুরা।

'হ্যাঁ, তানামুরা। মগজ কাজ করছে তার আপন খেয়ালে। নৈতিকতা, সমাজ, দায়িত্ব, ভালবাসা বা ধৈর্য– কিছুই নেই তার। যে উঁচু ধারণা বুকে লালন করে মানুষ, সেসবও নেই। সভ্যতা সৃষ্টি তার কাজ নয়। মানুষের মত কোনও ভাল কাজ করে গর্বিত হবে না কখনও।' আঙুল তুলে গুঁড়ির দেয়াল দেখালেন তিনি। 'বাইরে যে অপেক্ষা করছে, তার মন বলতে কিছুই নেই। মানুষের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, কিন্তু তার এখানে থাকার কথা নয়। দশ হাজার বছর আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে ওই প্রজাতির মানুষ।'

'তা হলে ওটা এল কোথা থেকে?' জানতে চাইল ওয়েইলার।

বড় করে দম নিয়ে ভুরু উঁচু করলেন সিরাজউদ্দীন। 'আমি এখনও এর জবাব দিইনি, কিন্তু জানি কী ঘটেছে।' এক এক করে সবার মুখ দেখলেন তিনি। 'সামান্য কিছু হলেই খুন করবে ওটা। বলা চলে প্রোটো-হিউম্যান। দয়া ও ভালবাসার অনুভূতি নেই, আছে শুধু ইচ্ছে। যা খুশি করবে, কারণ তার আছে ক্ষমতা। নিয়ন্ত্রণ করবে না মনকে। খুশি হবে খুন করতে পারলে। আসলে তা-ই চাইছে তার অন্তর। ইচ্ছেপূরণ ওটার জন্যে খুব জরুরি। ওর চিন্তা বুঝতে চাওয়া আমাদের মত মানুষের জন্যে অসম্ভব, কারণ আমরা মন বা চিন্তা বলতে যা বুঝি, তা তার নেই। অন্ধকার জগতের প্রাণী, কাউকে শত্রু ভাবলেই খুন করবে। অবদমিত ইচ্ছে আদিম মানুষের মত। যা চাইবে, তাই পেতে হবে, নইলে থামবে না। সে যে জাতির উত্তরপুরুষ, তারা ছিল মানুষের চেয়ে অনেক শক্তিশালী শিকারি। মনে রাগ জাগলেই ঝাঁপিয়ে পড়ত।'

রানা টের পেল, ওর শিরায় বইছে অ্যাড্রেনালিনের স্রোত। একবার তাকাল তানামুরার দিকে। ওকেই নিস্পলক চোখে দেখছে জাপানি যোদ্ধা। কথা হলো না ওদের মাঝে, কোনও ইশারাও নয়।

রানা খেয়াল করল, চোখ বুজে ফেলেছে জিনা, পিছন দেয়ালে হেলান দিয়েছে মাথা। খাপ থেকে বাউয়ি ছোরা বের করে সামনের ধুলোয় আঁকিবুঁকি করছে টড ওয়েইলার। ছায়ায় দেখা গেল না মুখের পোড়া অংশ। চুপ করে আছে সে।

'প্রফেসর,' মুখ খুলল তানামুরা, 'আমরা ওটাকে খুন করব কী করে?'

মাথা দোলালেন সিরাজউদ্দীন। 'তা জানব, বাছা, যদি জানতে পারি কে তৈরি করেছে তাকে।'

শুয়ে ছিল হাণ্টার, হঠাৎ তুলল মাথা। খাড়া হয়ে গেছে কান।

সরাসরি গুঁড়ির দেয়ালে চাইল রানা। ফিসফিস করে বলল জিনাকে, 'খেলা শুরু।'

নিজের রাইফেল হাতে তুলে নিল ও।

বত্রিশ

ঠিক রাত তিনটের সময় *পাথর ভাঙা* হ্যাঙ্ক ডিগবার্টের বাড়িতে পৌঁছুল ডেপুটি মার্শাল টম জেরাল্ড। সিনিয়র বন্ধুর ডাইনার সামান্য দূরেই। প্রতি ভোর পাঁচটার সময় কাজে যায় সে। এ কারণেই জেরাল্ড জানে, রাতের এ সময়ে জেগে আছে প্রাক্তন এফবিআই এজেন্ট।

রাস্তার উল্টো দিকে গাড়ি পার্ক করেছে টম। এ ছাড়া উপায়ও নেই। *পাথর ভাঙার* বাড়ির ড্রাইভওয়েতে কয়েকটা গাড়ি রাখা। প্রতিটি মেরামতের নানান পর্যায়ে আছে। জেরাল্ডের অবশ্য বার কয়েক মনে হয়েছে, এসব গাড়ির বারোটা বাজাচ্ছে বুড়ো, রুচি নেই তার। কিন্তু কিছু বলতে গেলে ঘাড়ে নামবে বেদম জোরে আদরের চাপড়। তা সহ্য করা সত্যিই কঠিন।

সদর দরজায় টোকা দিতেই বড়জোর দশ সেকেণ্ড পর খুলে গেল কবাট, প্রায় পুরো জায়গা জুড়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে পড়ল ডিগবার্ট, এত রাতেও কাজে যেতে তৈরি। পরনে সাদা টি-শার্ট ও পেইন্টার্স প্যান্ট। একপাশে সরে হাতের ইশারা করল দানব। প্রিয় স্যাঙাৎ ঘরে ঢুকতেই বন্ধ করে দিল দরজা। তোয়ালে দিয়ে দু'হাত মুছে নিয়ে বলল, 'বাছা, আমি ভেবেছিলাম তুমি গত রাতে

আসবে।'

'জরুরি কাজে আটকা পড়েছিলাম,' টেবিলের পাশ থেকে চেয়ার টেনে বসে পড়ল জেরাল্ড। আমন্ত্রণের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল প্লেট জুড়ে হাসি-হাসি মুখে বসে থাকা ওমলেটের উপর।

'কফি দেব?' জানতে চাইল ডিগবার্ট।

'দিলে ছাড়ে কে!' হাত ও মুখ ব্যস্ত জেরাল্ডের। একটু আগেও বুঝতে পারেনি এত ক্ষুধার্ত ছিল।

কফিমেকার থেকে গরম কালো তরল ঢালছে *পাথর ভাঙা*। 'দু'চারটে ব্যাপার হজম করতে হবে, রেডি তো, বাছা?'

'হ্যাঁ। আমি নিজেও বার কয়েক হোঁচট খেয়েছি। জীবনে প্রথমবারের মত বুঝতে পেরেছি দু'চারটে ব্যাপারও।'

মুচকি হাসল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। কফির মগ নামিয়ে রাখল জেরাল্ডের সামনে। ধপ্ করে সে বসে পড়তেই মড়মড় করে উঠল শক্তপোক্ত চেয়ারটা। 'উত্তর দিকের ওসব ফ্যাসিলিটি আসলে মিলিটারির নয়, সৈনিকের কনটিনজেন্ট রাখা হয়েছে স্রেফ পাহারা দেয়ার জন্যে। এদিকে আর্কটিক সার্কেলের নীচের অর্ধেক জমিতে যেসব আর্মি রেডিয়ো-পোস্ট ছিল বা আছে, সেগুলো ব্যবহার করছে এনএসএ। পুরনো মাল সব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। বহু বছর পড়ে ছিল, তারপর ছয় বছর আগে একটার পর একটা ফ্যাসিলিটি নতুন করে চালু করা হয়েছে।'

ডিম শেষ জেরাল্ডের। মুখ মুছল টিশু দিয়ে। 'বুঝলাম। কিন্তু নতুন করে খুলল কেন?'

'তা বলা কঠিন...' একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল ডিগবার্ট। 'আমার খবরের চ্যানেলে কিছু কথা শুনেছি। জানি না কার কথা বিশ্বাস করব। ওরা আমার নিজের লোক না।'

'আরও কী বলল তারা?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

'খুব গোপনে কাজ করতে হবে, তাই চালু করা হয়েছে এসব ফ্যাসিলিটি। কেউ কেউ ভাবছে, বিপজ্জনক কোনও গবেষণা হচ্ছিল। আর সত্যিই তো হলো ভয়ঙ্কর বিপদ।' টমের চোখে তাকাল ডিগবার্ট। 'হতে পারে জার্ম ওঅরফেয়ার, বায়োলজিকাল ওঅরফেয়ার টাইপের কুত্তার গু। হয়তো নতুন অ্যানথ্রাক্স, স্মলপক্স বা ব্যাকটেরিয়া। আবার হতে পারে নার্ভ গ্যাস বা টক্সিক এজেন্ট। যা-ই করা হোক ওখানে, সিআইএ চায়নি জনবহুল এলাকায় গবেষণা করা হোক।'

'আচ্ছা?' বিড়বিড় করল জেরাল্ড, 'এজন্যে ব্যবহার করেছে বহু দূরের ওই ফ্যাসিলিটি। মস্ত কোনও ভুল হলে কয়েকটা ফিউয়েল এয়ার বম ফেলে বাষ্প করে দেবে সব। দেশের মানুষ মরবে না বললেই চলে।'

'ঠিক,' মাথা দোলাল ডিগবার্ট। 'উড়িয়ে দাও বিশ বর্গ মাইলে যা আছে সব, ক্যারিব্যু আর গাছ ছাড়া মরবে না কেউ। সিআইএ শুধু বলবে, দাবানল ধরেছিল ওখানে। কিছু বলতে পারবে না কেউ। কোনও প্রমাণ থাকবে না।'

'এমন জায়গা বাছাই করেছে, যেখানে বড় ধরনের গোলমাল হলেও ধরতে পারবে না কেউ,' চেয়ারের পিঠে হেলান দিল টম, 'কিন্তু কী জিনিস আটকে বা ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছে ওখানে? ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস, না অন্য কিছু?'

'জানি না।'

'আন্দাজ করার চেষ্টা করো, ডিগ।'

নাক কুঁচকে ফেলল পাথর ভাঙা। 'সবই ইঙ্গিত করছে জার্ম বা ওই ধরনের ব্যাপারের দিকে, কিন্তু নিশ্চিত নই। মুখ খুলছে না কেউ। বাধ্য হয়ে গুজব থেকে এক টুকরো, আধ টুকরো অংশ জোড়া লাগাতে চেয়েছি।' চুপ হয়ে গেল ডিগবার্ট। একটু পর বলল, 'এসব করছে এনএসএ, কাজেই কোনও ব্যাপারেই শিয়োর

হওয়ার উপায় নেই। গোপন করা হচ্ছে সব। কিন্তু কিছু যে করছে, সন্দেহ নেই। তাই আমার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি। সে কাজ করে এয়ার ফোর্সে। ওদিকেই আছে ওদের কয়েকটা এয়ারবেয। ওকে বলেছিলাম, যাতে ওদের লগ খুঁজে বের করে, নতুন করে এসব ফ্যাসিলিটি চালু হওয়ার পর কী ধরনের জিনিস পৌঁছে দেয়া হয়েছে। সময় লেগেছে লগ দেখতে। কিন্তু কাজটা পেরেছে। আমাকে বলেছে, একটা কোম্পানির বিশেষ কিছু শিপমেন্ট প্রচুর পরিমাণে পাঠানো হয়েছে এসব ফ্যাসিলিটিতে। নিশ্চিত নই, হয়তো অন্যান্য ফ্যাসিলিটিতেও এসব গেছে। বিশেষ করে একটা জিনিস চোখে পড়েছে আমার।'

'সেটা কী?'

'ওটার নাম এমইএএম। পুরো নাম বলতে পারব না। আমার বন্ধু অবশ্য বলেছে, এসব অদ্ভুত জিনিস ওখানে পাঠানো আসলে খুব অস্বাভাবিক।'

'তোমার কী ধারণা?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

'অর্ডার ছিল কাঁচের মত ভঙ্গুর কিছুর,' বলল ডিগবার্ট। 'বাক্সে লেখা: "হ্যাণ্ডল উইদ কেয়ার"। কিন্তু ম্যানিফেস্টে লেখা: "অফিস ইকুইপমেন্ট" বা "কনস্ট্রাকশন মেটারিয়েল"। বুঝতেই পারছ, গাঁজা মেরেছে শালারা। কোনও শালা "হ্যাণ্ডল উইদ কেয়ার" লিখে হাবক্যাপ বা কফিমেকার পাঠাবে না। তাই খোঁজ নিলাম এমইএএম জিনিসগুলোর মাল্টি-মাদার ফাকার ওই কোম্পানিতে। তারপর আমার বন্ধুকে বললাম, দেখো তো কোথা থেকে রওনা হয়েছে এসব। সে খুঁজে বের করল, কোথা থেকে কোথায় গেছে স্পেশাল-কেয়ার ফ্লাইট। মনে রেখো, টম, এসব ফ্লাইট রওনা হয়েছে ক্যানসাস থেকে, গেছে দূরের আলাস্কার প্রতিটি ফ্যাসিলিটিতে।'

'তার মানে, ক্যানসাস সিটিতে বিক্রি হয় ওই এমইএএম?'

বুঝতে শুরু করেছে টম জেরাল্ড।

খুশি হয়ে চওড়া হাসি দিল ডিগবার্ট। 'তোমাকে ভাল শিখিয়েছি। ক্যানসাস সিটিতে ওই জিনিস তৈরি করে মেডিকেল ম্যানুফ্যাকচারিং মস্ত এক কোম্পানি। নাম বায়ো সায়েন্স। বহু কিছু আছে তাদের: ড্রাগস, হাসপাতাল ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি। পুরো দেশের হাসপাতাল আর ইউনিভার্সিটিতে বিক্রি করে। এমন জিনিস নেই যা তৈরি করে না।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল জেরাল্ড। ডক্টর গ্রেবারের কথা ভেবে বিড়বিড় করল, 'শালা আস্ত কুকুরের বাচ্চা!' ডিগবার্টকে বলল, 'সাইসমোলজিকাল ইকুইপমেন্ট বা টেকটোনিক প্লেট মনিটর করার জিনিস তৈরি করে ওরা? ধরো হয়তো ভূগর্ভের এক্স-রে ইকুইপমেন্ট?'

ভুরু কুঁচকে ফেলল প্রৌঢ়। 'ভূমিকম্প মাপার কিছু?'

'হ্যাঁ। ...আছে?'

মাথা নাড়ল *পাথর ভাঙা*। 'থাকলেও শুনিনি কখনও। আর যদি তৈরি করেও, এতই কম, বেশি চলে না। হু-হু করে চলে ওদের মেডিকেল ইকুইপমেন্ট। ওই কাজেই ব্যস্ত। এ ছাড়া আছে ওষুধ উৎপাদন ও বিক্রি। দামি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মত সব জিনিস বিক্রি করে। সত্যিকারের নামকরা কোম্পানি।'

জেরাল্ড বুঝল, ডিগবার্ট যা বলছে, তার বেশিরভাগই জোগাড় করেছে পাবলিক লাইব্রেরি ঘুঁড়ে। ইলেকট্রনিক সার্ভিস আর বার্ষিক কর্পোরেট রিপোর্ট সাহায্য করেছে তাকে।

নিজের কমপিউটারও নেই ডিগবার্টের। থাকা যে জরুরি, তাও মনে করে না। ওর ধারণা, এসব জিনিস কেনা মানেই টাকা নষ্ট, নিজের ব্যক্তিগত জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করা। কিন্তু দরকার পড়লে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক ইনফর্মেশন। ভাল করেই জানে, এসব বিষয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে

চাইলে যাওয়া উচিত পাবলিক লাইব্রেরিতে। সিআইএ নজর রাখছে প্রায় প্রতিটি কমপিউটারে, মালিকদের নাম ও ঠিকানাও জানা আছে তাদের। কিন্তু কী করে ধরবে পাবলিক লাইব্রেরির কমপিউটার ব্যবহারকারীকে? একই কমপিউটার বেশিক্ষণ ব্যবহার না করলে নির্দিষ্ট কাউকে ধরার সাধ্য নেই সিআইএ-র বাপেরও।

পুরো এক মিনিট চুপ করে থাকল জেরাল্ড, জিগসও পাযলের একেক টুকরোর সঙ্গে জোড়া লাগাতে চাইল অন্য টুকরোগুলো। একটু পর বুঝে গেল, যে তথ্য ওকে দিয়েছে ডক্টর ডেভিড গ্রেবার, সেসবের সঙ্গে *পাথর ভাঙার* তথ্য একেবারেই মিলছে না। সোজা কথায়, মিথ্যা বলেছে গ্রেবার।'

'পরিবেশ ভাল ঠেকছে না, ডিগ,' বলল জেরাল্ড।

'আসলে তা-ই, বাছা,' সোজা হয়ে বসল ডিগবার্ট, 'নিশ্চয়ই জানো, সবচেয়ে সহজ যে জবাব প্রথমে মনে আসে, কখনও কখনও ওটা চোখেই পড়ে না, কারণ অন্য কোথাও খুঁজছ আরও জটিল জবাব। আসলে হয়তো ওটা আইনসম্মত গবেষণা, তৈরি করতে চাইছে কোনও ব্যাকটেরিয়া বা ওই ধরনের কিছুর বিরুদ্ধে উপযুক্ত সিরাম। হতে পারে না? ...আর কোনও দেশ, একদল চোর বা ডাকাত চাইছে ওই সিরাম। গোপনে সরিয়ে নিতে চেয়েছে, আর তখন বাধ্য হয়ে খুন করেছে সবাইকে। আমি বলছি না এমনই হয়েছে, কিন্তু এসব মাথায় রাখতে হবে। ওখানে ভয়ঙ্কর জটিল ষড়যন্ত্র চলছে ভাবলেই কাজ হবে না, আগে চাই উপযুক্ত প্রমাণ।'

ঠিকই বলেছে *পাথর ভাঙা*, ভাবল জেরাল্ড। ভুল করে না মানুষটা, বুলডগের মত চেহারা হলেও ঝড়ের গতিতে চলে মগজ। দক্ষ এবং নির্ভুল। আবারও ভাবতে শুরু করেছে টম, তখনই দেখল চট্ করে একবার হাতঘড়ি দেখল প্রাক্তন

এফবিআই এজেন্ট। অবশ্য মনে হলো না কোনও তাড়া আছে। জেরাল্ড কিছু বলবে সেজন্য ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে।

'বুঝতে পারছি না, ডিগ,' একটু পর বলল টম, 'কী যেন মিলছে না। সাইসমিক অ্যাকটিভিটি মনিটর করবে, তো এসব স্টেশন মেডিকেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির ইকুইপমেন্ট কিনল কেন?'

'তোমাকে তাই বলেছে?' বলল ডিগ, 'সাইসমিক অ্যাকটিভিটি নিয়ে গবেষণা করছে?'

'হ্যাঁ।' রাগ প্রকাশ পেল জেরাল্ডের কণ্ঠে। 'ল্যাংলিতে গিয়েছিলাম। ডাহা মিথ্যা ঝেড়েছে প্রোগ্রাম চিফ।'

'ওই কোম্পানি আরও কী বিক্রি করে, তা খুঁজে দেখিনি,' বলল *পাথর ভাঙা*। 'হয়তো এসব জিনিসের জন্য আলাদা ডিভিশন আছে ওদের। অথবা, ওই বিমানের পেটে রয়ে গিয়েছিল আগের কিছু মালপত্র। তা-ও যদি হয়, বায়ো-মেডিকেল জিনিস অর্ডার দেবে কেন সিআইএ? যা-ই হোক, আগে এসব খবর শুনিনি।'

চুপ করে আছে জেরাল্ড। একটু পর বলল, 'এরা জার্ম ওঅরফেয়ার নিয়ে রিসার্চ করলে, নাড়াচড়া করতে হয়েছে ক্লাসিফায়েড মেটারিয়েল। লাইব্রেরিতে ঢুকে বইয়ের মত পেয়ে গেল ব্যাসিলি, সেই জিনিস নয় ওসব। চাইলেই কপি করে নেয়া যায় না কারও বিশ বছরের রিসার্চ। এসব আবিষ্কার করতে সময় লাগে।' গভীর সন্দেহ নিয়ে বলল জেরাল্ড, 'সত্যিই যদি জার্ম নিরোধের কাজ না করে উল্টো তৈরি করে নতুন কোনও ভয়ঙ্কর জার্ম?'

'অবাক হওয়ার কিছু নেই,' তিক্ত হাসল ডিগবার্ট।

আস্তে করে মাথা নাড়ল টম। 'সেক্ষেত্রে এগযেকিউটিভ অর্ডার লঙ্ঘন করছে তারা।'

'তুমি দেখি হয়ে গেছ শার্লক হোম্‌স্‌,' নিজের জন্য কফিমেকার থেকে কালো তরল ঢালল ডিগবার্ট। 'বাছা, ইউনাইটেড স্টেটস কখনও আপত্তি তোলেনি ইউনাইটেড নেশন্সের নিষেধাজ্ঞায়, তার মানেই সবার জন্যে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে জার্ম ওঅরফেয়ার। নইলে বঞ্চিত হতে হবে নানান দিক থেকে। আসলে সবাই মিলেই নিজেদের জীবাণু গবেষণা বন্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, আগে যা তৈরি করেছিল, ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে সেসব। কাহিনি এখানেই শেষ। কিন্তু তুমি ভাল করেই জানো, আমরা আসলে কী করছি। অন্যান্য দেশে হয়তো রয়ে গেছে মারাত্মক সব জীবাণু। আর সেগুলো ঠেকাতে চাইলে আমাদের দরকার সিরাম। তুমিও জানো, একবার যুদ্ধ শুরু হলে নতুন করে গবেষণায় এগিয়ে যুদ্ধে জেতা সম্ভব নয়। প্রথম থেকেই এগিয়ে থাকতে হবে। আর সে কারণেই ট্রিটি হলেও আমেরিকা গবেষণা ও জীবাণু উৎপাদন বন্ধ করেনি। অবশ্য, শেষ দশকে আমরা বায়োলজিকাল ওয়েপন্স তৈরির চেয়ে সেসব ঠেকাতে বেশি মনোযোগী হয়েছি। আর এর খারাপ দিক হচ্ছে, আগে উৎপাদন করতে হবে ব্যাসিলি বা ভাইরাস, তারপর আবিষ্কার করতে হবে সিরাম। এখন কথা হচ্ছে, এ কাজ যদি আইনানুগ হয়, তা হলে এত গুপচুপ কীসের? আগের কথায় ফিরতে হবে তা হলে। আলাস্কায় যা ঘটেছে, সেসব কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা কিছু। ভয়ঙ্কর নৃশংস ভাবে খুন হয়েছে একদল মেরিন সৈনিক। বিস্তারিত ভাবে শুনিনি। কিন্তু এত বীভৎস ভাবে নাকি মানুষ-হত্যা করে না কেউ। ওখানে অন্য কিছু হয়েছে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল টম। 'তার মানেই, ওখানে গোপনে কিছু করা হয়েছে। ওই গবেষণার সময় মেডিকেল ইকুইপমেন্ট জোগাড় করতে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে এনএসএ। প্রতিটি ফ্যাসিলিটিতে রেখেছে এক প্লাটুন মেরিন।' কিছুক্ষণের

জন্য চুপ হয়ে গেল জেরাল্ড। তারপর বলল, 'ডিগ, তোমার কী মনে হয়, সরকারের অনুদান ব্যবহার করে বেআইনী কোনও গবেষণা করছে ওরা? আর তখনই হঠাৎ ভুল হয়েছে কাজে? আর ওই জিনিস, বা ওই দানব সবাইকে খুন করে বেরিয়ে গেছে ওদের নাগালের বাইরে?'

অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবল ডিগবার্ট, তারপর বলল, 'আমারও তা-ই মনে হয়।'

'আমারও একই ধারণা,' বিড়বিড় করল টম জেরাল্ড।

'বাছা, একটা কথা মনে রেখো, ছুটে গিয়ে লড়াইয়ে যোগ দিতে হয় না,' উঠে দাঁড়িয়ে কোট পরে নিল ডিগবার্ট। 'হেঁটে যোগ দিতে হয় লড়াইয়ে। এটাই নিয়ম। দরকার পড়লে যেন পিছাতে পারো। তিনটা উপদেশ তোমাকে সাহায্য করবে। প্রথমে, থাকতে হবে মিথ্যা পরিচয়-পত্র। দ্বিতীয়ত, খেয়াল রাখতে হবে নিজের পিঠের দিকে। আর শেষ কথা, সেলুলার ফোন থেকে সাবধান, ব্যবহার করবে ল্যাণ্ড ফোন।'

'জানি,' হাসল টম জেরাল্ড। 'তোমার দেয়া শিক্ষা মনে রেখেছি, ডিগ। আর এখন পর্যন্ত বোকার মত ধরা খাইনি।'

'অতি বোকাকেও বোকা ভাবতে যেয়ো না,' দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল ডিগবার্ট। 'আরে, তোমাকে তো বলিইনি, গতকাল পেয়েছি এক ক্রেট ব্র্যাণ্ড-নিউ এম-১ গ্যারেণ্ড। লড়তে চাইলে পৃথিবীর সেরা রাইফেল। লাগবে নাকি একটা?'

মৃদু হাসল জেরাল্ড। 'এত অস্ত্র দিয়ে কী করবে? একটার বেশি তো ব্যবহার করতে পারবে না, হাত তো মাত্র দুটো।'

'কে বলেছে?' বলল ডিগবার্ট, 'কে জানে, হয়তো ফেঁসে যাবে এক ছোকরা। সে আবার হয়ে উঠেছে ইউনাইটেড স্টেটস মার্শাল। কিন্তু চিপায় আটকে যেতে পারে তার পাছা। তখন রেগে যাবে বুড়ো হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, তার লাগবে একটার বেশি রাইফেল।'

চেয়ার ছেড়ে ওস্তাদের পিছু নিল টম জেরান্ড, হাসছে। 'অনেক ধন্যবাদ, ডিগ।'

'এবার কোথায় চলছে, বাছা?'

'জাঙ্কইয়ার্ডে। তারপর সিআইএ হেডকোয়ার্টারে।'

'দুটোর মধ্যে তফাৎ কোথায়?' নাক কুঁচকে ফেলল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট।

তেত্রিশ

সরু কটে শুয়ে আছেন প্রফেসর আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি।

তিনি ছাড়া অন্যরা মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, হাতে অস্ত্র।

চাপা ঘড়-ঘড় আওয়াজ ছাড়ল কালো হান্টার। যেন পাতালের গভীর থেকে এল দ্বিতীয় গর্জন, ভয়ঙ্কর!

পরক্ষণে গুঁড়ির ওপাশে কালকেউটে সাপের মত ফোঁস করে উঠল কে যেন! ওই গা শিরশির করিয়ে দেয়া আওয়াজ যেন ভাসছে বাতাসে। তখনই প্রচণ্ড জোরে ট্রাকের মতে কী লাগল গুঁড়ির দেয়ালে। খনির ছাত থেকে ঝরঝর ঝরল ধুলো। এত প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত হেনেছে, ওই আওয়াজ শুনে মনে হলো থরথর করে কাঁপছে গোটা খনি।

'সর্বনাশ!' ফিসফিস করল ওয়েইলার। পিছিয়ে গেল এক পা।

পরক্ষণে রানার নির্দেশে গুঁড়ির দেয়াল বা দরজার দিকে অস্ত্র তাক করল ওরা।

তখনই এল দ্বিতীয় ধাক্কা, যেন লাগল বুলডোজার। সেই সঙ্গে বিকট জোরালো আওয়াজ। বাতাসে কাঁপা বাঁশের সরু পাতার মত থরথর করতে লাগল ভারী সব গাছের গুঁড়ি।

আবারও এল নিদারুণ গুঁতো। তারপর আবার।

কিছু আছড়ে পড়ছে ওদিকে। প্রলয়ঙ্করী শব্দে কাঁপছে সুড়ঙ্গ। তারপর বিরতি দেয়া হলো। হামলা আবারও শুরু হলো একটু পর। সেই সঙ্গে চলছে ক্রোধান্ধ হুঙ্কার। একেকবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আর তখন গ্রেনেড ফাটবার মত আওয়াজ তুলছে শুকনো গুঁড়ি। নড়ে উঠছে সুড়ঙ্গের বদ্ধ বাতাস।

রানা খেয়াল করল, কখন যেন পিছাতে শুরু করেছে অন্যরা। 'কেউ পেছাবে না!' রেগে গিয়ে ধমক দিল, 'দরকার হলে মুখোমুখি হবে!'

'গুলি করে ব্যথা দেয়া যায়?' তিক্ত সুরে বলল ওয়েইলার।

পুরু গুঁড়ি ভেদ করবে এমন রাইফেল ওদের মাত্র একটা–জিনার ব্যারেট।

চট্ করে জিনার দিকে চাইল রানা।

কাঁধে রাইফেলের কুঁদো তুলে নিল জিনা। অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'চেষ্টা করতে দোষ নেই!'

পরের হামলার জন্য অপেক্ষা করল মেয়েটা, তারপর ভীষণ ভাবে গুঁড়ি কাঁপতেই সরল এক পাশে। মনে হলো খুঁজছে সঠিক জায়গা। এক পা বেড়ে টিপে দিল ভারী রাইফেলের ট্রিগার। ব্যারেলের মুখ থেকে ছিটকে বেরোল .৫০ ক্যালিবারের সলিড স্টিলের বুলেট। গতি প্রতি সেকেণ্ডে চার হাজার ফুটের বেশি। বিকট শব্দ ও উজ্জ্বল লাল আগুন বধির ও অন্ধ করে দিল ওদেরকে। গুঁড়িতে বুলেট বিঁধতেই ওদের গায়ে ছিটকে এসে লাগল কাঠের ধারালো সব চল্টা।

তখনই হঠাৎ শুনল আতঙ্কিত এক আর্তচিৎকার, বন্ধ হলো

গুঁড়িতে ঘুষি ও ধাক্কা-ধাক্কি। তা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য, তারপর এল দানবীয় এক হামলা, মড়াৎ করে ফেটে গেল তৃতীয় গুঁড়ি। ওটা আছে রানার বুকের উচ্চতায়।

ওই ফাটল দেখেই রানা বুঝল, এবার ওখানে চোখ পড়বে দানবের। ওরা ধারণাই ঠিক।

কয়েক সেকেণ্ড পর দুর্বল অংশ খুঁজে পেয়ে বিজয়ীর হুঙ্কার ছাড়ল দানব। গুঁড়ির ওপর এল ভয়ঙ্কর হামলা। তারপর একের পর এক শুরু হলো আরও আঘাত। প্রতিটি ধাক্কা খেয়ে আরও ফাটতে লাগল গুঁড়ি। ওটা ফেটে যাওয়ার শব্দের পর পর আসছে আদিম উল্লাস।

'তৈরি হয়ে নাও!' সতর্ক করল রানা।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে মড়াৎ করে মাঝ থেকে দু'টুকরো হলো তৃতীয় গুঁড়ি। নানাদিকে ছিটকে গেল ধুলো।

আঁধার থেকে ওদের দিকে চেয়ে আছে রক্ত-লাল দুই চোখ। বিজয়ের খুশিতে বেরিয়ে এসেছে বিরাট, সাদা দাঁত। বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসল। আর তখনই একইসঙ্গে গুলি করল রানারা। সুড়ঙ্গের ভিতরাংশ ভরে গেল আগুন-ধোঁয়ায়। পাথুরে দেয়ালে লেগে ছিটকে গেল কিছু গুলি।

বুলেটের আঘাতে হোঁচট খেয়ে পিছিয়ে গেল দানব, দেখল রানা। তারপর আর কিছুই দেখতে পেল না। আঁধারে গুলির পর গুলি করতে লাগল ওরা। কিছুক্ষণ পর বিপজ্জনক ভাবে অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠল অস্ত্রের ব্যারেল। প্রায় একই সময়ে গুলি বন্ধ করল ওরা।

প্রচণ্ড শব্দে ঝনঝন করছে কান। শ্বাস আটকে এল করডাইটের ঝাঁঝে। বাইরে থেকে এল ঝিরঝিরে শীতল হাওয়া, তাতে ভর করে খনির আরও ভিতরে সরে গেল ধোঁয়া। ভাঙা

গুঁড়ির জায়গাটা দিয়ে বাইরে চাইল রানা, কিন্তু আঁধার ছাড়া কিছুই দেখল না।

সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত সামনে বাড়ল ওরা, বদ্ধ জায়গায় গোলাগুলির কারণে প্রায় কালা। বারো ফুট সামনে বাড়বার পর হাত তুলে সবাইকে থামতে ইশারা করল রানা। নিজে সামনে বাড়ল কয়েক পা।

কমপক্ষে এক শ'টা গুলি বিঁধেছে ভাঙা, প্রকাণ্ড গুঁড়ির বুকে। প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে ওটা। স্বল্প সময়ে এত দ্রুত গুলি করা হয়েছে যে, গর্তগুলো থেকে এখনও বেরোচ্ছে ধূসর ধোঁয়া। আরও কয়েক পা বাড়ল কৌতূহলী রানা, তারপর থামল। ফাটল ধরা গুঁড়ি মাত্র দু'ফুট দূরে।

ওখানেই অপেক্ষা করল রানা, কান পেতে রইল। ওদিক থেকে কোনও আওয়াজ শুনল না। আরেক পা সামনে বাড়বে ভাবছে, এমন সময় পিছনে শুনল নেকড়ের ছুটন্ত পায়ের হালকা আওয়াজ। ঝট্ করে সামনে বেড়ে নেকড়েটাকে ঠেকাতে চাইল জিনা, কিন্তু ওকে পাশ কাটিয়ে ছুট দিয়েছে ওটা। 'না, হান্টার!' কঠোর নির্দেশ দিল রানা।

অদ্ভুত অস্বস্তিকর অনুভূতি। মাঞ্চুরিয়ায় এমনই হয়েছিল। আঁধারে মিশে পিছনে এসে হাজির হয়েছিল সাইবেরিয়ান বাঘ নিঃশব্দে, চমকে দিয়েছিল। ঝট্ করে ঘুরে চেয়েছিল।

ওই অনুভূতি চেনে রানা।

এবারও বিদ্যুদ্বেগে ঘুরল। কিন্তু এখন বাঘ নয়, শত্রু অন্য!

প্রচণ্ড এক গর্জন শুনল রানা।

ভেঙে যাওয়া গুঁড়ির মাঝ দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দানব! খপ্ করে ধরল রানার চামড়ার শার্টের কলার, প্রবল এক টানে ওকে নিয়ে যেতে চাইল দেয়ালের কাছে।

ছেঁচড়ে যাওয়ার সময় ঝট্ করে মোকাসিন পরা পা দেয়ালে

ঠেকিয়ে দিল রানা। তাতে মাত্র দুটো সেকেণ্ড নষ্ট হলো দানবের, ভয়ঙ্কর ধারালো নখরওয়ালা বাম হাতে বিদ্যুদ্বেগে ধরতে চাইল ওকে। দেখা গেল সাদা দাঁতের উপরে রক্ত-লাল দু'চোখ। রানাকে টেনে নিতে চাইল নিজের দিকে। কিন্তু ফড়-ফড় শব্দে ছিঁড়ছে চামড়ার শার্ট। দানবের আগুনের মত গরম শ্বাসের হলকা এসে পড়ছে রানার মুখে। বুঝে গেল, এই জানোয়ারের শক্তির কাছে ও নিজে কিছুই না।

ফোঁস-ফোঁস করে দম ফেলছে দানব। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য রানাকে খুন করা! রানার মুখের খুব কাছে হাজির হয়েছে কচি মুলোর মত দাঁতগুলো!

গায়ের জোরে পিছাতে চাইল রানা। তখনই ঝটকা মেরে মারলিন রাইফেল সরিয়ে দিল ওটা। ফড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল রানার শার্ট। একই সময়ে থাবা মেরে শত্রুর গলা ছিঁড়ে নিতে চাইল দানব। রাইফেল ফেলেই দু'হাতে তার বাহু চেপে ধরেছে রানা, বুঝল গণ্ডারের মত পুরু চামড়া ও মাংসে চেপে বসছে না ওর আঙুল।

খালি হাতে একে অপরকে কাছে টানতে শুরু করেছে ওরা। রানার মূল উদ্দেশ্য, নখরওয়ালা হাত নিজের গলা থেকে সরিয়ে রাখা। ঝটকা-ঝটকির মাঝে ডান হাতে রানার শার্ট চেপে ধরল দানব, পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে গুঁড়ির দেয়াল থেকে। তখনই রানার পা পিছলে গেল ধুলোয়। প্রায় বসে উড়ে চলল দেয়ালে আছড়ে পড়তে। বাম হাতে ঠেকাতে চাইল অগ্রসরমান গুঁড়ি। দেয়াল মাত্র দশ ইঞ্চি দূরে।

পিছিয়ে যেতে চাইছে প্রায় ঝুলন্ত, অসহায় রানা।

নিজের দিকে তুলে নিয়ে যেতে চাইছে ওকে দানবটা। মাঝে মাত্র কয়েকটা গাছের গুঁড়ি। রক্ত চোখে ওদিক থেকে চেয়ে আছে ওটা, এদিকে রানা– প্রায় মুখোমুখি দু'জন।

প্রাণপণে সরে যেতে চাইছে রানা দানবের ক্ষুরের মত দাঁত থেকে।

কয়েক পলকের জন্য বজায় রইল হাতাহাতি প্রতিযোগিতা। দানব টানছে নিজের দিকে। রানা চাইছে পিছিয়ে যেতে। দানবের বাহু শক্তভাবে ধরেছে ডান হাতে। এখন যদি হাত ফস্কে যায়... তখনই আরেকটা চিন্তা ঢুকল ওর মনে। চট্ করে একবার দেখল মুখের কাছে চলে এসেছে বাঁকা, ধারালো, ক্ষুরের মত কালো নখ। এবার...

আর তখনই নীচ থেকে ছিটকে এসে দেয়ালে বাড়ি খেল কী যেন, থরথর করে কাঁপল উপর থেকে নীচের প্রতিটি গুঁড়ি। প্রথমে বোঝা গেল না ওটা কী, পরক্ষণে ঝিলিক দিল করাতের মত এক সারি সাদা দাঁত। ভয়ঙ্কর ভাবে দু'পেয়ে দানবের ডান বাহু কামড়ে ধরেছে আরেক রোমশ দানব।

হতবাক রানা দেখল, দানবের বাহুর মাংসপেশি ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছে হান্টার! কালো বিদ্যুৎ যেন! পাগলের মত নানানদিকে ঝটকা মারছে, সেই সঙ্গে নিচু গর্জন। দেয়ালে দু'থাবা ঠেকিয়ে প্রচণ্ড জোরে পিছিয়ে যেতে চাইছে।

দানবের কাঁধ থেকে যেন ছিঁড়ে নেবে হাত। কয়েক মুহূর্তের জন্য মুখোমুখি হয়েছে দুই জানোয়ার। রাগে-ব্যথায় দাঁত খিঁচিয়ে ফেলেছে দানব। রক্ত-লাল চোখ চেয়ে রইল নেকড়ের বন্য, কালো চোখে।

রানা বুঝল না দুই জানোয়ারের ভিতর কে বেশি হিংস্র।

ছোরার মত নখওয়ালা বাম হাতে হান্টারের ঘাড় খামচে ধরতে চাইল দানব। এদিকে পিশাচটার টান ঠেকিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে অন্য হাত নীচে নিল রানা। তিন সেকেণ্ড পর দেখল, ঝিলিক দিয়ে উপর থেকে নীচে নামছে কী যেন! ঘ্যাচ্ করে গেঁথে গেল দানবের ডান বাহুর গভীরে। পরক্ষণে রানা দেখল, দানবের

আহত বাহুর ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল ঝকঝকে তলোয়ার! আবারও নেমে এল ক্ষুরধার জাপানি ফলা।

তখনই কোমর থেকে বাউয়ি ছোরা নিয়েই নীচ থেকে উপরে ঠেলে দিল রানা। দানবের বাহুর দু'হাড়ের মাঝ দিয়ে ভেদ করল পুরো দশ ইঞ্চি ফলা। ওটার লাল চোখে ভীষণ ব্যথার ছাপ দেখল রানা। বিন্দুমাত্র দয়া না করেই মুচড়ে দিল ফলা। ছিঁড়ে দিয়েছে হাড়ের মাঝের পেশি। বিকট এক আর্তচিৎকার ছেড়েই ঝট্‌ করে বাহু টেনে নিল দানব, নেকড়ের কামড় পাত্তা না দিয়েই ফাটল দিয়ে সড়াৎ করে নিয়ে গেল দুই হাত। পরক্ষণে ভীষণ ভয় নিয়ে উধাও হলো আঁধারে।

ওই একই সময়ে কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে শরীর গড়িয়ে দিয়েছে রানা, হাতে রক্তাক্ত ছোরা। গুঁড়ির দেয়ালের পাশে ওর মারলিন রাইফেল, সেদিকে খেয়াল নেই। ক্রল করে সরে গিয়ে হাঁপাতে লাগল। দরদর করে ঘামছে। বুঝে গেছে, আগে বিশ্রাম চাই।

লাল ওই চোখদুটো এখন মুখের কাছে নেই, এটাই স্বস্তির কথা। আপাতত হামলা করবে না কেউ।

পাশে পৌঁছে রানাকে পরীক্ষা করল জিনা। বলার কিছু নেই ওদের। ছেঁড়া শার্ট সরিয়ে কোথায় জখম, দেখল জিনা।

একরাশ কুয়াশার ভিতর শুনল রানা, 'গভীর ভাবে কেটে গেছে ঘাড়ে! আমার মেডিকেল কিট দাও!'

অ্যাড্রেনালিনের ফলে চোখের সামনে ধূসর মেঘ। কানে দপ-দপ করছে তপ্ত রক্ত। মগজে ভয়ঙ্কর গর্জন। আর বড্ড ক্লান্তি। চোখ বুজে চুপ করে বসে রইল রানা।

মেডিকেল কিট পেতেই ওটার ডালা খুলল জিনা, বের করল দরকারী ওষুধ, তুলো ও গজ ব্যাণ্ডেজ। কাজ শুরু করল সাবধানে। প্রথমে কোনও ব্যথা পেল না রানা, তারপর গভীর ক্ষত

অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে পরিষ্কার শুরু করতেই জ্বলতে লাগল ভীষণ।

'বেশি কেটেছে?' একটু পর মুখ কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

'ছুঁয়ে গেছে তোমার স্টারনাম,' বলল জিনা, 'এ ছাড়া চোট লেগেছে ডানদিকের দ্বিতীয় পাঁজরে। বড় ধমনী কাটা পড়েনি, কিন্তু ক্ষত গভীর। আশা করি সেরে যাবে। ঠিক আছে, এবার দেখব গলার ক্ষতটা। দানবটা হাত বাড়িয়ে দেয়ার আগেই সরে যেতে পেরেছিলে।'

চুপচাপ ক্ষত পরিষ্কার করে ওষুধ লাগাচ্ছে জিনা।

চট্ করে ঘুরে চাইল রানা। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে তানামুরা, হাতে ক্ষুরধার তলোয়ার। জাপানি যোদ্ধার পাশে গুঁড়ির দেয়াল থেকে দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওয়েইলার ও প্রেস্টন ওয়েস্ট। চেয়ে আছে ভাঙা গুঁড়ির দিকে। অস্ত্র হাতে তৈরি। পাথরের মূর্তির মত থম মেরে আছে হান্টার। কয়েক সেকেণ্ড পর পর নাক কুঁচকে শুঁকছে বাতাস। ওটার কালো মুখে চাইল রানা। চকচক করছে কালো চোখদুটো। আনমনে একবার মাথা নাড়ল রানা। হাত বাড়িয়ে দুলিয়ে দিল হান্টারের ঘাড়ের রক্তভেজা রোম। এইমাত্র নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ওকে রক্ষা করেছে নেকড়ে।

প্রকাণ্ড নেকড়ের চোখে চেয়ে বিড়বিড় করল রানা, 'তুই আমাকে রক্ষা করেছিস।'

কালো চোখ এখন শান্ত ও ভাবুক। গভীর মনোযোগে দেখছে বন্ধুকে।

চৌত্রিশ

শপিং মল থেকে বিয়ার কিনে তামার মস্ত এক ফোয়ারার পাশে বসে আছে টম জেরাল্ড। জায়গাটা পেনসিলভ্যানিয়া অ্যাভিন্যু-এ। আকাশ থমথমে কালো। নদীর দিক থেকে এসে ঝমঝম করে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। মন খারাপ ওর। আরও খারাপ লাগছে এই বিষণ্ন পরিবেশে।

কিছু কিছু ব্যাপার বুঝতে পেরেছে, সেগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে। আবার অনেক কিছু মোটেও বুঝতে পারেনি। গলা দিয়ে আধ চুমুক বিয়ার নামিয়ে আবারও ভাবতে লাগল।

ওকে বলা হয়েছে এনএসএ-র রিসার্চ স্টেশনের কাজ আর্কটিক সার্কেলে সাইসমিক অ্যাকটিভিটি মনিটর করা। কিন্তু বুঝতে পারছে, সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য দেয়া হয়েছে ওকে।

এক্ষেত্রে কী করা উচিত, এখনও ভেবে বের করেনি।

শত শত মানুষকে খুন করা হয়েছে।

কিন্তু কেন?

এর কোনও ব্যাখ্যা নেই।

ধ্বংস করা হয়েছে ফ্যাসিলিটিগুলো।

তারই বা কী কারণ?

হ্যাঙ্ক ডিগবাই যে গুজব শুনেছে, সেসব ঠিক।

বায়ো-টেক জিনিস নেয়া হয়েছে ওসব ফ্যাসিলিটিতে।

কী করতে কে জানে!

আর ওই হান্টিং পার্টি?

ওটার সঙ্গে রয়েছেন নামকরা এক প্রফেসর আর খ্যাতিমান এক অ্যাডভেঞ্চারার। খুঁজে বের করবে ভয়ঙ্কর এক জন্তুকে। ওটা নাকি বিধ্বস্ত করেছে ওসব রিসার্চ ফ্যাসিলিটি।

ওখানে আসলে কী হচ্ছিল?

আন্দাজ করলে মনে হয়, গবেষণা হচ্ছিল বায়োলজিকাল- বা জার্ম ওঅরফেয়ারের ওপর।

কিন্তু যে জন্তু এত মানুষ খুন করল, সেটা এল কোথা থেকে?

কী ওটা?

এ এক বড় রহস্য।

আরেকটা রহস্য হচ্ছে, কেন ওই মিশনে গুরুত্বপূর্ণ নয় মাসুদ রানা?

জেরাল্ড বুঝে গেছে, প্রথম থেকেই সিআইএ চায়নি হান্টিং পার্টি করা হোক। কিন্তু অন্যদের চাপে রাজি হয়েছে। আর সে কারণেই সম্ভবত প্রথম থেকেই গোপনে স্যাবোটাজ করছে তারা।

তা হলে প্রথম থেকে ভাবলে কী দাঁড়ায়?

সিআইএ রক্ষা করতে চাইছে জন্তুটাকে?

তখনই আরেকটা চিন্তা এল মনে। আনমনে মাথা নাড়ল জেরাল্ড। না, ওরা নিশ্চয়ই ওই কাজ করেনি। এত বোকার কাজ করবে না। নাকি...

ওসব ফ্যাসিলিটি চালু করেছিল ওই জানোয়ারটাকে তৈরি করতে?

'প্রায় কিছুই জানি না,' চোখ বুজে বিড়বিড় করল জেরাল্ড।

সত্যিই যদি কোনও ভালুককে জেনেটিকালি বদলে থাকে তারা... আর গবেষণার এক পর্যায়ে মস্ত কোনও ভুলে... ফলে খুন হতে শুরু করেছে সৈনিক ও বিজ্ঞানীরা।

স্বাভাবিক কারণেই সিআইএ চাইবে, তাদের গবেষণার ফলে

যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তা নিয়ে যেন কেউ তদন্ত করতে না পারে।

নানান যুক্তি ব্যবহার করে ভাবছে টম জেরাল্ড। আধঘণ্টা পর আরেক চুমুক বিয়ার পাঠাল পেটে। মৃদু হাসল। তদন্ত শেষ না করে যদি গলা-ছেলা শকুন ফ্র্যাঙ্ক করেলির সামনে গিয়ে বলত, 'আসলে, বস্, আলাস্কায় আছে একটা মিউটেটেড জানোয়ার, ওটা কামড়া-কামড়ি করা কুকুরের চেয়েও বন্য, ওটাই খুন করছে সব মানুষ। ...না, আমার কাছে কোনও প্রমাণ নেই। ...এ ছাড়া জীবাণু দিয়ে যুদ্ধ জিতে যাওয়ার জন্যে... না, স্যর, ওটার বিষয়েও কোনও প্রমাণ দেখাতে পারব না। কিন্তু...

অফিস থেকে ছুঁড়ে ফেলবে বুড়ো ওকে। তারপর কামড়ে ধরবে ওর পাছা। বের করে দেবে সার্ভিস থেকে।

ওদিকে আবার ভয়ও আছে খুন হয়ে যাওয়ার।

অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা পড়েনি ডক্টর নিনা সয়্যার।

ওটা যে খুন, তাতে কোনও সন্দেহই নেই।

অবশ্য, প্রমাণ করতে পারবে না। ভাড়া গাড়ি জাঙ্কইয়ার্ডে ফেলে দেয়ার পর যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছে জেরাল্ড। বুঝে গেছে যা বুঝবার। খুব সাবধানে রাঁদা দিয়ে কেটে রাখা হয়েছিল ওই গাড়ির বামদিকের স্ট্রাট। সুতোর মত একটা অংশ আটকে রেখেছিল ওদিকের চাকা। পাহাড়ি ঢালু পথে নেমে যাওয়ার সময় গাড়ির পুরো ওজন পড়েছে ওখানে। আর তখন স্ট্রাট ভেঙে গেলে মরণ ছাড়া উপায় ছিল না। শৈল্পিক ভাবে সারা হয়েছে কাজ।

চট্ করে চারপাশ দেখে নিল জেরাল্ড। অলস ভঙ্গি নিয়েছে। বাস্তবে হয়ে উঠেছে দ্বিগুণ সতর্ক।

পিছনে গোপন খুনি... বেআইনী বায়োলজিকাল ওঅরফেয়ার... মনের আনন্দে মানুষ খুন করে বেড়ানো মিউটেটেড এক জন্তু... তার পিছনে হিট টিম বা হান্টিং পার্টি...

না, ভাল লাগার কিছুই নেই। মাথা নাড়ল জেরাল্ড।

কে জানত এমন হবে পরিস্থিতি?

এখন চাই নিখুঁত পরিকল্পনা। মনে মনে প্রতিটি তথ্য বা খবর বাছাই করছে সে। নতুন তথ্য পেতে মাঠে নামলে তাতে কী ধরনের ঝুঁকি– তাও ভাবছে।

প্রথমে আবিষ্কার করতে হবে ওসব রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে কী ঘটছে। তা যদি জানতে পারে, তদন্তের জন্য পাবে রসদ। কিন্তু ওই রসদ জোগাড় করতে হলে খুব গোপনে কাজে নামতে হবে। আর তা হবে সম্ভবত বেআইনী কর্মকাণ্ড।

টম ভাবল সেসব মানুষের কথা, যারা অন্যায় না করেই মারা গেছে রিসার্চ ফ্যাসিলিটিগুলোয়। কেউ সৈনিক, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ সহকারী। তারা কারও বাবা, কারও স্বামী, কারও সন্তান। নিজেও জেরাল্ড প্রাক্তন মেরিন। এ কারণে সৈনিকদের মৃত্যু মানতে পারছে না। বার-বার দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যাচ্ছে ওর চোয়াল।

না, এত সহজে হাল ছাড়বে না ও।

দেখে ছাড়বে এসবের শেষ।

সচেতন হলো মোবাইল ফোনের রিংটোন শুনে। কুঁচকে গেল ভুরু। অফিস থেকে কারও যোগাযোগ করবার কথা নয়। মোবাইল ফোন বের করে স্ক্রিন দেখল জেরাল্ড। বুঝে গেল, যে কল করেছে, সে ইমার্জেন্সি না হলে বিরক্ত করত না। কলার সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের ল্যাবোরেটরি সহকারী টিপা মুই।

প্যান্টের পকেটে ফোন রেখে উঠে দাঁড়াল টম জেরাল্ড, দেরি না করে শপিং মল থেকে বেরিয়ে এল ঝমঝম বৃষ্টির ভিতর।

পঁয়ত্রিশ

গহীন অরণ্যের ঘন আঁধারে লতাপাতা ঢাকা মেঝেতে ধুপ্ করে পড়ে গেল সে। বাম হাতে চেপে ধরেছে মারাত্মক আহত ডান বাহু। ওই নেকড়ের মালিক যে শুধু ছোরা মেরেই থেমেছে, তা নয়, আচ্ছা মত ঘুরিয়ে দিয়েছে ছোরার ফলা। মাংসপেশিতে তৈরি হয়েছে বীভৎস ক্ষত। কাটা পড়েছে শিরা, ধমনী। চেঁছে তুলে নিয়েছে হাড়ের অংশ।

লোকটা খুবই কাছে ছিল।

রাগ আর ঘৃণায় ফোঁস-ফোঁস করে দম ফেলতে লাগল সে। জীবনে প্রথমবারের মত এভাবে ভয়ঙ্কর ভাবে আহত হয়েছে। আগে কখনও ভাবেনি এত ব্যথা লাগবে। মেয়েটার হাতের আগুন ঝরানো অস্ত্রে এত যন্ত্রণা হয়নি। কিন্তু এখন অসহ্য কষ্ট। বুঝতে পারছে না কী করে এমন হলো। কয়েক সেকেণ্ড পর মন বলল, ওই দাঁত বা ছোরা, ওগুলো সত্যিকারের বিপজ্জনক জিনিস।

খুব ব্যথা দিয়েছে ওই নেকড়েটাও।

বুলেটের কামড়ের চেয়ে অনেক বেশি ব্যথা দিয়েছে ওটার দাঁত। ভারী ওজন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নেকড়ে, ছিঁড়ে নিতে চেয়েছিল বাহু ও কাঁধের মাংস। এত ঝাঁকি দিয়েছে, অবশ হয়ে গেছে কাঁধ। তবে ওই তলোয়ারটা কিছুই ছিল না দাঁত বা ছোরার কাছে। বাহুর রক্তাক্ত ক্ষত টনটন করছে ব্যথায়। ওই লোক আর ওর নেকড়েটা এসেছে স্রেফ নরক থেকে।

হ্যাঁ, এজন্য মরতে হবে ওদের সবাইকে। ছাড়বে না

কাউকে। দরকার পড়লে তাড়া করে নিয়ে যাবে পৃথিবীর শেষ মাথায়। খতম করবে, ছাড়বে না।

একবার ভাইদের জড় করতে পারলে, দল বেঁধে খুন করবে মানুষগুলোকে। চিবিয়ে খাবে তাদের মগজ। হোলি খেলবে রক্ত দিয়ে। সেই আগের মত জঙ্গলে-উপত্যকায় চাঁদের আলোছায়ায় দল বেঁধে মানুষের পাল খুঁজে খুঁজে খুন করবে। হাড় ভাঙবে আগের মত, চুষে নেবে ভিতরের সুস্বাদু কালো তরল শাঁস।

উঠে দাঁড়াতে গেল, যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে, এবার গিয়ে খুন করবে ওই বদমাসগুলোকে। কিন্তু...

ধড়মড় করে পড়ে গেল আবারও।

গভীর ভাবে দম নিতে লাগল। থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর।

গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখল কালো আকাশে লালচে চাঁদ।

অতীত ভাবতে চাইছে না সে। আগে কী ছিল, তা দূর হোক মন থেকে। আসল কথা, কী হয়ে উঠেছে। খুশি যে খুন করতে পারছে। সব কিছুর চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ খুন করতে পারলে!

আবছা ভাবে মনে পড়ল বহু দিন আগের কথা। কী যেন ছিল সেই সময়ের আঁধারে। মনে পড়ছে না ভাল করে। চলছিল চিৎকার... ঘেউ ঘেউ... গর্জন... মানুষ... রক্ত... লাশ... প্রকৃতির বুকে সে ছিল সত্যিকারের দেবতা... খুশি ছিল... হামলা করত... তারপর আবারও খুন... দুর্বলের স্থান নেই পৃথিবীতে... মানুষগুলো ছিল আসলে সামান্য শিকার...

ফিনকি দিয়ে পড়ত তাদের রক্ত। রক্ত আর রক্ত।

আর মনে করতে পারল না সে।

লাল চাঁদ...

বুজে এল তার চোখ।

ছত্রিশ

খনিতে বিশ্রামের সময় সবার মনে বিরাজ করছে নীরব আতঙ্ক। অতি উত্তেজিত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে বসেছেন প্রফেসর সিরাজউদ্দীন। বার-বার পরীক্ষা করছে জিনা তাঁর ব্লাড প্রেশার, হৃৎস্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাস। কীসের যেন ইনজেকশন দিয়েছে, যাতে ঘুমিয়ে থাকেন মানুষটা। তারপর এসে বসেছে রানার পাশে।

থম মেরে বসে আছে রানা। চুপ করে দেখছে মেগেলান স্যাটালাইট ফোন কেস। জিনিসটা সাধারণ ল্যাণ্ড ফোনের চেয়ে ছোট। মেগেলান স্যাটালাইটের মাধ্যমে চলে আর্মির দেয়া ফোন। দরকার পড়লে দেখা যায় আবহাওয়া, পৃথিবীর পরিবেশ, কোথায় রয়েছে সৈনিকরা। দুনিয়ার যে-কোনও জায়গায় ওটার মাধ্যমে পাঠানো যায় সিগনাল। এখন নষ্ট। খুব আধুনিক জিনিস দেয়া হয়নি ওদেরকে। ওটার চেয়ে অনেক আধুনিক ওদের স্যাটালাইট মোবাইল ফোন। কিন্তু যে কারণেই হোক, কোনও সিগনাল নেই।

আর সিগনাল নেই বলেই অত্যন্ত চিন্তিত রানা।

গভীর মনোযোগে দেখছে আর্মির ফোন। চট্ করে একবার মুখ তুলে চাইল তানামুরার দিকে। প্রফেসরের কটের কাছের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে সে। আরেক দিকে ওয়েইলার। গত এক ঘণ্টায় একবারও নড়েনি। হাঁটুর উপর রেখেছে শটগান। রানা নিশ্চিত নয় ঘুমিয়ে আছে সে, না জেগে। ছায়ায় দেখা গেল

না তার পোড়া মুখ।
রানার কানে ফিসফিস করল জিনা, 'রানা?'
'হুঁ?'
'আমরা যদি এখান থেকে চলে যেতে পারতাম বহু দূরে?'
পাশাপাশি বসে আছে ওরা। একবার জিনাকে দেখল রানা। চোখ বুজে আছে মেয়েটা। লণ্ঠনের হলদে আগুনে দারুণ সুন্দর লাগছে ওকে। মাথা একটু ঝুঁকে আছে বুকের কাছে। জীভ মনে হলো। দলের অন্যদের মতই ঘুমাতে পারবে না। হাতের কাছে ব্যারেট রাইফেল। ওরই কারণে এখনও বেঁচে আছে অন্যরা, বিশেষ করে প্রফেসর। জিনা সেবা না করলে অনেক আগেই মারা যেতেন। অদ্ভুত এক মেয়ে। যেমন লড়াকু, তেমনি দক্ষ নার্স। দায়িত্ব এড়ায় না। আপাতত বিশ্রামের সুযোগ পেয়েছে।
'কোথায় যেতে?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা।
'জানি না। কিছু এমন কোথাও, যেখানে রক্ত, খুন, লোভ, লালসা এসব নেই।'
'কেউ বিরক্ত করবে না? ধরো ভাসছ মস্ত এক নদীতে?' মৃদু হাসল রানা।
'কী নাম সে নদীর?'
'নীল জলের যমুনা। যে নদীর আকাশে ওঠে মস্ত এক সাদা, গোল চাঁদ? চপল ঢেউ ছল-ছলাৎ শব্দ তোলে তোমার নৌকার পাশে?'
'একা?'
'না, পাশে প্রিয় মানুষটাও।'
'কখনও তেমন কেউ ছিল না।'
'তা হলে পরে হবে। রাজার মত আসবে কেউ।'
'ভাবতে খারাপ লাগছে না,' হাসল জিনা। 'বলো।'
'তুমি হবে তার রানি। ভাল মেয়েদের জন্যে উপযুক্ত লোকের

অভাব হয় না।'

'আর তুমিও খুঁজবে তোমার রানিকে?' চোখ মেলে রানাকে দেখল জিনা।

'রানি? আমার? ...জানি না... আমি বোধহয় কারও উপযুক্ত নই।' বুক চিরে আসা কষ্টের শ্বাস চেপে গেল রানা।

'তুমি ভাল মানুষ, রানা।' নড়েচড়ে বসল জিনা। 'এর বেশি কিছু চায় না মেয়েরা। আমি হলেও এর বেশি কিছু চাইতাম না তোমার কাছে।'

প্রথমবারের মত রানা টের পেল, কত কাছে জিনা। কখন যেন মাথা রেখেছে ওর কাঁধে।

'তোমার মত কাউকে আগে দেখিনি, রানা,' বলল জিনা। 'দেখিনি বা এমন কারও কথা শুনিওনি। অনেক কিছু দেখো। বুঝতে পারো অনেক কিছু।' চুপ হয়ে গিয়েও একটু পর বলল, 'তুমি বড় একা। আর একা বলেই কি এত কিছু খেয়াল করো?'

'কী জানি! আসলে বুদ্ধি নষ্ট লোক বোধহয়।' হাসল রানা।

'ঠাট্টা করছ?'

'না। সত্যি।'

'তুমি ওই পাগল নেকড়ের মতই একা।'

মৃদু হাসল রানা। 'ও সত্যিই পাগল। আমার কাছ থেকে সংক্রমণ হয়েছে হয়তো।'

'শুধু ওকে বিশ্বাস করো, আর কাউকে নয়?'

'না, তা নয়,' মাথা নাড়ল রানা। 'আরও কিছু বন্ধু আছে।'

'যেমন প্রফেসর?'

'হ্যাঁ,' চট্ করে সিরাজউদ্দীনকে দেখল রানা। 'আমি ওঁকে বিশ্বাস করি। তাঁর এক বন্ধু আছেন, তাঁকেও বিশ্বাস করি আর ভালবাসি।'

'নাম কি তাঁর?'

'মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান।'
'তোমার বাবা?'
'বাবার মতই। গুরু।'
'তা হলে তাঁকে শ্রদ্ধা করা উচিত আমার।'
নীরবতা নামল দু'জনের মাঝে।
চুপ করে হাঁটারকে দেখছে জিনা। বসে বসে কালো চোখে গুঁড়ির দেয়ালের ভাঙা অংশে দেখছে মস্ত নেকড়ে।
'তোমাকে ভালবাসে ও,' একটু পর বলল জিনা, 'পাহারা দিচ্ছে তোমাকে।'
'আমারও তা-ই ধারণা।'
'ওই নেকড়ে আর তুমি, তোমাদের মাঝে অনেক মিল। ভালবাসো একা থাকতে। কিন্তু কেউ বিপদে পড়লে হাজির হও তার পাশে।' একটু পর বলল জিনা, 'আমি যদি তোমার মত হতে পারতাম!'
জিনাকে বাচ্চা মেয়ের মত দেখাচ্ছে, ভাবল রানা।
গভীর চোখে ওকে দেখছে জিনা। অস্ফুট সুরে বলল, 'চিরকাল একা থাকতে চাইবে তুমি?'
জবাব দিল না রানা। চুপ করে কী যেন ভাবছে।
'বললে না যে?' নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল জিনা।
'না, এক সময় একা থাকতে পারব না,' স্বীকার করল রানা। দেখল মিষ্টি করে হাসল জিনা। 'তখন হয়তো চাইব নিজের একটা পরিবার হোক। হয়তো... জানি না...' মিলিয়ে গেল ওর কণ্ঠ।
'তুমি বাচ্চাদের ভালবাসো,' নিশ্চিত সুরে বলল জিনা। 'ওরাও তা বোঝে। গ্যারান্টি দিতে পারি, তুমি ভাল বাবা হবে।'
'সহজে আমাকে সহ্য করতে পারবে না কোনও মেয়ে।'
'কেন?'

'জানি না।'

'তুমি ভালবাসো ঘুরে বেড়াতে। বাধা দেবে না সে মেয়ে। তবে বাচ্চাদের নিয়ে জুটে পড়বে তোমার সঙ্গে।' হাসল জিনা। 'আমার মনে হয় না তোমারও আপত্তি থাকবে।' কিছুক্ষণ বিরতির পর বলল, 'বোধহয় তোমাকে ভালবাসে তোমার দেশের অপূর্ব সুন্দরী কোনও মেয়ে। সে অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

'তাই?' সোহানার কথা মনে পড়ল রানার।

'হ্যাঁ। অপেক্ষা করবে আরও অনেক মেয়ে। জীবন সঙ্গী হিসেবে ওরা পাবে না তোমাকে। তবুও ভাববে তোমার কথা।'

'আচ্ছা?'

'হ্যাঁ,' মৃদু হাসল জিনা, 'পেপারে পড়েছি, চার বছরের এক বাচ্চাকে জঙ্গল থেকে ফিরিয়ে এনেছিলে কিছু দিন আগে। বাধ্য না হলে কাউকে আঘাত করতে চাও না। নিজে কষ্ট পাও [illegible] কষ্ট পেলে। আর এ কারণেই জঙ্গলে মস্ত সব বিপদ দেখেও হারিয়ে যাওয়া মানুষকে খুঁজতে যাও। আসলে খুব নরম তোমার অন্তর। অন্তর নরম হওয়া খারাপ নয়।' আবারও রানার কাঁধে মাথা রাখল। একটু আগে বলা নিজের কথা মনে এল ওর। 'অপেক্ষা করবে আরও অনেক মেয়ে। জীবন সঙ্গী হিসেবে পাবে না তোমাকে। তবুও ভাববে তোমার কথা।' মনে মনে নিজেকে বলল জিনা, 'রানা, জানবে না, আমিও তাদের একজন। খুব... খুব ভাল লেগেছে ওকে আমার।'

নীরবে কেটে গেল কিছুক্ষণ, তারপর বলল জিনা, 'রানা, তোমার কি মনে হয়, শেষ পর্যন্ত এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারব আমরা?'

ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে না আর্মি, ভাবল রানা। পিছু নিয়েছে এক খুনি দানব। ছোট ক্যালিবারের অস্ত্র তাকে ঠেকাতে পারবে না। কেউ জানে না ঠিক কোথায় আছে ওরা ক'জন। বয়ে

নিয়ে যেতে হবে অসুস্থ প্রফেসরকে। তাঁকে এখানে ফেলে যাওয়ার কথা ভাববে না পশু ছাড়া কেউ। মাত্র একটা রাইফেল ব্যথা দেবে দানবটাকে। আসলে ওরা যেন গণ্ডার মারতে নেমেছে গুলতি হাতে। দানবটাকে এখন পর্যন্ত ট্র্যাক করেছে ও, তাতে বিশেষ লাভও হয়নি। যখন তখন আসবে পরের হামলা। বাঁচবার নিশ্চয়তা নেই কারও।

'আমরা লড়ব, যতক্ষণ পারি,' মিথ্যা বলল না রানা। আবার ওর চোখ গেল মেগেলান ফোন স্যাটালাইট সিস্টেমের উপর। আগেও ব্যবহার করেছে এই জিনিস। অনেকক্ষণ ধরে খচ-খচ করছে ওর মন। যন্ত্রটা ভাল করে পরীক্ষা করা উচিত। যথেষ্ট আধুনিক কমিউনিকেশন ইন্সট্রুমেন্ট। কিন্তু প্রায় শুরু থেকেই বিকল। এটা অস্বাভাবিক।

চোখ সরু হয়ে গেল রানার। বেল্টের পাশে ঝুলন্ত গার্বার অল পারপাস পকেট টুল পাউচ খুলে নিল। হাত নড়ছে না বললেই চলে। মনোযোগ চাইছে না কারও। ঝুঁকে গেল স্যাটালাইট সিস্টেমের ওপর।

অন্ধকারে শুনল তানামুরার কণ্ঠ, 'কী করছেন, রানা? ওটা নষ্ট। মেরামতের চেষ্টা করেছিল প্রেস্টন ওয়েস্ট। কাজ হয়নি।'

'জানি,' বলল রানা। কেস খুলে বের করল সিস্টেম। জিনিসটা পোর্টেবল ল্যাপটপ, পাশে ছোট ফোন। ডালা খুলতেই সবুজ আলো নিয়ে জেগে উঠেছে স্ক্রিন। মনিটর অফ করে যন্ত্রটা খাড়া করে ধরল রানা, খুলতে লাগল পিছনের কালো প্লেটের স্ক্রু।

'কী করছেন, রানা?' আবারও জানতে চাইল তানামুরা।

'নিজে একবার দেখব ওটার কী হয়েছে,' বলল রানা।

কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এল মেশিনের নাড়ি-ভুঁড়ি।

'প্রেস্টন মেরামত করতে চেয়েছে,' বলল তানামুরা। 'পরে আমিও। কোনও কাজ হয়নি।'

একটু বিরক্ত হলো রানা, বলল না কিছু। দেখতে শুরু করেছে ভিতরের যন্ত্রপাতি। পাউচ থেকে চুরুট আকৃতির ছোট ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে আলো ফেলল স্যাটালাইট রেডিয়োর স্কেম্যাটিকে। 'প্রেস্টন না পারলে আমারও নিশ্চয়ই পারার কথা নয়,' মনে মনে বলল।

প্রথমে পরীক্ষা করতে চাইল ট্র্যান্সমিটিং প্যানেল। সোল্ডার জয়েন্টে একের পর এক অ্যালিউমিনিয়ামের তার। এক এক করে পরখ করতে গিয়ে থামল প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডের উপর।

'কোনও গোলমাল?' মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কৌতূহলী তানামুরা।

'এখনও না,' আনমনে বলল রানা।

'আগে খুলেছেন এসব জিনিস?'

'কখনও কখনও।' বিসিআই-এর ইলেকট্রনিক্স এক্সপার্ট গোলাম মুর্তজা হোসেনের পাল্লায় পড়ে এসব জিনিসে প্রাথমিক ধারণা নিতে হয়েছে প্রত্যেক এজেন্টকে। মাফ পায়নি ও-ও।

রানার পাশে বসে মন দিয়ে কাজ দেখছে জিনা। 'এসব শিখলে কী করে, রানা?' নিচু স্বরে বলেছে, অন্য কেউ শুনবে না।

'বাঁচার তাগিদে,' বলল রানা, 'যাতে করে-কম্মে খেতে পারি।'

মুচকি হাসল জিনা। যার কোটি কোটি টাকা, সে এসব বললে না হেসে উপায় থাকে না।

জিনা জানে না, বিসিআই-এর বেতন ছাড়া অন্যান্য উপার্জন ছুঁয়েও দেখে না রানা। সেসব কখনও ব্যয় হয় বিসিআই-এর দুস্থ কর্মচারী বা অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার কাজে, কখনও বা বড় কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায়।

চোখ সরু করে সার্কিট দেখছে রানা। একেকবারে আধ ইঞ্চির বেশি নড়ছে না আঙুল। পেরিয়ে গেল অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ স্থির হলো ওর আঙুল। সরু হয়ে গেছে চোখ।

রানার পরিবর্তন খেয়াল করেছে তানামুরা, এগিয়ে এল কয়েক পা। 'কিছু পেলেন?'

'এখনও না,' বলল রানা। কোমর থেকে খুলে নিল পকেট নাইফ। ফলা বের করে সাবধানে ছুঁয়ে দিল সার্কিট বোর্ড। সামান্য তুলল খুব ছোট এক অ্যালিউমিনিয়ামের তার। ওটা চুলের মত সরু। বাঁকা হয়ে গেছে ফলা লেগে। আবারও ওটা সঠিক জায়গায় বসিয়ে দিল রানা। ঠোঁটে দেখা দিয়েই হারিয়ে গেল সামান্য তিক্ত হাসি।

'আপনি কিছু পেয়েছেন,' এগিয়ে এল তানামুরা।

'হ্যাঁ।'

'রেডিয়ো মেরামত হবে?'

সার্কিট বোর্ড থেকে চোখ সরাল না রানা, মনে হলো অনেক দূর থেকে এল ওর কণ্ঠ: 'খুলে গেছে ভয়েস রিসিভারের চিপের তার।'

মেশিন থেকে সরিয়ে ফেলল সার্কিট প্যানেল। ভাল করে দেখল ফ্ল্যাশলাইটের আলোয়। 'হ্যাঁ। কেটে দেয়া হয়েছে।'

'কী করে কাটল? কে কাটবে?' দু'হাত মুঠো করে ফেলল তানামুরা।

'জানার উপায় নেই,' বলল রানা। 'তবে কাটা যে হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এতই সরু তার, চট্ করে বোঝা যায় না বিচ্ছিন্ন করেছে।'

ওর কথা শেষ হতে সুড়ঙ্গে নামল থমথমে নীরবতা।

রানা খেয়াল করল, একদম নড়েনি ওয়েইলার। কোনও কথাও বলল না। রেডিয়োর সামনে এসে থেমে গেছে তানামুরা, চোখে আগুন। বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করবে না জাপানি। রানা ছিল ট্র্যাক নিয়ে ব্যস্ত। দলের দ্বিতীয় নেতা হিসাবে তানামুরার দায়িত্ব ছিল সব সামলে চলা। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল সে, শীতল আগুন

চোখে জেলে দেখল ওয়েইলার ও প্রেস্টনকে। এক পলক বেশি দেখল প্রেস্টন ওয়েস্টকে।

ঝট করে শটগান তুলে প্রেস্টনের বুকে তাক করল ওয়েইলার। কঠোর হয়ে গেছে চেহারা। 'ওয়েরের বাচ্চা...'

নিজের অস্ত্রের নল ব্রিটিশ লোকটার মাথা লক্ষ্য করে তুলল তানামুরা। ট্রিগারে চাপ দেয়াটুকুই বাকি।

প্রেস্টনের হাতও সরছে তার অস্ত্রের দিকে।

'দাঁড়াও!' গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দিল রানা। 'ঝোঁকের বশে কেউ কিছু করতে যেয়ো না!'

'এই লোক আমাদের সবাইকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছে,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল তানামুরা। 'এর বাঁচার অধিকার নেই!'

'কার আছে, আর কার নেই, তা তুমি ঠিক করবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। মাথা নাড়ছে।

'না... লিডার অবশ্য আপনি। কিন্তু...'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো।' তিনজনকেই ঠাণ্ডা গলায় ধমক দিল রানা। 'নিজেদের ভেতরে বিভেদ তৈরি কোরো না। মিথ্যা সন্দেহ করা পাপ। আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছি। এখনও করছি।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি জানেন কাজটা করেনি?' প্রশ্ন তানামুরার।

'হ্যাঁ, জানি। হানড্রেড পারসেন্ট শিওর। কী মনে করো? নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ও এখানে খেলা করতে এসেছে? বাইরের ওই জানোয়ারটা ওর খালাতো ভাই হয়? জেনে রাখো, আর কেউ করেছে কাজটা। যদি জানত কেউ এটা নষ্ট করতে চায়, তা হলে কিছুতেই এখানে আসত না প্রেস্টন। এক কোটি ডলার দিলেও না।'

'কিন্তু...' তর্ক জুড়তে চাইল ওয়েইলার।

'কথাটা ঠিক,' রানার যুক্তি বুঝে গেছে তানামুরা। 'দানবের বিরুদ্ধে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পড়তে চাইত না।' অস্ত্রটা নামিয়ে ফেলল সে। 'আমি দুঃখিত, প্রেস্টন। তবে পরে আরও কথা হবে।'

রানার দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসতে গিয়ে হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢাকল পোড় খাওয়া সোলজার।

শটগান পাশে রেখে উদাস হয়ে অন্যদিকে চাইল ওয়েইলার।

অল্পক্ষণেই সামলে নিল প্রেস্টন, নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ তুলে সরে বসল। তিক্ত সুরে বলল, 'শুয়োরের বাচ্চারা এমন ভাবে কেটে রেখেছে তার, বোঝারই উপায় নেই! আগে দু'-একবার কাজও করেছে এটা আপনাদের সামনেই।'

রানার দিকে ফিরে জানতে চাইল তানামুরা, 'রানা, আপনি কি রেডিয়ো মেরামত করতে পারবেন?'

'আমিও ঠিক করতে পারতাম, যদি দরকারী জিনিসপত্র থাকত,' বলল প্রেস্টন।

ব্রিটিশের দিক থেকে চোখ সরিয়ে আবারও সার্কিটে মন দিল রানা। সরু তার, ফ্ল্যাশলাইটের আলো তাক না করলে বোঝাই যাচ্ছে না কেটে দেয়া হয়েছে। গভীর মনোযোগে জায়গাটা দেখল। ভাবতে শুরু করেছে, কীভাবে ঝালাই করবে। মনে করতে চাইল, কত তাপে গলবে অ্যালিউমিনিয়াম। মনে পড়ল, অল্প আঁচেই কাজ হবার কথা। তাপমাত্রা চাই বড়জোর এক হাজার ডিগ্রি।

আগে চাই ওই তাপ, ভাবছে রানা। হাতে কিছুই নেই যে কাজ শুরু করবে। লণ্ঠনের হলদে আলোয় চারপাশে চাইল। রেডিয়ো মেরামত করতে চাইলে লাগবে দরকারী কিছু জিনিস। মেডিকেল কিটের উপর স্থির হলো ওর চোখ। নিচু স্বরে জিনাকে বলল, 'তোমার জাদুর বাক্সয় অ্যালকোহল আছে?'

'আছে,' রানার চোখে চাইল জিনা। 'লাগবে?'

'হ্যাঁ, দাও। অ্যামোনিয়া আছে?'

'র‍্যাশ হলে লাগবে, তাই রাখা হয় কিটে। অ্যান্টিসেপটিক।'

'ওটাও দাও।'

দুই বোতল নিয়ে মেঝেতে রাখল রানা, দেয়াল থেকে নামিয়ে নিল জ্বলন্ত লণ্ঠন। সরিয়ে ফেলল কাঁচের চিমনি, বাড়িয়ে নিল সলতের জ্বলজ্বলে আগুন। সরিয়ে নিল অ্যালকোহলের ধাতব বোতলের ক্যাপ। ভিতরে ঢালল খানিকটা সাদা তরল। অন্য বোতল থেকে মেশাল সামান্য অ্যামোনিয়া। সাবধানে ক্যাপ ধরল আগুনের শিখার ডগায়। ওখানেই বেশি থাকে তাপ।

'একটু তুলো দাও,' নিচু স্বরে বলল রানা জিনাকে।

বাউয়ি ছোরা বের করে সতর্ক হাতে ধরেছে আগুনে। কিছুক্ষণ পর টকটকে লাল হলো ছোরার ডগা। ওদিকে আগুনের তাপে ক্যাপের দুই তরল মিশে তুলছে বুদ্বুদ। শান্ত স্বরে বলল রানা, 'এবার, জিনা, ক্যাপে চুবিয়ে নেবে তুলো। ওখান থেকে তুলবে জেলের মত জিনিসটা। তরল দরকার নেই।'

নিষ্কম্প হাতে কাজটা করল জিনা। তুলো ব্যবহার করে ক্যাপ থেকে তুলে নিল জেল।

রানা দেখল, চকচক করছে জেল।

ওটা আগুনে ধরলে কাজ হবে।

স্ট্র্যাপ থেকে রানা নিল ৪৫.৭০ ক্যালিবারের বুলেট, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে খালি করল গান পাউডার। রেখেছে ছোট্ট কাঠের এক টুকরোর উপর। জিনার দিকে না চেয়েই বলল, 'তুলো দাও।'

জিনা তুলো দিতেই থকথকে, স্বচ্ছ জেলে হালকা ভাবে গান পাউডার মাখিয়ে নিল রানা। ঝুঁকে গেল মনিটরে, মনোযোগ দিয়েছে কাটা অ্যালিউমিনিয়ামের তারে।

এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে কাজ সারতে হবে। নইলে প্রচণ্ড তাপে গলে যাবে প্লাস্টিকের সার্কিট।

'আলো তাক করো আমার হাতে,' প্রায় ফিসফিস করল রানা। খুব ধীরে সার্কিটের দিকে নামছে ওর ছোরার ডগা। ছোরার ডগায় রাখা গান পাউডার মাখা জেল আগুনে ছুঁইয়ে দিতেই বিদ্যুৎ-শিখার মত সাদা আলোর ঝিলিকে চমকে গেল সবাই। আলতো করে একবার তার ও সার্কিট ছুঁয়ে দিয়েছে রানার ছোরা।

গভীর মনোযোগে ওই তার ও সার্কিট দেখল রানা।

হ্যাঁ, কাজ হয়েছে।

বড় করে দম নিয়ে আস্তে করে পিছিয়ে এল। ছোরা সরিয়ে ডান হাতে কপাল থেকে মুছল ঘাম। কারও দিকে না চেয়েই বলল, 'এবার ঠাণ্ডা হতে সময় দেব। আশা করি কাজ হবে।'

নীরবে নড করল তানামুরা। একই সঙ্গে খুশি এবং বিরক্ত। একবার রানাকে দেখে নিয়ে বলল প্রেস্টনকে, 'ওয়েস্ট, তুমি কমিউনিকেশন্স এক্সপার্ট। তার কাটা হয়েছে তা বুঝলে না কেন?'

'আসলে বোঝার উপায় ছিল না, সূক্ষ্ম কাজ করেছে,' আত্মপক্ষ সমর্থন করল ব্রিটিশ সৈনিক। মনে হলো, জাপানির কথায় আহত হয়েছে। রাগ নেই কণ্ঠে। 'কমাণ্ডার রানা খুঁত ধরতে পেরেছে, তুমি বা আমি পারিনি। ব্যাপার এটুকুই। আর এমনটা হতেই পারে।'

'হবে কেন?' তিক্ত সুরে বলল তানামুরা। 'তুমি উপযুক্ত নও বলে খুন হয়েছে মানুষ। মনে কোরো না তদন্ত হবে না। আমরা দেখব তুমি গাধা, না অন্য কিছু। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছ বলে মাফ পাবে না কারও কাছ থেকে।'

'তোমরা তদন্ত করো যত খুশি,' রেগে গিয়ে বলল প্রেস্টন। তানামুরার চোখে চোখ রেখে চেয়ে আছে। 'আমি খালি নাগালে পেতে চাই ওই শুয়োরের বাচ্চার গলাটা।'

নিস্পলক চোখে দু'জনকে দেখল রানা। একবার দেখে নিল ওয়েইলারকেও। চুপ করে আছে সে। হাতে এখন শটগান নেই। পায়ের পাশে ধুলোয় আঁকিবুঁকি করছে ছোরা দিয়ে। ছায়ার কারণে দেখা গেল না পোড়া মুখ। কিন্তু খেপে যে আছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সাঁইত্রিশ

সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের দালানের পিছনে টিপা মুইকে অপেক্ষা করতে দেখল টম জেরাল্ড। দু'হাত বুকে ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে গম্ভীর মেয়েটা। পরনে সাদা ল্যাব কোট, চোখে পুরনো আমলের বড় গ্লাসের চশমা। ভীত মনে হলো ওকে।

'কল পেয়ে...' শুরু করেছিল জেরাল্ড।

কিন্তু ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল মেয়েটা সাদা ডাবল ডোরের দিকে। উত্তেজনায় হাঁপাতে শুরু করেছে। 'মার্শাল, আপনি জানেন না ইলেকট্রোফোরেসিসে আরও কী পেয়েছি!'

দরজা পেরিয়ে এক ঘরে টমকে নিয়ে এল সে। পিছনে লক করে দিল দরজা।

'আরও কিছু পেয়েছেন?' জানতে চাইল টম।

'খুব জরুরি তথ্য,' হড়বড় করে বলল টিপা। 'বুঝতে পারছি না কোথা বিশ্বাস করব।'

ঘরের মাঝে বড় এক কংক্রিটের স্ল্যাবের পাশে থামল।

চাতালে পাশাপাশি দুটো কমপিউটারের মনিটর। তাতে দেখা গেল বেশ কিছু লাইন। সমতল জায়গা থেকে উপরের দিকে গেছে ওগুলো। প্রতিটি লাইনের শেষে আগুনের ফুলকির মত কী যেন। টিপটিপ করছে। দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে আবার।

'বসুন,' বলল টিপা মুই। সম্পূর্ণ মনোযোগ স্ক্রিনে।

মেয়েটা ওকে বিশ্বাস করছে, বুঝল টম। নিজে পড়ে গেছে অস্বস্তির মধ্যে। চারপাশে ছোট কয়েকটা কিউবিকল। লাখ লাখ ডলারের সব যন্ত্রপাতি ওখানে। কে জানে, কী কাজ করে এসব!

কথা না বাড়িয়ে একটা সিটে বসল জেরাল্ড। সামনেই জোড়া মনিটর। প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে টিপা মুই-এর মস্ত চশমার কাঁচে। চোখের পলক পড়ছে না। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কি-বোর্ড নিয়ে।

'দেখুন,' প্রায় ফিসফিস করল টিপা। আঙুল তাক করেছে স্ক্রিনে। কয়েক সেকেণ্ড পর শুরু হলো গুঞ্জন। লেসার প্রিন্টার থেকে বেরোতে লাগল প্রিন্টআউট। জিনিসটা একটা ছবি। কয়েক মুহূর্ত স্ক্রিনে চোখ রাখল জেরাল্ড, বুঝল না কিছুই।

নিজেকে উজবুক মনে হচ্ছে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'বুঝলাম।' ঘুরে চাইল টিপার চোখে। 'আর এই জিনিসটা কী বলে ধরে নেব? আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমি এই সাবজেক্টের লোক নই। বহু কষ্ট করে পাশ করেছিলাম হাই স্কুলের বায়োলজি।'

হাসি স্পর্শ করল না মেয়েটাকে।

'এটা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, আর আপনি দেখছেন অ্যাকশনে মাইটোকণ্ড্রিয়াল ডিএনএ। এসব মলিকিউল যে-কোনও সেলের প্রাণ। আর সেলকে তুলনা করতে পারেন পৃথিবীর সঙ্গে। এসব পৃথিবীর প্রতিটির মলিকিউলের রয়েছে নিজস্ব ডিএনএ। বেশিরভাগ ইন্সটিটিউট বিবর্তন নিয়ে গবেষণার সময় ব্যবহার করে মাইটোকণ্ড্রিয়াল ডিএনএ।'

কয়েক সেকেণ্ড পর জানতে চাইল জেরাল্ড, 'বিবর্তন?'

'হ্যাঁ।'

'এই ডিএনএ থেকে বুঝতে চাইছেন আসলে বিবর্তন কী, মিস মুই? আমার ভুল না হয়ে থাকলে, খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তখন...

'আমি এখনও উত্তেজিত,' বলল টিপা মুই।

চট্ করে একবার মেয়েটাকে দেখল জেরাল্ড। 'তাই তো দেখছি। তা হলে কি ধরে নেব, আপনি ওই ছাঁচ থেকে এই ডিএনএ পেয়েছেন? আর তা-ই হয়ে থাকলে, ওটা কী বর্তমানের কোনও জন্তুর? বিবর্তন নিয়ে গবেষণার সময় বিগড়ে গেছে?' ও চুপ হয়ে গেলেও জবাব দিল না মেয়েটা। নরম সুরে বলল জেরাল্ড, 'আমি কি কিছু বুঝতে ভুল করেছি? একটু খুলে বলুন।'

আরও প্রিন্টআউট পেতে কি-বোর্ড টিপল টিপা মুই। 'আপনি এখনও বোঝেননি!' গুঞ্জন তুলল লেসার প্রিন্টার। বেরিয়ে আসছে দীর্ঘ কাগজ। মনিটরের ছাপা কপি ওটা। কাগজের বুকে শত শত ফেটে যাওয়া বাজি।

গম্ভীর মুখে ভাবল টম জেরাল্ড, কে জানে, আজকের সেরা উত্তেজনার ঘটনা হয়তো এটাই, কিন্তু বিষয়টা যে কী, বলবে কোন্ শালা! এর চেয়ে গোলাগুলি হলে বা দালানে আগুন ধরলেও সহজে পরিস্থিতি বুঝতে পারত ও।

তিক্ত হয়ে গেল ওর মন। শালা, আমি আছি কোথায়? হচ্ছেটা কী? আঁতেলদের খপ্পরে পড়ে মাথা বিগড়ে যাওয়ার দশা! কীসের তদন্ত? আগে কিছু আগামাথা বুঝলে তো! তার চেয়ে অনেক সহজে বোঝা যেত *পাথর ভাঙার* কথা। নাকি পাগল এই মেয়ে? ডেকে এনেছে ঘ্যাচ করে পাছার মাংস কামড়ে ধরতে?

'জানি, এখনও বুঝতে পারেননি,' বলল টিপা মুই। কাগজের লাইনে পেন্সিল দিয়ে একের পর এক বিন্দু যুক্ত করছে সে।

'সংক্ষেপে খুব সহজ করে বলব। আসলে ডিএনএ-র চারটে কেমিকেল বেস থাকে। ওগুলো কী, তা জানা আপনার জন্যে জরুরি নয়। এসব ডিএনএ যখন নিজের মত তৈরি করে আরও ডিএনএ, তখন কেমিকেল বেসও নিজেদের মত তৈরি করে একই জিনিস। তখন সৃষ্টি করে একই প্রোটিন, আর একই অ্যামিনো অ্যাসিড।' সিরিয়াস চোখে জেরাল্ডের চোখ দেখল মেয়েটা। 'এ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন, মার্শাল? যদি না বুঝে থাকেন, দ্বিধা না করে বলবেন।'

ছোটবেলায় লেখাপড়া করলেই ভাল করতাম, ভাবল গম্ভীর টম। মৃদু মাথা দোলাল টিপার উদ্দেশে। 'আপনি যথেষ্ট সহজ করেই বলছেন। চালিয়ে যান।'

মুখের পাশ থেকে চুল সরিয়ে দিল টিপা। 'আমরা শিখেছি প্রফেসর সিরাজউদ্দীনের কাছ থেকে। বলেছিলেন, সবচেয়ে জটিল মলিকিউলের ব্যাখ্যা সহজ করে ছয় বছরের বাচ্চাকে বোঝাতে না পারলে, নিজেরা তোমরা কিছুই শেখোনি বলে ধরে নেবে।'

প্রফেসরের বক্তব্য শুনে হাসল জেরাল্ড। বুকও একটু হালকা হলো। এই মেয়ে নাপাম বোমা ফেলবে না ওর মাথায়। 'ঠিক আছে, ধরে নিন আমি ছয় বছরের বাচ্চা। সেভাবে বোঝান।'

'বেশ,' শুরু করল টিপা, 'ডিএনএ-র দ্বৈত স্ট্র্যাণ্ডে আছে একই রকম কেমিকেল, একই প্রোটিন আর অ্যামিনো অ্যাসিড...'

লাইনের পর লাইন আর ফুলকির মত বিন্দু কেটে নীচে চলল টিপার পেন্সিল, থামল স্প্রেডশিটের নীচে। এসব লাইন ও ফুলকির মাঝে তৈরি করল বড়সড় বৃত্ত।

ওই গোল্লার ভিতর কিছু আছে, আঁচ করল টম।

'কিন্তু ওই ছাঁচের এই ডমিন্যান্ট ডিএনএ-র কোনও এ, জি, সি বা টি ফ্যাক্টর নেই!'

'তাতে আমার কী?' মনে মনে বলল জেরাল্ড। কয়েক সেকেণ্ড

পর সন্দেহ হলো ওর। বিড়বিড় করে বলল, 'তবে কি পাল্টে দেয়া হয়েছে এই ডিএনএ?'

'না, মার্শাল, তা করা হয়নি। এ সম্পূর্ণ নতুন ডিএনএ!'

মেয়েটার চোখে চাইল জেরাল্ড। 'অন্য কিছু? সেটা কী?'

আরও গম্ভীর হলো টিপা। 'হোস্ট ডিএনএ থেকে একেবারে অন্যরকম! অন্য ধরনের মিউটেশন হওয়া জিনিস!'

'তা-ই?' টিপার তৈরি বৃত্ত দেখল জেরাল্ড। ঠোঁটে মৃদু হাসি। চেহারা শান্ত।

'আপনি আসলে কিছুই বোঝেননি!' খেপে গেল ল্যাবোরেটরি সহকারী। ঘ্যাঁচ করে কেটে দিল কিছু লাইন। 'কোনও ডিএনএ থেকে আসেনি এ ডিএনএ! একেবারে বিলীন হয়েছে হোস্ট ডিএনএ, মার্শাল! অথচ মূল ডিএনএ থেকেই এসেছিল এই হাইব্রিড ডিএনএ। এ দিয়েই তৈরি হয়েছে ওই জন্তু!'

কী বলবে, ভেবে পেল না জেরাল্ড। 'নতুন এই ডিএনএ তৈরি করেছে ওই জানোয়ারটাকে– এই তো?' জানতে চাইল।

'নতুন ধরনের জানোয়ার!'

'একটু খুলে বলুন তো, টিপা, আসলে কী হচ্ছে...

'মার্শাল, আলাস্কার রিসার্চ স্টেশনের ওটাকে মিউটেশন বলা যাবে না! প্রথমে তা-ই মনে হয় বটে, কিন্তু আসলে তা নয়! আগে হোস্ট ডিএনএ ছিল, কিন্তু এখন নেই। মানব ডিএনএ-র সঙ্গে অন্য ডিএনএ মিলিয়ে তৈরি করেছে সম্পূর্ণ অন্য জানোয়ার! বিভাজন হয় না ওটার আমিষ!' জেরাল্ডের চোখে চাইল টিপা। 'আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, মার্শাল! বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, এ আবিষ্কারের কারণে মারা পড়েছেন ডক্টর নিনা সয়্যার! কেউ বুঝে গিয়েছিল ধরা পড়বে, তাই দেরি না করে খুন করেছে!'

'তা হলে কী ধরে নেব?' জানতে চাইল জেরাল্ড। ভাবছে,

আগেই জানি, খুন হয়েছে মহিলা বিজ্ঞানী।

'ওরা সায়েন্টিফিকালি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ম্যাট্রিক্স বা বৈদ্যুতিক জরায়ু ব্যবহার করে তৈরি করেছে ওই জন্তু বা দানব। কখনও হয়তো মানুষই ছিল, কিন্তু এখন অন্য কিছু। অসম্ভব শক্তিশালী। কখনও কোনও অসুখ হবে না তার। দেহে ক্ষত হলে সেরে উঠবে দশ গুণ দ্রুত। ধরুন, আহত করলেন, ওটা খাবার পেলে মাত্র এক রাত ঘুমিয়ে হয়ে উঠবে আগের মত সুস্থ। হোস্ট ডিএনএ-কে খেয়ে ফেলেছে অচেনা ডিএনএ, যেন ভয়ঙ্কর পোকা। অকল্পনীয় গতিতে তৈরি করছে নিজের মত লাখে লাখে। মানুষের ডিএনএ বুঝছেই না গোপনে হামলা হয়েছে ওদের ওপর।'

জটিল বিষয়, ভাবল জেরাল্ড। সামান্য জ্ঞান আছে ওর ইমিউন সিস্টেম সম্পর্কে। ব্যাকটেরিয়া হামলা করলে ওই জিনিস বাধা দেবে। 'কেন ওটাকে শত্রু ভাবছে না হোস্ট ডিএনএ?' জানতে চাইল। 'জিনিস যখন আলাদা।'

'কারণ, মানুষের ডিএনএ-র সঙ্গে ওটার ডিএনএ-র খুব মিল,' বলল টিপা। 'নিজের জিনিস ভাবছে ইমিউন সিস্টেম। জানে না, আসলে ওটা শত্রু। আমরা যে ডিএনএ পেয়েছি, তা হোমো-সেপিয়েন্সের ডিএনএ-র খুব কাছের কোনও আত্মীয়ের।'

চার্টে চোখ বোলাল টম জেরাল্ড। 'কিন্তু জন্তুটা কী?'

'বুঝতে শুরু করেছেন, মার্শাল,' বলল টিপা। 'ধরুন, ভেড়া ও ছাগলের ডিএনএ-র মাঝে ফারাক আছে। একই ভাবে মানুষ ও বনমানুষের ডিএনএ-র মাঝেও তফাৎ আছে। আসলে মানুষের ডিএনএ-র পঁচানব্বই পার্সেন্ট মিলবে পৃথিবীর বেশিরভাগ প্রাণীর ডিএনএ-র সঙ্গে। মানুষের সঙ্গে নিরানব্বই পার্সেন্ট মিলবে বনমানুষের ডিএনএ। তফাৎ মাত্র এক পার্সেন্ট-এ। আর তাতেই সব অমিল। ওই এক পার্সেন্ট ডিএনএ থেকে আসছে বুদ্ধিমত্তা, আবেগ, অহমিকা, আত্মসচেতনতা, সতর্কতা ইত্যাদি। বা বলতে

পারেন ওটাকে মন। ওটাই মানুষের আসল। কিন্তু ওই এক পার্সেন্ট অমিল আছে বলে অন্য প্রাণী চাইলেই মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না। আর আমাদের এই নতুন ডিএনএ ধীরে ধীরে দখল করে নিচ্ছে মানব ডিএনএ-র নিয়ন্ত্রণ। মন এখনও দখল না করে থাকলে, শীঘ্রি তাই করবে।'

গ্রাফের দিকে চাইল জেরাল্ড। ভাল করেই জানে, এসব দেখে কিছুই বুঝবে না। কিন্তু টিপা মুই যা বলেছে, গেঁথে গেছে মনে। কর্তৃপক্ষ টুঁ শব্দ করছে না আলাস্কার রিসার্চ স্টেশনে গোপনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর সব গবেষণা। এখনও কোনও পরিকল্পনা করেনি জেরাল্ড। কিন্তু বুঝতে পারছি, একবার কাজে নামলে সামনে তৈরি হবে চলবার পথ।

'ঠিক আছে, এর কপি লাগবে আমার,' বলল জেরাল্ড, 'একটা কপি যাবে হোয়াইট হাউসে, একটা আমার বসের কাছে, আরেক কপি অন্য ঠিকানায়। ওই ঠিকানা আমি লিখে দেব। এ ছাড়া, নিরাপদ রাখতে একটা কপি রাখব আমার এক বন্ধুর কাছে।'

'আর আপনি নিজে নেবেন না একটা কপি, মার্শাল?' জানতে চাইল টিপা।

'না।' উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ল জেরাল্ড। 'কিছু জবাব চাই, তাই যাব এক জায়গায়। ওখানে ওটা লাগবে না আমার। কিন্তু আমার হাসি-হাসি মুখ দেখলে খুশি হবে না তারা।'

দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল জেরাল্ড।

'মার্শাল?' পিছন থেকে ডাকল টিপা।

ঘুরে চাইল জেরাল্ড।

তরুণী দাঁড়িয়ে আছে কোটি ডলারের যন্ত্রপাতির মাঝে। বাকি জীবন ঘাঁটাঘাঁটি করলেও ওসব চালাতে পারবে না জেরাল্ড।

একটু দ্বিধা নিয়ে বলল টিপা, 'মার্শাল, আশা করি, যারা ডক্টর সয়্যারকে খুন করেছে, তাদেরকে বিচারের মুখে দাঁড় করাবেন।'

আস্তে করে মাথা দোলাল জেরাল্ড। 'নিশ্চিন্ত থাকুন।'

জটিল বৈজ্ঞানিক ঘন কুয়াশা মনের মধ্যে নিয়ে সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের ল্যাবোরেটরি ছেড়ে রওনা হয়েছে ডেপুটি মার্শাল টম জেরাল্ড। টিপা মুই যা বলেছে, সেগুলো গেঁথে গেছে বুকে। তাই বলে যুক্তি বুঝবে না, তা নয়। বুঝে গেছে ওর কাজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যুক্তি হারালে যখন তখন আসবে মৃত্যু। যুক্তিপূর্ণ কাজ না করলে বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্ট থেকে মার্শালদেরকে সরিয়ে হালকা কাজ দেয়া হয় মার্শাল সার্ভিস থেকে– যেন ভোঁতা না হয় যুক্তি।

অবশ্য আজ পর্যন্ত জেরাল্ডকে নিয়ে এই সমস্যায় পড়েননি ওর বস। যুক্তি হারিয়ে কারও উপর প্রতিশোধ নেয়নি ও। নিজেকে রেখেছে জেলখানার বাইরে।

ডক্টর নিনা সয়্যার খুন হয়েছে, তা টিপা মুইকে বলেনি জেরাল্ড। যদিও বুঝে গেছে মেয়েটা খুন হয়েছে সিনিয়র কলিগ, তখন মানাও করেনি টম। এখন ভাবছে, মেয়েটাকে পাহারা দেয়ার জন্য গার্ডের ব্যবস্থা করবে কি না।

জটিল হয়ে উঠছে খেলা। সরকারী সংস্থা সিআইএ আইনের বাইরে এসে যা খুশি করছে বিজ্ঞানের নামে।

গাড়িতে উঠে ওয়াশিংটনের দিকে রওনা হয়ে গেল জেরাল্ড। আলাস্কায় যা ঘটছে, তা বুঝে ওঠা কঠিন। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে পরিস্থিতি। এখন ঝাড়ু মেরে সব জঞ্জাল কার্পেটের নীচে পাচার করতে চাইছে সিআইএ।

জেরাল্ডের গাড়ি ছুটে চলল ল্যাংলির দিকে। মোবাইল ফোন বের করে পাথর ভাঙার জন্য কোডেড মেসেজ দিল। আজই বিকেলে দেখা করবে। তার আগে যাবে দু'চার জায়গায়।

কঠোর হয়ে গেল জেরাল্ডের চোখের দৃষ্টি।

ওই লোকগুলোর সঙ্গে দেখা হলে বুঝবে অনেক কিছুই।

আটত্রিশ

ভোরের আলো ফুটবার অনেক আগেই শুরু হয়েছে শত শত পাখির কূজন। ওটা শুনে রানা বুঝতে পেরেছে, ঠিক কতক্ষণ পর ভোর হবে। বাইরে এখনও রাতের আঁধার, কিন্তু বুঝে গেছে, আজ রাতে আর হামলা করবে না ওই ভয়ঙ্কর দানব।

রানা টের পেয়েছে, প্রথমবারের মত সত্যিই আহত হয়েছে ওটা। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে: বুলেটকে পাত্তা না দিলেও ছোরায় এই পরিমাণ কাহিল হলো কেন? তীক্ষ্ণ বলেই দ্রুতগতির বুলেট অতটা ক্ষতি না করলেও এত ব্যথা দিল ধীর গতির ছোরা?

এসব ভাবতে গিয়ে অন্যমনে জিনাকে দেখল রানা। কখন যেন ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারি। ঘুম ভাঙাতে চাইল না বলেই নড়ল না রানা।

সরু করিডোরে একটু দূরে ওয়েইলার। বরাবরের মতই সম্পূর্ণ হুঁশিয়ার। বাউয়ি নাইফ দিয়ে আঁকিবুকি কাটছে ধুলোয়। দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখেছে শটগান। নতুন করে প্রতিটি ক্লিপ ভরে নিয়েছে ডিপলেটেড ইউরেনিয়াম গুলি দিয়ে।

রানার পাশেই ঘুমিয়ে আছে হান্টার। বোঝা যাচ্ছে, আশপাশে বিপদ নেই।

গত কয়েক ঘণ্টা চুপ করে বসে আছে জাপানি যোদ্ধা। রানা দেখেছে, বার কয়েক তিক্ত চোখে প্রেস্টনকে দেখেছে সে।

তানামুরা যে কড়া চোখে তাকে লক্ষ করছে, তা বোধহয় খেয়াল করেনি এসএএস সৈনিক। অথবা, পাত্তা দিচ্ছে না। পরিষ্কার করছে তার ৭.৬ এমএম হেকলার অ্যাণ্ড কোচ ফুল অটোমেটিক অ্যাসল্ট রাইফেল। আবেগহীন চেহারায় অপেক্ষা করছে ধৈর্য ধরে। মাঝে মাঝে শুনছে ভোরের আগে পাখির ডাক।

আরও কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল তানামুরা। 'ভোরের আলো ফুটেছে।' রানাকে বলল, 'বাইরে না গেলে সরাসরি স্যাটালাইটের দিকে ট্র্যান্সমিট করতে পারব না। ওটার সিগনাল পাথর ভেদ করে না।'

কপোল মৃদু ছুঁয়ে জিনাকে জাগিয়ে দিল রানা। মেয়েটা সচেতন হতেই উঠে দাঁড়াল ও। আড়ষ্ট হয়ে আছে মাংসপেশি। ব্যথায় টনটন করছে সারা দেহ। বুকের ক্ষতটা গভীর, কপাল ভাল হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নেয়নি দানব। সেই মুহূর্তে ঠিক কী কারণে সতর্ক হয়েছিল, পরেও ভেবে পায়নি রানা। সম্ভবত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

গুঁড়ির দরজার দিকে চেয়ে আছে সবাই। মনে হলো না কেউ সামনে বাড়তে উৎসাহী। তানামুরা তাকাতেই রানা বলল, 'জিনা, ওটা যদি বাইরে অপেক্ষা করে, প্রথমবারের মত পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে পাবে। সাবধান থেকো। আমরা যদি গুলির গতিপথেও থাকি, দেরি না করে ফায়ার করবে। একজনকে বাঁচাতে গিয়ে দলের অন্যদেরকে মস্ত বিপদে ফেলে দেয়া উচিত হবে না।'

নির্বিকার চেহারায় মাথা দোলাল জিনা। ব্যারেটের চেম্বারে পাঠিয়ে দিল বুলেট।

রানা নিশ্চিত, ঠিকই নির্দেশ পালন করবে জিনা।

ভেঙে গেছে তৃতীয় গুঁড়ি, উপরের আর নীচের গুঁড়ি সরিয়ে ফেললেই চলবে। কাজে নেমে পড়ল তানামুরা, ওয়েইলার ও প্রেস্টন। দ্বিধা এল সবার মনে। বাইরে হয়তো অপেক্ষা করছে করুণ, বীভৎস মৃত্যু।

'প্রথমেই খনি থেকে বেরিয়ে যাব না আমরা,' বলল রানা। মারলিন রাইফেল হাতে তৈরি।

তিনজন মিলে গুঁড়ি সরিয়ে ফেলতে সড়াৎ করে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে ডান হাতে রাখল তানামুরা। শটগান ওয়েইলারের হাতে। অ্যাসল্ট রাইফেল প্রেস্টনের কনুইয়ের ভাঁজে।

ভোরের আকাশ হালকা নীল।

প্রথমে খনি ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা। সাবধানে দেখে নিল চারপাশ। ফিরে এসে ডাকতেই একে একে বেরোল সবাই। স্ট্রেচারে শুয়ে আছেন প্রফেসর। তাঁকে এনে রাখা হলো বাইরে।

প্রফেসরকে উঠে বসতে সাহায্য করল রানা। আগেই একটা কেবিন থেকে নিয়ে এসেছে চেয়ার। মেগেলান সিস্টেম মাটিতে নামিয়ে চালু করল প্রেস্টন ওয়েস্ট।

জঙ্গলে ডালে ডালে রংবেরঙের হরেক পাখির ব্যস্ততা। পুব থেকে এল হালকা ঝিরঝিরে হাওয়া। চুনাপাথরের টিলা বেয়ে ছল-ছলাৎ শব্দে নামছে উচ্ছল ঝর্না। দৌড়ে আরেক ডালে চলে গেল পাহাড়ি এক কাঠবেড়ালি। অনেক দূরে সঙ্গমের জন্য সঙ্গিনীকে ডাকল একটি মুস।

সারা রাত বদ্ধ খনিতে কাটাবার পর প্রতিটি গন্ধ তাজা মনে হচ্ছে রানার। যদিও জঙ্গলে পচে গেছে লতা-পাতা। সবুজ পাইন গাছের ঝাঁজাল সুবাস এল। এ ছাড়া, রয়েছে পুরনো গাছ ও ভেজা মাটির গন্ধ। বড় করে দম নিল রানা, ভাল লাগছে বেঁচে থাকতে।

তখনই আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারল প্রেস্টন।

চুপ করে কথাগুলো শুনল রানা।

জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য চাইছে ব্রিটিশ সৈনিক।

না-সূচক জবাব এল ওদিক থেকে।

ঝর্নার ভাটিতে কয়েক মাইল গেলে, ওখানে খোলা এক

জায়গা বেছে নামবে ব্ল্যাকহক পারসোনেল হেলিকপ্টার। ওটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বেসে ওদেরকে।

একটু বিরক্ত চেহারায় রেডিয়োর কেস আটকে নিল প্রেস্টন।

ভুরু কুঁচকে গেছে তানামুরার।

'আপাতত কিছু করার নেই,' বলল প্রেস্টন, 'হেঁটে যেতে হবে ওদিকে।'

'খুব সমস্যা হবে না,' সবাইকে ভরসা দিতে চাইল রানা। 'আমরা এখন জানি, কীভাবে ওটাকে খুন করতে হবে।'

'আপনি সামনে চলুন, আমরা পিছনে,' বলল তানামুরা।

ঘুরে ঢালু পথে নীচে চলল রানা। আলতো হাতে ধরেছে মারলিন রাইফেল, যদিও ওটা কোনও কাজে আসবে না। কেভলার জ্যাকেটের মত দানবের শক্ত চামড়া ভেদ করবে এমন অস্ত্র বলতে ওর কোমরে ঝোলানো বাউয়ি ছোরা। কিন্তু ওটা ব্যবহার করতে হলে যেতে হবে দানবের খুব কাছে। অর্থাৎ, নিতে হবে মৃত্যুর ঝুঁকি।

রানার দশ ফুট সামনে রাজার পেয়াদার মত পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে কালো নেকড়ে হান্টার।

পিছনে তানামুরার নির্দেশ শুনল রানা। আগেই জাপানি যোদ্ধাকে জানিয়ে দিয়েছে, প্রফেসরের স্ট্রেচার বহন করবে প্রেস্টন ওয়েস্ট আর টড ওয়েইলার। পিছনে আসবে তানামুরা। রানাকে কাভার করবে রাইফেল হাতে জিনা।

দুরু-দুরু বুকে ধীর পায়ে চলেছে ওরা। যে-কোনও সময়ে হামলা করবে দানব। আধ ঘণ্টা পর পৌঁছল খাড়া দেয়ালের মত টিলার সামনে। টপকে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এক পাশে সরু পথ গেছে পশ্চিমের গিরিপথের দিকে।

রানা আন্দাজ করল, দু'ঘণ্টা লাগবে গন্তব্যে পৌঁছতে। তার আগেই আসতে পারে বিপদ। সর্বক্ষণ ওরা আছে মস্ত ঝুঁকির

ভিতর। আর এ কারণেই হয়ে উঠেছে আরও সতর্ক। বার-বার দেখছে চারপাশের নানান চিহ্ন ও ছাপ। একটু পর জিনার ফিসফিসে কণ্ঠ শুনল রানা।

'গত রাতে সময় দিলে বলে ধন্যবাদ।'

অন্তর থেকে কথাটা বলেছে মেয়েটা, বুঝল রানা। ঘুরে চাইল না, হাঁটছে নীরবে। শীত পড়েছে বড্ড, কখনও বইছে হু-হু হাওয়া, বরফের মত জমিয়ে দিতে চাইছে হাত-পা।

পাহাড়ি বিপজ্জনক পথ পাড়ি দিয়ে যেতে হবে বহু দূরে।

ঊনচল্লিশ

জঙ্গলের ভিতর দৌড়াতে শুরু করে সে টের পেল, শরীরে আবার আসছে শক্তির জোয়ার। সামনে কোথাও আছে ওই ছোট দল। খুন করতে হবে তাদেরকে। ছুটবার গতি আরও বাড়ল তার। তখনই দেখল ঝর্নার ওই পারে ট্রেইলের শেষে কালো কী যেন! নিঃশব্দ পায়ে ছুটতে হবে না এখন, ঝড়ের গতিতে বাঁক নিয়ে ছুটল সে। একেকটা বড় বোল্ডার পেরিয়ে যাচ্ছে মস্ত লাফে। টপকে যাচ্ছে পড়ে যাওয়া গাছের গুঁড়ি ও ছোট-বড় ঝর্না। পেটে খাবার দেয়ার পর নতুন করে বাড়ছে প্রাণশক্তি।

শেষ রাতে ক্যারিব্যুটা চলে এসেছিল খুব কাছে। দুই লাফে পাশে পৌঁছে গিয়ে বাম হাতের ঘুষি মেরেছে। চুর-চুর করে দিয়েছে জন্তুটার করোটি। খপ্ করে তুলে নিয়েছিল হলদেটে মগজ। গব-গব করে খেয়ে নিয়েছে পুষ্টিকর খাবারটা। ছিঁড়ে বের

করেছে রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড ও কলিজা। এসব খেয়ে নেয়ার পর খেতে লাগল পিছনের দুটো পায়ের মাংস। প্রতিবার মুখে খাবার নেয়ার সময় গলা থেকে বেরোল আদিম আনন্দে ঘড়-ঘড় আওয়াজ।

খেতে শুরু করবার একটু পর খেয়াল করেছে, আগের চেয়ে অনেক দ্রুত মেরামত হচ্ছে ক্ষত। লালচে ক্ষতচিহ্ন মিলিয়ে যেতে শুরু করেছিল চোখের সামনেই। দেখতে না দেখতে সুস্থ হয়ে উঠছিল। টের পেয়েছে, পেটে খাবার দিলেই ফিরতে থাকে শক্তি। তখন মনে হয়েছে, আবারও হয়ে উঠছে বিশ্বের সেরা ক্ষমতাশালী শিকারি।

কুয়াশাঘেরা গাছের সারির মাথা পেরিয়ে আকাশে লালচে সূর্য উঠতেই খাওয়া বন্ধ করেছে, পড়ে থাকুক অবশিষ্ট। জরুরি উদ্দেশ্য আছে তার, তাই দ্বিধা করেনি খাবার ফেলে যেতে। ভেবেছিল ঠিক সময়ে হাজির হবে খনির মুখে। কিন্তু গিয়ে দেখল দেরি হয়ে গেছে। অবশ্য, সহজেই খুঁজে নিতে পেরেছে বুটের ছাপ। আগের চেয়ে অনেক হুঁশিয়ার। ওই নেকড়ের মালিকের প্রতি শ্রদ্ধাও জন্মেছে মনে। ভীষণ ব্যথা দিতে পারে ওই লোকের ছোরা। একটু যাওয়ার পর দেখল, লোকটা ঝর্না পেরিয়ে অন্য দিকে গেছে। গোপন করতে চেয়েছে ট্র্যাক।

কিন্তু সে ভাল করেই জানে, কাছেই আছে তারা। রাগে জ্বলছে ওর হৃদয়। এখন শক্তি ফিরছে বলে টের পাচ্ছে না, কমে আসছে সতর্কতাবোধ। বার-বার ভাবছে, কখন জিভের ডগায় পাবে ওই নেকড়ের মালিকের রক্ত।

হ্যাঁ, মরতে হবে ওই লোকটাকে! কিন্তু আর সবাইকে খতম করবার পর মারবে তাকে। মারার আগে আচ্ছা মত কষ্ট দেবে। অত্যাচার করবে। তা করবে এমন ভাবে, ভীষণ ব্যথায় কাতরাবে সে। প্রাণ ভিক্ষা চাইবে।

মস্ত এক লাফে পেরিয়ে গেল পড়ে যাওয়া এক গুঁড়ি। ছুটতে

ছুটতে ভাবল: না, ওই লোককে সত্যি ভয় দেখাতে পারবে না। ওই লোক মরবে, কিন্তু কারও কাছে হার মানবে না। অতীতেও তার মত লোক ছিল, মরত লড়তে লড়তে।

কী চমৎকার ছিল সেসব দিন...

দিন-রাত রক্ত ঝরাত তারা। রক্ত কখনও মানুষের, কখনও অন্য জন্তুর। রাতে মানুষের গ্রামে হামলা করত দল বেঁধে। কী চিৎকারই না করত মরার সময় মেয়েলোকগুলো! ওগুলো বেশি দুর্বল। আজকাল একটা-দুটো পাওয়া যায়। নেকড়ের মালিকের সঙ্গে আছে একটা। ওটাকে খতম করার সময় খুব মজা পাবে। লাফিয়ে উঠে ওদের দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, মাটি স্পর্শ করার আগেই খুন করবে শিকার। দেখবে, প্রাণের ভয়ে কীভাবে পালাতে শুরু করেছে অন্যগুলো।

খুশি হয়ে হাসতে হাসতে দৌড়ের গতি আরও বাড়াল সে।

সরু, অন্ধকারাচ্ছন্ন টিলার খাদের মাঝ দিয়ে যেতে হবে গিরিপথের দিকে। থেমে দাঁড়িয়ে গেছে দলের সবাই। ক্লান্ত চোখে প্রফেসরকে দেখল রানা। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন তিনি। ঘুমিয়ে থাকলেই ভাল, ভাবল ও। আবার যখন জেগে উঠবেন, ততক্ষণে হয়তো ওরা পৌঁছে যাবে গিরিপথে। সামনেই থাকবে ল্যাণ্ড করা ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার। বেশিক্ষণ লাগবে না রিসার্চ স্টেশনে পৌঁছে যেতে। প্রথমেই প্রফেসরকে পাঠিয়ে দেয়া হবে হাসপাতালে।

আঁধার পাহাড়ি খাদ দেখছে তানামুরা, সরু হয়ে গেছে দু'চোখ। 'অ্যাম্বুশ করার সেরা জায়গা,' বলল ধীর গলায়, 'কিন্তু এই পথ ছাড়া আর উপায় নেই। আর ওই যে পাথুরে টিলা...' খাড়া টিলা দেখাল সে। 'ওটা পেরোতে পারব না প্রফেসরকে নিয়ে। ঝুঁকি নিতেই হবে।' রানার চোখে তাকাল।

কোনও মন্তব্য করল না রানা। চোখ পড়ে আছে সরু, আঁধার খাদে। বুঝতে চাইছে, কী করে পেরোবে অন্ধকার জায়গাটা। পালাতে শুরু করবার পর থেকে বেশিরভাগ ইকুইপমেন্ট পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। জিনিসপত্র ঝুলিয়ে রাখা ভেস্ট এখন নেই। এ কারণে দ্রুত হাঁটতে পারছে। কিন্তু গতি ধরে রাখতে পারবে না আঁধারে। এখন চাই আলোর ব্যবস্থা। ওদের কাছে আলো বলতে রয়ে গেছে শুধু ওর মিনি ফ্ল্যাশলাইট। ওটা দিয়ে কিছুই হবে না।

'পনেরো মিনিটে মশাল তৈরি করব,' বলল রানা, 'আলো ছাড়া ওদিকে পা বাড়ানো ভুল হবে।'

'আমি মশাল তৈরি করতে সাহায্য করব,' কোমর থেকে ম্যাচেটি খুলে নিল টড ওয়েইলার।

রানার পিছু নিল সে। ট্রেইল থেকে সরে জঙ্গলে গেল দু'জন। মাত্র কয়েক মিনিটের ভিতর কাটল পাইনের কিছু শুকনো ডাল। খেয়াল রাখল প্রতিটি যেন হয় চার ফুট দৈর্ঘ্যের। চেঁছে ডালের একদিক পিনের মত চোখা করে নিল রানা। ছিঁড়ে ফেলল ওর টি-শার্ট, তৈরি করল বেশ কিছু ফালি। জড়িয়ে নিল ডালের মাথায়।

মাত্র দশ মিনিটে প্রাকৃতিক গ্রিজ দিয়ে তৈরি জ্বলন্ত মশাল নিয়ে অন্যদের সামনে হাজির হলো রানা ও ওয়েইলার।

'আমরা খুব কাছাকাছি থাকব,' বলল রানা, 'সবাই জানি, বুলেটে আহত হবে না ওটা। কিন্তু ছোরা কাজে আসবে। দরকার হলে মুখোমুখি হব। এখনও জানি না আগুন দেখলে ভয় পাবে কি না। কিন্তু পশুর চেয়ে মানুষের সঙ্গে মিল তার বেশি। হয়তো কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ভঁয় পাবে মশাল দেখে। আবার তা না-ও হতে পারে। কেউ ওই খাদে যেতে অরাজি হলে আগেই জানিয়ে দাও। জোরাজুরি করা হবে না কাউকে।'

'আমার কোনও আপত্তি নেই,' বলল তানামুরা। 'আমাদেরকে যেতেই হবে খাদের ওদিকে। দরকার হলে মরব, কিন্তু এখানে

পড়ে থাকব না। অসুস্থ প্রফেসরের কথাও ভাবতে হবে।'

মাথা দোলাল অন্যরাও।

এক এক করে প্রত্যেকের দু'হাতে দুটো করে মশাল ধরিয়ে দিল রানা। তবুও অপেক্ষা করছে সবাই।

একবার সবাইকে দেখে নিয়ে খাদের দিকে পা বাড়াল রানা। আগের মত উজ্জ্বল লাগল না মশালের টিমটিমে লালচে আলো।

যা ভেবেছিল, তার চেয়ে ঢের জোরে ছুটে ওই দলের সবাইকে পিছনে ফেলেছে সে। ওই যে, উঁচু ঢিবির মত জায়গা পেরিয়ে কালো খাদের দিকেই চলেছে তারা।

ডানদিকে এক লাফে তিরিশ ফুট নীচের জমিনে নেমে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটতে শুরু করেছিল সে। একেক লাফে পেরিয়ে গেছে তিরিশ ফুট। আরেক লাফে পার হয়েছে চওড়া ঝর্না। ওখান থেকে বিড়ালের মত নেমেছে তিরিশ ফুট দূরের শুকনো এক উঁচু বোল্ডারের উপর। দৌড় না থামিয়ে বড় বড় লাফে উঠে গেছে টিলার চূড়ার দিকে। তারই মাঝে সরে গেছে পশ্চিমে। মাত্র কয়েক মুহূর্তে ওই দলকে পিছনে ফেলে খাদের কালো মুখে ঢুকে গেছে সে।

আপাতত এক শৈলশিলার ওপর শুয়ে আছে। অনেক ছুটে এসে হাঁফ লেগেছে। বড় করে দম নিচ্ছে। টের পাচ্ছে, যে জন্তুটা মেরে খেয়েছে, ওটার মাংস তৈরি করছে শক্তি। প্রতি ক্ষণে আরও ক্ষমতা বাড়ছে তার। থেমে গেছে হাত-পায়ের কাঁপুনি। এবার আসুক ওরা অন্ধকারে। জানে না, আসছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে।

সরু খাদে চোখ রেখে লোকগুলোকে মশাল তৈরি করতে দেখল সে। ভাল করেই আগুন চেনে। ওরা আগুন হাতে সরু গিরিখাদে ঢুকবে। আর তখন...

রোদ থেকে পিছিয়ে খাদের আরও ভিতরের আঁধারে সরে

গেল সে।

পাথুরে সরু করিডোরে ঢোকো, তারপর দেখবে খেলা!

মস্ত মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হাসতে শুরু করল সে।

নিয়ে এসো ওই আগুন আমার কাছে...

দেখা যাক, কে আসলে ভয় পায়...

চল্লিশ

'আপনি জেন্স সিমন্স?'

জোরালো নক শুনে হাতের কাগজ থেকে মুখ তুলে দরজার দিকে চাইল সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির স্পেশাল এজেন্ট জেন্স সিমন্স। তার চোখ খুঁজে নিল ইউনাইটেড স্টেটস ডেপুটি মার্শালের বুকের ব্যাজ পাস। লোকটা এসে থামল তার ডেস্কের সামনে, বাড়িয়ে দিল তার ক্রেডেনশিয়াল।

'আমিই সিমন্স,' উঠে দাঁড়াল এজেন্ট, 'আপনি নিশ্চয়ই মার্শাল জেরাল্ড?'

'হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে দিল এজেন্ট সিমন্স।

করমর্দন করল জেরাল্ড।

'বসুন?' চেয়ার দেখাল সিআইএ এজেন্ট।

তাকে সিআইএ-র বেশিরভাগ এজেন্টের মতই ক্যারিয়ার-ম্যান বলে মনে হলো জেরাল্ডের। পরনে সাদা শার্ট, কালো কোট, কালচে টাই, ছোট ছাঁটে কাটা চুল, দিনের পর দিন অফিসে বসে

বসে ফ্যাকাসে মুখের ত্বক, চোখদুটো খুব বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ।

জেম্স সিমন্সের উল্টো দিকের চেয়ারে বসল জেরাল্ড। ওর কাছে কোনও নোটবুক নেই। যা বুঝবে বা শুনবে, সব থাকবে মগজে।

দুটো কারণে এখানে এসেছে জেরাল্ড। ওর প্রথম কাজ, এই অ্যাসাইনমেন্টে সিমন্স থেকে থাকলে তাকে ভীত করে তোলা। দ্বিতীয় কাজ, এর মনোযোগ আর সম্মান অর্জন করা।

জেরাল্ড শুনেছে, যেসব ফেডারেল এজেন্ট তথ্য নোটবুকে টুকে নেয় না, তাদেরকে যমের মত ভয় পায় এজেন্সির লোকরা।

আরাম করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল জেরাল্ড। ভাল করেই জানে, ও আছে শত্রুর আস্তানার ভিতর।

বেরিয়ে এসেছে টিপা মুই-এর খপ্পর থেকে। এই বিশেষ পরিবেশ ওর চেনা। পলিসি, প্রসিজার, আইন, তার প্যাঁচ, গোপনীয়তা, সাফাই দেয়া আর সহজ বিশ্বাসঘাতকতার পরিবেশে বেশ স্বস্তি পেল জেরাল্ড। লোকটা কী করে দেখতে একটু অপেক্ষা করল। মেপে নিচ্ছে তাকে। না, অত সহজ চিড়িয়া নয় এ, নিজেও হেলান দিয়েছে চেয়ারের পিঠে। ভঙ্গি অলস।

'হ্যাঁ, মার্শাল,' নরম সুরে বলল সিমন্স। 'আমাকে বলে দেয়া হয়েছে, যে-কোনও বিষয়ে আপনাকে সহায়তা দিতে হবে। অবশ্য, নিশ্চয়ই জানেন, আর্টিকেল ২৪৫৩ অনুযায়ী গোপন কিছু জানতে চাইলে...'

'আইনটা আমার জানা আছে, মিস্টার সিমন্স,' মৃদু মাথা দোলাল জেরাল্ড। বুঝিয়ে দিল, তদন্ত থেকে অন্যদিকে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই তার। এবং ওই আইন জানে বলেই, প্রয়োজনে সিআইএ-র রেগুলেশন্স ও পলিসি পাত্তা না দিলেও চলবে। তদন্তের কারণে প্রয়োজনে নানান কথা জানতে চাইবে, তখন প্রোটোকলের কথা তুলে মাফ পাবে না সিমন্স।

জেরাল্ড ঠিক করেছে, প্রথম থেকেই এর উপর জোর খাটাবে।

'আচ্ছা,' সামনে ঝুঁকে এল এজেন্ট। মনে হলো আক্রমণাত্মক। 'তো কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

সরাসরি নিজ বক্তব্য জানাল জেরাল্ড, সামান্যতম দ্বিধা থাকল না কণ্ঠে, 'বলতে শুরু করুন আপনাদের বিশেষ প্রোগ্রামে চালিত ওইসব আর্কটিক সার্কেলের কথিত রিসার্চ স্টেশনগুলোর বিষয়ে। সেগুলোতে খুন হয়েছে সৈনিক ও পারসোনেল। আপনাকে বোধহয় দ্বিতীয়বার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না, সেই সব রিসার্চ স্টেশনের বিষয়ে তদন্ত করছি আমি।'

সামান্য বিস্ফারিত হলো সিমন্সের চোখ, গভীর ভাবে টেনে নিল শ্বাস। মাথা নাড়ল। 'সত্যি বলতে, মার্শাল, আমিও অন্যদের মতই দ্বিধান্বিত। আসলে জানি না কী হয়েছে ওখানে। শুধু জানি, আমাদের প্রোগ্রাম ব্যাহত হয়েছে মারাত্মক ভাবে। আমাদের পারসোনেলদের ওপর হামলা করেছিল কোনও জন্তু।'

'সে পর্যন্ত আমিও শুনেছি,' সিআইএ এজেন্টের চোখে চোখ রাখল জেরাল্ড। খেয়াল করছে লোকটার চোখের মণি নড়ে কি না। 'ঠিক কী কারণে ওখানে চালু রাখা হয়েছে এসব স্টেশন?'

'জিয়োক্রনোলজি আর টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়া মনিটরের জন্য,' বিনা দ্বিধায় বলল সিমন্স, 'সহজ কাজ আসলে। বেশিরভাগ শক্তিশালী দেশ আর্কটিকে রেখেছে এসব রিসার্চ স্টেশন। কারও কারওটা আন্তর্জাতিক এলাকায়। আমাদেরগুলো নিজেদের দেশে, আলাস্কায়।' আরও হেলান দিয়ে বসল সে। মাথা নাড়ছে কথায় জোর দেয়ার জন্য, 'আমি আসলেই জানি না, কেন ওই ভালুক বা বাঘ, বা ওটা যা-ই হোক, কেন হামলা করছে আমাদের সব স্টেশনে। এসব বিষয়ে তদন্তের জন্যে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি ওখানে। কেউ কেউ বলছে, জন্তুটা পাগল হয়েছে রেডিয়েশনের কারণে, আবার কেউ বলছে, ওদিকে হাজির হয়েছে লো-

ফ্রিকোয়েন্সি সাউণ্ডের কারণে। আমি আসলে বিজ্ঞানী নই, তাই এর বাইরে আর কিছু জানি না।'

'আমিও বিজ্ঞানী নই, সিমন্স,' ইচ্ছা করেই মিস্টার ছেঁটে ফেলে দিয়েছে জেরাল্ড। 'কিন্তু যেসব তথ্য খুঁড়ে বের করেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে... এসব ফ্যাসিলিটি... সাইসমিক মনিটরের চেয়ে অনেক বেশি কিছু করছে।'

মনোযোগ দেয়া টিয়া পাখির মত মাথা কাত করল সিমন্স। ...তাই? ঠিক কী কারণে আপনি এই উপসংহারে এলেন? সেক্ষেত্রে কি ধরে নেব, আমার কাছে যেসব তথ্য আছে, তার বাইরেও কোনও তথ্য পেয়েছেন?'

'আমার সোর্সের বিষয়ে কিছু বলতে চাই না,' লোকটার নাকের কাছে টোপ ঝুলিয়ে দিয়ে মনে মনে খুশি হলো জেরাল্ড। 'আমার ধারণা, এসব স্টেশন বায়োলজিকাল রিসার্চে ব্যস্ত।'

জবাব দিতে গিয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না সিমন্স, 'তাই?' সামান্য বিরতি নিল, যেন তথ্য পেয়ে হজম করছে আর ভাবছে, এসব সত্যি হতে পারে? কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আমি এসব জানতাম না। আপনার কাছে যে তথ্য আছে, সেসব কতটা নিখুঁত ও সত্য, মিস্টার জেরাল্ড?'

'যথেষ্ট প্রমাণ আছে, খাপে খাপে মিলে গেছে অনেক কিছুই।'

নীরবতা নামল ঘরে।

'আচ্ছা,' কিছুক্ষণ পর বলল সিমন্স, 'তা হলে... আপনি বলছেন, ওখানে বায়োলজিকাল রিসার্চ হচ্ছে। নিশ্চয়ই জানেন, আপনি এই তথ্য পেলেও আরও কিছু প্রমাণ না পেলে কিছুই করতে পারব না।'

এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল জেরাল্ড। সাফ কথা বলে দিল, 'আপনার প্রমাণ পেতে হবে না। ওসব আমার কাছে আছে। আপনাকে কোনও কষ্ট পেতে হবে না, উপযুক্ত লোকের হাতে

ব্যক্তিগত ভাবে সব পৌঁছে দেব।' সামনে ঝুঁকে সিমন্সকে দেখল ও। 'এবার বলুন, সিমন্স, আপনার ওই হান্টিং পার্টির ব্যাপারে। আশা করি, পসি কোমিটেটাসের টপ সিক্রেট আঙিনা বা রাজপ্রাসাদের গোপন তথ্য নয় আপনার ওই ইনফর্মেশন!'

'আসলে,' টেবিলে পেন্সিল ঠুকতে শুরু করেছে সিমন্স, 'তারা হাইলি ট্রেইণ্ড সৈনিক ও অফিসার। নানান দেশের। প্রত্যেকের আছে জঙ্গলে টিকে থাকার অভিজ্ঞতা। আগেও মানুষ ও জন্তু খুন করেছে। প্রত্যেকে স্মল আর্মসের উপর এক্সপার্ট। কাজে নেয়ার আগে তাদের সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি।'

এই কথা শুনবে, আগেই ভেবেছে জেরাল্ড। একবারও মাসুদ রানার কথা উল্লেখ করেনি সিমন্স।

'দলের নেতা বা ট্র্যাকার লোকটা সম্পর্কে জানান,' বলল জেরাল্ড।

'কার কথা বলছেন?'

'মাসুদ রানা।'

'ও, হ্যাঁ,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সিমন্স। 'যারা তাকে এই মিশনে কাজ দিতে চেয়েছে, তারা বলেছে, সে দুনিয়ার সেরা ট্র্যাকার। শুনেছি জঙ্গলে যে-কোনও কিছু খুঁজে বের করতে পারে। মরুভূমিতেও। ধরে আনতে পারে যে-কোনও জন্তুকে। বা পারে খুন করতে। তার ক্রেডেনশিয়াল দেখার দায়িত্বে আমি ছিলাম না, তাই বিস্তারিত কিছুই জানা নেই। নিয়োগ যারা দিয়েছে তাকে, তারা বলতে পারবে। আমার যা বেতন বা পদ, তাতে ওই কাজ আমাকে দেয়া হয় না।'

'কখনও দেখা হয়েছে আপনাদের দু'জনের?'

'হ্যাঁ, একবার। কয়েক মিনিটের জন্যে। চেনা-জানা হয়নি বললেই চলে।' যেন মরা মাছের ঘোলাটে চোখ সিমন্সের, কোনও ভাব প্রকাশ পেল না।

মনে মনে তার প্রশংসা না করে পারল না জেরাল্ড।

'অল্প কয়েকটা কথা হয়েছে,' আবারও বলল সিমন্স, 'কিন্তু তাতেই বুঝেছি, ট্র্যাকিং সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে। ওই দলের নেতা হিসেবে তাকে নেয়া হবে শুনে আপত্তি তুলিনি। আমাদের তখন দরকার দক্ষ ট্র্যাকার, এমন একজন, যে ট্র্যাক করে খুঁজে বের করবে ওই ভালুককে, তারপর খুন করবে ওটাকে। এমনিতেই বহু ক্ষতি করেছে আমাদের প্রোগ্রামের।'

'কথাটা আগেও বলেছেন,' নিষ্কম্প চোখে তাকাল জেরাল্ড।

কথাটা শুনে অবাক চেহারা করল সিআইএ এজেন্ট। নিরীহ চোখে তাকাল। 'কী বলেছি, মিস্টার জেরাল্ড?'

'আগেও বলেছেন ওটা ভালুক।'

বার কয়েক চোখ পিটপিট করল সিমন্স। 'আসলে, ভালুক ছাড়া আর কী হবে ওটা? মনে করি না বেয়ারিং স্ট্রেইট পেরিয়ে আলাস্কায় এসে উঠেছে বাঘ। আমি পজিটিভ, ওটা ভালুক। প্রতিটি হামলার ওপর রিপোর্ট পড়েছি।' মাথা নাড়ল সে। 'সহজে বিচলিত হওয়ার মানুষ নই, কিন্তু না দেখলে বিশ্বাস হয় না, এত ভয়ঙ্কর ভাবে খুন করা হবে মানুষকে। রীতিমত চমকে গেছি ওসব ছবি দেখে। নৃশংস ভাবে খুন হয়েছে মানুষগুলো। বুঝতে দেরি হয়নি, হামলা করেছে প্রচণ্ড শক্তিশালী কোনও জন্তু। ওই শক্তি আছে শুধু প্রকাণ্ড শরীরের ভালুকের।'

এ পথে কাজ হবে না, অন্য কৌশল ধরতে চাইল জেরাল্ড। *পাথর ভাঙার* পুরনো এক নিয়ম মনে পড়েছে। যখন মিথ্যা বলে কাজ হয় না, ব্যবহার করো অর্ধ-সত্য। তার মাঝে মাঝে মিশিয়ে দেবে মিথ্যা। ধরা না পড়লেই হলো।

'আপনার কি মনে হয় ওই জানোয়ার কোনও মিউটেশন?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

নিষ্পলক চোখে ওকে দেখল জেন্স সিমন্স। 'মিউটেশন?'

কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'মিস্টার জেরাল্ড, আগেই বলেছি, এসব রিসার্চ স্টেশনে মিউটেশন হোক বা এক্সপেরিমেন্টেশন, এসব বিষয়ে কিছুই আমার জানা নেই। তবে আপনার বক্তব্য উড়িয়ে দিচ্ছি না। বহু বছর ধরে ইন্টেলিজেন্সে চাকরি করছি, তাই কোনও ধারণা অযৌক্তিক বা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিই না।'

'অসম্ভব বা অযৌক্তিক?' কথাটা মাটিতে পড়বার আগেই খপ্ করে ধরল জেরাল্ড। 'এত অসম্ভব মনে হচ্ছে কেন আপনার? এসব স্টেশন তো বায়োলজিকাল রিসার্চের জন্যে উপযুক্ত জায়গা। নির্জন, খারাপ কিছু হলেও তা কোয়ারেন্টাইন করা যাবে। মাইলের পর মাইল এলাকায় মানুষের বাস নেই। উঁচু পর্যায়ের কর্তৃপক্ষ নজর রাখছে না স্টেশনের ওপর। ওই জঙ্গুলে এলাকায় যা খুশি করা যাবে। সরকার খোঁজ নেয়ার আগেই সরিয়ে দেয়া হবে এক্সপেরিমেন্টের রসদ ও প্রাণী। আপনি নিশ্চয়ই এসব বোঝেন, সিমন্স?'

মাথা দোলাল সিআইএ এজেন্ট। 'হ্যাঁ, এটা অস্বীকার করব না। এই থিয়োরি নিয়ে ভেবেছে আগেও কেউ কেউ। অতীতে খারাপ কিছু ঘটেনি, তাও নয়। তবে আগেই বলেছি, উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে আমার ওপরওয়ালার কাছে কিছুই জানাব না। বোকা নন তাঁরা। শুধু আন্দাজে ভর করে, বা প্রমাণ ছাড়া কেউ যদি বিপদের জুজু দেখায়, সেই এজেন্ট কখনও পদোন্নতি পাবে না। বিশ্বাসই করা হবে না তাকে।'

লেসারের মত তীক্ষ্ণ চোখ ফেলল জেরাল্ড এজেন্টের চোখে। 'আপনি তদন্ত করে দেখেছেন, এসব রিসার্চ স্টেশনে সাইসমিক মনিটরিং-এর বাইরেও কিছু ঘটছে?'

'আমাদের পলিসি অনুযায়ী, ক্রুরা নিয়মিত অ্যানালাইয করছে প্রতিটি ডিস্ক, রেকর্ড, লগবুক বা মিলিটারি রিপোর্ট। আমরা প্রসিজার অনুযায়ী কাজ করি। কোথাও কোনও খুঁত চোখে পড়েনি

আমার। প্রতিটি কাজ হয়েছে নিয়ম মেনে, বেআইনী কিছু করেনি পারসোনেলরা, বা তাদের অন-সাইট সুপারভাইযর।'

'এসব রেকর্ড দেখতে চাই আমি।'

'তা সম্ভব নয়।'

'আমি জোগাড় করে নিতে পারব সাবপিনা।'

'যা করতে হবে, তা করুন, মিস্টার জেরাল্ড,' জবাবে বলল সিমন্স। 'কিন্তু নিশ্চিত বলতে পারি, এসব হাইলি ক্লাসিফায়েড রেকর্ডে কোথাও কোনও ভুল পাবেন না।' একটু থেমে বলল, 'আপনি চাইলে আপনার হয়ে ডিরেক্টরের কাছে অনুমতি চাইতে পারি। তাতে তিন থেকে চার দিন লাগবে। তারপর হয়তো পড়তে পারবেন কম গুরুত্বপূর্ণ ফাইলের কিছু অংশ।'

খামোকা ওই ঝামেলা করব না, ভাবল জেরাল্ড। ওই তিন বা চার দিনে তৈরি হবে নকল রেকর্ড তাতে লেখা থাকবে এসব ইন্সটলেশনের সব কাজ ঠিকঠাক ভাবে চলছে। তখনই জেরাল্ডের মনে পড়ল, *পাথর ভাঙা* বলেছিল, বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে আলাস্কার স্টেশনে স্যাটালাইট কানেকশন। এবার সমস্যার মূলে হাত দিল জেরাল্ড।

'আমি ওই হান্টিং টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই।'

'তা অসম্ভব,' কড়া সুরে বলল সিমন্স

'কেন তা সম্ভব নয়?'

'কারণ, আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না।'

চোখে চেয়ে আছে জেন্স সিমন্স। দীর্ঘ হতে লাগল সময়। বেশ কিছুক্ষণ কঠোর চোখে সিআইএ এজেন্টকে দেখল জেরাল্ড। এমন চেহারা করেছে, যেন বিশ্বাস করছে না হান্টিং টিমের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে সিআইএ। অন্তরে বুঝে গেল জেরাল্ড, মারাত্মক বিপদে আছে ওই দলের প্রত্যেকে।

'এই মাত্র কী বললেন?' আরও কয়েক সেকেণ্ড পর বলল ও।

'আমি বলেছি, মিস্টার জেরাল্ড, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে ওই দলের।' সামনে ঝুঁকে এল সিআইএ এজেন্ট। 'আপনাকে আমার মনে করিয়ে দেয়া উচিত, আইনত এসব গোপন তথ্য কাউকে জানাতে পারবেন না। মনে রাখবেন, এতক্ষণ যা বলেছি, এবং এখন যা বলব, এসব জানতে হলে লাগে হাইয়েস্ট ক্লিয়ারেন্স।'

চুপ করে থাকল টম জেরাল্ড।

'দু'দিন আগে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে যায় আমাদের,' স্পষ্ট বলল জেন্স সিমন্স। 'আমাদের বলেছিল, শিকারের পিছু নিয়েছে ওরা। তারপর বেরিয়ে পড়ে ইন্সটলেশন থেকে। সেদিন বিকেলে স্ট্যাটাস চেক করতে গিয়ে কোনও জবাব পাইনি আমরা। শেষ খবর অনুযায়ী ওই এলাকায় ঘুরছে ওই... জন্তু... এমন হতে পারে, ততক্ষণে খুন হয়ে গেছে ওরা সবাই ওটার হামলায়।' কোনও অনুতাপ নেই তার কণ্ঠে। 'আমরা এয়ার সার্চ শুরু করি। কিন্তু স্টার লাইট স্কোপ ও ইনফ্রারেড ব্যবহার করেও তাদের কোনও হদিস পাইনি। বাধ্য হয়ে এখন পরের পদক্ষেপ নিয়ে ভাবছি আমরা।'

'তা হলে ধরে নিতে পারি, আপনারা শেষ ইন্সটলেশনে আরও অনেক কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছেন?'

''অবশ্যই। দ্বিগুণ করা হয়েছে সৈনিক। সংখ্যায় তারা সত্তর জন। তিন গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে পেরিমিটার ফেন্সের ভোল্টেজ। এক্সটার্নাল ডোর রিইনফোর্স করা হয়েছে। তা ছাড়া, স্টেশনে হামলা হবে ভেবে, ব্যাকআপ রাখা হয়েছে প্রতিটি তথ্যের। রাশার বেআইনী আণ্ডারগ্রাউণ্ড নিউক্লিয়ার ব্লাস্টের সব রেকর্ডও সরিয়ে নেয়া হয়েছে।'

'মনে হচ্ছে না হান্টিং টিমের পরিণতির কারণে আপনার মনে কোনও সহানুভূতি আছে, সিমন্স,' বলল জেরাল্ড। 'তা কেন?'

গম্ভীর চেহারায় মার্শালের দিকে চাইল সিআইএ এজেন্ট। স্বাভাবিক সুরে বলল, 'মিস্টার জেরাল্ড, আমাদের কোনও অপারেটিভ মারা গেলে সব সময় কষ্ট পাই। মিশনে তার মৃত্যুও হতে পারে। কিন্তু তাকে কাজে পাঠিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। আগে এক সময়ে অনেক কষ্ট দিয়েছে আমার আবেগ। আসলে তখন নরম মনের মানুষ ছিলাম। তারপর এক সময় পুরু হয়ে গেল চামড়া। পাথর হয়ে গেল মন। যদি পাল্টে না যেতাম, আমি হতাম অ্যালকোহোলিক, ড্রাগস্ অ্যাডিক্ট বা বদ্ধ উন্মাদ।' কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আমার মনে হয় আপনি বুঝতে পেরেছেন কী বলেছি।'

নীরবতা নামল ঘরে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল জেরাল্ড। মৃদু নড করে হাত বাড়িয়ে দিল এজেন্টের দিকে। কাটা কাটা সুরে বলল, 'সময় দিলেন বলে ধন্যবাদ, মিস্টার সিমন্স।'

'প্রয়োজন পড়লে যোগাযোগ করবেন, মার্শাল,' বলল সিমন্স। 'আর আরেকটা কথা... কেমন এগোচ্ছে আপনার তদন্ত? আমি এখনও জানি না, কেন তদন্তের জন্যে আমাদের নিজের লোক না নিয়ে মার্শাল সার্ভিসের সহায়তা নেয়া হলো।'

মৃদু হাসল টম। 'বোঝেনই তো, কথা আছে না, মুরগির পাল পাহারা দেয়ার কাজ শেয়ালকে দিতে নেই।' দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল জেরাল্ড। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভাল লাগল, সিমন্স। ধরে নিতে পারেন, পরে আরও কথা হবে।'

'এবার কোথায় চললেন, মার্শাল?' চেয়ারে হেলান দিল সিআইএ এজেন্ট। দু'হাত জোড় করে তার উপর থুতনি রাখল। আয়েস করবার ভঙ্গি।

শালা বড় দ্রুত সামলে নিয়েছে, ভাবল জেরাল্ড। ওরও উচিত নিজের গন্তব্য লুকিয়ে রাখা। দরজার কাছ থেকে বলল, 'ভাবছি,

সামান্য কথা সারব ডক্টর ডেভিড গ্রেবারের সঙ্গে।'

'ডেভিড গ্রেবার?'

সিআইএ এজেন্টের চেহারাটা ভাল করে দেখল জেরাল্ড। 'হ্যা।'

'আমি তো জানতাম আপনি জানেন।'

'কী জানার কথা বলছেন?'

'ডক্টর ডেভিড গ্রেবার তো এখানে নেই।'

'কোথায় গেছেন?'

'আলাস্কায়। শেষ রিসার্চ স্টেশনে। ওখানে থাকবেন কমপক্ষে এক সপ্তাহ। তার বেশিও লাগতে পারে।'

এজেন্ট সিমন্স অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী, ভাবল জেরাল্ড। ভঙ্গি নিচ্ছে সাহায্য করবে হাতেম তাঈ-এর মত। এটা সত্যিই সন্দেহজনক।

একচল্লিশ

খাদে ঢুকে এক পলক থেমে সামনের অন্ধকার দেখল রানা। বরফ যুগে পাহাড় থেকে এদিকে নেমেছিল গ্ল্যানেটের খাড়া দেয়াল। কোনও কোনওটা এখনও ঝুঁকে আছে। সামনের মেঝে খেয়াল করে দেখল রানা। মাটি-পাথরে নানান জন্তুর ছাপ। ভালুক থেকে শুরু করে কুইরেলও বাদ পড়েনি। ওরা ভাল করেই জানে, টিলার ওদিকে যেতে হলে একমাত্র পথ এটা। যেহেতু ওরা ব্যবহার

করছে, ওদেরও যাওয়া উচিত একই পথে। ভুললে চলবে না অসুস্থ প্রফেসরকে পৌঁছে দিতে হবে হাসপাতালে। এদিক দিয়ে না যেতে চাইলে, নামতে হবে খাড়া কয়েকটা খাদে।

আর্থার জয়েস নৃশংস ভাবে খুন না হলে ঝুঁকি নিত ওরা। এখনও মানুষটার দড়াদড়ি বয়ে চলেছে রানা। বুকে ঝুলিয়ে নিয়েছে বাড়তি ওই ওজন। পাহাড়ি উঁচু খাদ থেকে অনেক নীচের জমিতে নেমে যেতে পারবে একা, কিন্তু অসম্ভব হয়ে উঠবে প্রফেসরকে নামিয়ে নেয়া। তাঁকে পাহারা দেয়ার মানুষ বলতে মাত্র ওরা ক'জন। তা ছাড়া, চোক ও লিভার পিছনে ফেলে এসেছে। দেয়ালের মত খাড়া পাহাড়ি খাদে নামা এখন প্রায় অসম্ভব।

অন্ধকারে বেশ উজ্জ্বল লালচে আলো দিচ্ছে মশাল। এভাবে জ্বলবে কমপক্ষে আধ ঘণ্টা, তারপর ফুরিয়ে যাবে আগুন। আশা করা যায়, তার আগেই নিরাপদে ওদিকে পৌঁছে যাবে ওরা।

'আমাদের উচিত ঝেড়ে দৌড় দেয়া,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ওয়েইলার। 'থামব না কিছুতেই। আর তারপর ওদিকে গিয়েই কাজে লাগাব ট্রিপ ওয়্যার, স্যাচেল ভরা সি-৪ ব্যবহার করে ধসিয়ে দেব দু'দিকের দেয়াল। পিছনে আটকা পড়বে জন্তুটা।' চট্ করে একবার পিছনে দেখে নিল সে।

কাঁধে এমপি-৫ ঝুলিয়ে নিল তানামুরা, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ চেহারায় সড়াৎ করে বের করল তার কাটানা। আগুনের আলোয় চকচক করছে স্টিলের ফলা। তলোয়ারের একদিক প্রায় সিকি ইঞ্চি পুরু, অন্যদিক ক্ষুরের ফলার মতই ধারালো। মিডিইভেল স্টাইলে কালো বার্নিশের চামড়ার খাপ ঝুলছে কোমরে। তলোয়ার হাতে একবার রানাকে দেখল তানামুরা। 'ওটাকে ব্যথা দিতে চাই ধারালো ফলা,' বলল নিচু স্বরে। 'এটা আমরা জানি। যথেষ্ট ভেলোসিটি না থাকলে ওটার চামড়া ভেদ করবে না বুলেট।'

'প্রতি সেকেণ্ডে বুলেটকে ছুটতে হবে চার হাজার ফুট,' মন্তব্য করল জিনা।

'ঠিক,' সায় দিল তানামুরা, 'হয়তো ওয়েইলারের ইউরেনিয়াম বুলেট আহত করবে। দেখা যাক কী হয়। আমি বেছে নিয়েছি তলোয়ার। যদি অন্ধকারে ওটা কোণঠাসা করতে চায়, আর আমরা গুলি করে ঠেকাতে না পারি, বাধ্য হয়েই মুখোমুখি লড়তে হবে। তখন হয়তো যে-কোনও রাইফেলের চেয়ে বেশি কাজে লাগবে তলোয়ার।'

দূরের অন্ধকারে চেয়ে আছে রানা। এক পলকে মনে পড়ল অনেক স্মৃতি। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের চিন্তা... আশা, নিরাশা, পাওয়া, না পাওয়া, খুশি বা দুঃখ... সব চেপে বসতে চাইল বুকে। টের পেল রানা, শুকিয়ে গেছে গলা। এই যে সবুজ মায়াময় পৃথিবী, একটু পর হয়তো এখানে থাকবে না। মনকে ধমক দিয়ে বাস্তবে ফিরল ও। দানবটার সঙ্গে মুখোমুখি হলে কী করবে, জানে না। ওদের কারও জানা নেই কীভাবে ধ্বংস করবে ওটাকে। নিজেকে বলল রানা, আগেও মস্ত সব বিপদে পড়েছি, হার মানিনি, আর তাই পেয়ে গেছি সামনে চলার পথ।

নিজেকে বড্ড ক্লান্ত মনে হলো ওর। ঘুরে জিনার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। বিষণ্ণ চেহারায় তাকাল মেয়েটা। কোনও আশা নেই চোখে। একবার প্রফেসরকে দেখল রানা। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন মানুষটা।

দলের দায়িত্ব আমার হাতে, মনে মনে বলল রানা। সাধ্যমত করতে হবে। দেরি না করে এবার রওনা হওয়া উচিত।

আরেকবার খাদের ভিতরে চাইল রানা, তারপর বড় করে দম নিয়ে বলল, 'সবচে' খারাপটার জন্যে তৈরি থাকবে। ধরে নাও, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ওটা। আগুন ভয় পায় না। বদ্ধ জায়গায় ছোট একটা দল হিসেবে লড়াই করব আমরা।'

'অথচ, আমাদের হাতে উপযুক্ত অস্ত্র নেই,' বলল তানামুরা।

'আমরা উড়িয়ে দেব ওটাকে,' জোর গলায় বলল ওয়েইলার।

'পরে দেখব সি-৪ ব্যবহার করব কি না,' বলল রানা। 'এবার মন দিয়ে শোনো আমার প্ল্যান। কার্নিশের মত শৈলশিরায় উঠে বিশ ফুট ওপর দিয়ে চলব আমি। পারলে গিরিখাদের আরও ওপরের দিকে যাব। এদিকে তোমরা প্রফেসরকে নিয়ে এগোবে। তোমাদের সামনে থাকব। কিছু দেখলে দেরি না করে গুলি করে জানিয়ে দেব সামনে কী। জানি, ওটা আহত হবে না। দেরি না করে পিছিয়ে যাবে তোমরা। এখান থেকে বেরিয়ে ধসিয়ে দেবে এই খাদ।' জিনার দিকে চাইল রানা। 'খাদ থেকে আমি ছাড়া কেউ বেরিয়ে এলেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে।'

'আমরা পিছিয়ে গেলে খাদের ভেতর তোমার কী হবে?' জানতে চাইল জিনা।

পিঠে মারলিন রাইফেল ঝুলিয়ে নিল রানা। কোনও জবাব না দিয়ে এক হাতে নিল দুই জ্বলন্ত মশাল, খাদের পাশের দেয়ালের ফাটলে পা রেখে উঠতে লাগল। অন্তত দশ ফুট উঠে যাওয়ার পর বলল, 'বাঁচার জন্যে প্রাণপণ লড়ব।' এক হাত ব্যবহার করে গিরগিটির মত উঠছে। 'আমার প্রথম কাজ, ওটা তোমাদেরকে বাগে পাওয়ার আগেই সাবধান করে দেয়া। তোমরা জানো, দানবটা খুন করতে চাইবে দলের সবাইকে। পিছুবার সময় সঙ্গে নেবে প্রফেসরকে।'

এক পা সামনে বেড়ে উপরে চাইল জিনা। শুকনো স্বরে ডাকল, 'রানা...'

বিশ ফুট উপর থেকে নীচে দেখল রানা। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'ভুলে যেয়ো না, হেলিকপ্টারের কাছে পৌঁছুতে হবে।'

খুব সাবধানে সরু গিরিখাদে সাত মিনিট এগোবার পর আঁধারে হামাগুড়ির ভঙ্গিতে বসে পড়ল রানা, দু'হাতে জ্বলন্ত দুই

মশাল। সামনে হাস্যরত হাঙরের মুখের এবড়োখেবড়ো ভাঙা দাঁতের মত শৈলশিরা। করিডোর থেকে বিশ ফুট উপরে আছে ও। দু'হাঁটু পেতে ভারসাম্য রেখেছে এক গ্র্যানেটের স্ল্যাবে। কমলা আগুনের কাঁপা শিখায় পেত্নির মত নাচতে থাকা ছায়া ছাড়া কিছুই দেখছে না।

মাথা কাত করে নতুন অ্যাংগেলে আঁধারে চাইল রানা। না, সন্দেহজনক কিছুই নেই। টের পেল, পাঁজরে ধুপ-ধাপ গুঁতো দিচ্ছে হৃৎপিণ্ড। শিরায় শিরায় ছুটছে অ্যাড্রেনালিন। দর-দর করে ঘামছে দু'হাত। মশাল নামিয়ে রেখে ধুলো ভরা প্যান্টে মুছে নিল হাত। জিভ দিয়ে ভেজালো দুই ঠোঁট।

ভয়ে দুরু-দুরু করছে বুক। বহু দিন পর আবারও সত্যিকারের আতঙ্ক আঁকড়ে ধরছে ওকে। আঁধারে বসে আছে শৈলশিরার কার্নিশের কিনারায়। এক হাতে তুলে নিল দুই মশাল। অন্য হাতে বাউয়ি নাইফ। সত্যি যদি দানবের মুখোমুখি হতে হয়, মৃত্যু হবে আকস্মিক ভাবে। বাধা দেয়ার সুযোগই পাবে না। রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই। ওর চেয়ে অনেক ক্ষিপ্র ওই দানব। ওটার বেকায়দা একটা চাপড় খেলেই লাশ হয়ে ভেসে যেতে হবে মৃত্যু নদীতে।

বেয়াড়া ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করল রানা। চিন্তাশক্তি পরিষ্কার রাখা জরুরি, নইলে মরবে করুণ ভাবে। মনোযোগ দিল চারপাশে। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে অপেক্ষা করল, তারপর রওনা হয়ে গেল উঠে দাঁড়িয়ে। যে-কোনও সময়ে খুন হবে, মন থেকে মুছে ফেলতে চাইল চিন্তাটা।

এই ফাটল ধরে আরও এগোবার পর তানামুরাকে বলেছে, অপেক্ষা করতে হবে ওদেরকে। তারপর সঠিক সময়ে পেরিয়ে যেতে হবে ওকে। নতুন প্ল্যান করার সময় নেই। জাপানি যোদ্ধা পেশাদার সৈনিক, আশা করা যায় ভয়ে মগজ বিগড়ে গিয়ে মস্ত

কোনও ভুল করবে না।

রানার মনে পড়ল টড ওয়েইলারের কথা। প্রথমবারের মত বন্ধুর মত আচরণ করেছে লোকটা। জঙ্গল থেকে রওনা হওয়ার সময় চারকোনা ক্যানভাসের স্যাচেল ব্যাগের হ্যাণ্ডেল তুলে দিয়েছে ওর হাতে। জিনিসটা এক ফুট, চওড়ায় ছয় ইঞ্চি। কোনও অনুমতি নেয়নি ওয়েইলার, নিচু স্বরে বলেছে, 'হ্যাণ্ডেল টানার পর পাঁচ সেকেণ্ড পাবে, তার আগেই সরে যাবে। নইলে ভেঙে পড়বে আকাশ। নতুন করে ওটাকে ঠেকাবার আর কোনও উপায় নেই।'

নিজের পাউচে স্যাচেল রেখেছে রানা। শার্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় ওর উর্ধ্বাঙ্গে ঝুলছে শুধু ওই পাউচ আর জয়েসের দড়া। রওনা হয়ে সামনে পড়ছে অদ্ভুত সব ছায়া। কোনও কোনওটা দানবের মত। কখনও দেখছে বাউয়ি নাইফ হাতে নিজের ছায়া। সাবধানে ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনে বাড়ছে।

নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে কাঁপা শ্বাস-প্রশ্বাস। মৃদু ঘুরছে মাথা। ধীরে কিন্তু দীর্ঘ দম নিল, শান্ত রাখতে চাইল নিজেকে। বিড়বিড় করে বলল, 'তুই কোথায়?'

নতুন করে পেরিয়ে গেল দশ ফুট, তারপর বিশ ফুট। কোথাও ছায়াও দেখল না ওই দানবের। অথচ, ভয়ে আঁকড়ে আসছে বুক। অবচেতন মন বলছে: আছে, খুব কাছেই আছে সে! ওই একই অবচেতন মন আবারও বলছে: এতক্ষণ যখন হামলা করেনি, তো হয়তো আর করবে না।

আগে কখনও ওকে নিয়ে এভাবে খেলেনি অবচেতন মন।

ধৈর্য ধরে এগোতে লাগল রানা। মন বলছে: তোর জন্যে অপেক্ষা করছে ওটা! তৈরি রাখ তোর ছোরা!

আরও দশ ফুট পেরিয়ে চট্ করে মশাল দেখে নিল রানা। আর বড়জোর পনেরো মিনিট জ্বলবে আগুন। একটু দূরে আঁধার।

মশাল হাতে সামনের মোড়ের কাছে চলে গেল রানা, ঝট্ করে পেরিয়ে এল বাঁক, হামলার জন্য তৈরি।

এদিকে কেউ নেই।

আরও দশ ফুট যাওয়ার পর দলের সবাইকে এগোতে বলবে।

সামনে নাচতে শুরু করেছে এক দেয়ালে উদ্ভট ছায়া।

আরও সচেতন হলো রানা। আট ফুট দূরে কার্নিশ শেষ। আবার শুরু হয়েছে আরও পাঁচ ফুট দূরে। মাঝে ফাঁকা জায়গা। বিশ ফুট নীচে করিডোরের এবড়োখেবড়ো মেঝে। শৈলশিরার আরেক দিকে এক ফুট চওড়া কার্নিশ।

সামনের ছায়াগুলো দেখছে রানা। হঠাৎ করেই মনে হলো কী যেন উঠে দাঁড়াল!

লাফিয়ে নেমেছে এদিকের কার্নিশের শেষে।

ওটা...

চট্ করে বুঝে গেল রানা।

ওর মাথা থেকে দেড় ফুট উপরে দানবের লালচে দুই চোখ। বেরিয়ে এসেছে মুলোর মত বড়, সাদা দাঁত। মাত্র পাঁচ ফুট দূরে! পুরু, কালো ঠোঁট প্রসারিত করে হাসছে!

প্রকাণ্ড দুই হাত নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত।

প্রথমবারের মত মানুষের সঙ্গে ওটার ফারাক বুঝল রানা।

ভারী দুই জোড়া ভুরু ঝুলছে চোখের উপর। এগোতে শুরু করেছে বলে পাথুরে মেঝেতে ক্লিট-ক্লিট আওয়াজ তুলল পায়ের ধারালো নখ। বিকট হাঁ করে হাসছে।

রক্ষা পেতে অজান্তেই কাত হয়ে দাঁড়াল রানা। কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে বুকে। কিছুই বলার নেই, কিছু করারও নেই।

...না, আছে!

লাফ দিয়ে নেমে যেতে পারে বিশ ফুট নীচের এবড়োখেবড়ো,

অপ্রশস্ত করিডোরে।

সরু পথে বেকায়দা ভাবে পড়ে নির্ঘাৎ ভাঙবে পা।

তা ভাঙুক, লাফ দেবে।

তখনই বরফের মূর্তির মত জমে গেল রানা।

আবারও হাসল ওটা, আগুনের লালচে আলোয় চক-চক করছে রক্ত-লাল দু'চোখ। ভারী, ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলল, 'আর... কোথাও... পালাতে পারবে না তুমি... মাসুদ রানা!'

হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)